



বাংলাদেশের বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল



পৃথিবী সৃষ্টির শুরু থেকে আজ অব্দি বিবর্তনের ধারায় নানান রকম জীবের উদ্ভব যেমন হয়েছে, অনেক জীবের বিলুপ্তিও ঘটেছে। এত প্রজাতির উদ্ভব এবং বিকাশ এককভাবে জানা এবং বোঝা অসম্ভব। তাই জীবসমূহকে তাদের বিকাশে উপর ভিত্তি করে শ্রেণিতে বিভক্ত করার চেষ্টা করে এসেছেন বিজ্ঞানীরা। শ্রেণিবিন্যাসের মাধ্যমে একটি প্রজাতির উদ্ভব এবং বিকাশের পরিপূর্ণ চিত্র দেখা যায়। এছাড়াও জীববৈচিত্র্যকে সংরক্ষণের জন্যে শ্রেণিবিন্যাস অপরিহার্য। শ্রেণিবিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি থেকেই জীববিজ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র শাখা শ্রেণিবিন্যাসবিদ্যা বা ট্যাক্সোনমির সূচনা। আধুনিক শ্রেণিবিন্যাসের জনক ক্যারোলাস লিনিয়াস পুরো জীবজগতকে দুইটি রাজ্য বা কিংডমে বিভক্ত করেন, উদ্ভিদ এবং প্রাণি। পরবর্তীতে কোষ সংখ্যা, জিনোম ইত্যাদি বিবেচনার আওতায় এনে শ্রেণিবিন্যাসের আরও কিছু প্রস্তাবনা দেওয়া হয়।

শ্রেণিবিন্যাস ধাপে ধাপে করা হয়। শ্রেণিবিন্যাসের ধাপগুলোকে ট্যাক্সন (বহুবচনে ট্যাক্সা) বলা হয়। নেস্টেড হায়ারার্কি অনুসরণ করে শ্রেণিবিন্যাসের ধাপগুলো সাজানো হয়। অর্থাৎ, সবচেয়ে উপরের ধাপকে একটি সেট হিসেবে ধরা হলে পরের ধাপটি সেই সেটের একটি উপসেট হয়। একটি সেটের বৈশিষ্ট্য কম থাকায় জীব সংখ্যা বেশি। উপসেটে বৈশিষ্ট্য এবং নির্দিষ্টতা বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রাণির সংখ্যা কমে যায়। এভাবে আন্তর্জাতিক নিয়মানুসারে সাতটি ধাপে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়। এর সর্বশেষ ধাপ প্রজাতি যা একটি মাত্র জীবের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। শ্রেণিবিন্যাসের ধাপগুলো হলো- রাজ্য (Kingdom), পর্ব (Phylum), শ্রেণি (Class), বর্গ (Order), গোত্র (Family), গণ (Genus), প্রজাতি (Species)। প্রাণিজগত নিয়ে আলোচনাকালে পুরো প্রাণিজগতকে মেরুদণ্ডী এবং অমেরুদণ্ডী এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। জীবনের যেকোনো পর্যায়ে প্রাণির নটোকর্ড থাকলে তাকে মেরুদণ্ডী প্রাণি(vertebrates) বলা হয়। যেসব প্রাণির নটোকর্ড থাকে না তাদের অমেরুদণ্ডী প্রাণি (Invertebrates) বলা হয়।

পৃথিবীতে আবিষ্কৃত প্রাণির শতকরা ৮০ ভাগ অমেরুদণ্ডী প্রাণি। আমাদের চারপাশে মাকড়সা, শামুক, ফড়িং, প্রজাপতি থেকে শুরু করে অসংখ্য প্রজাতির অমেরুদণ্ডী প্রাণি রয়েছে। অমেরুদণ্ডী প্রাণি পৃথিবীর বাস্তুতন্ত্রে সামগ্রিকভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাস্তুতন্ত্রের নানান স্তরে এদের ভূমিকা থাকায়, মানুষ অমেরুদণ্ডী প্রাণির ওপর অনেক বেশি নির্ভরশীল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মানুষ যেমন মধুর জন্যে মৌমাছির ওপর নির্ভরশীল, তেমনি মৌমাছি পরাগায়ণের জন্যেও গুরুত্বপূর্ণ। তবে বেশিরভাগ সময়ই অমেরুদণ্ডী

প্রাণিদের ব্যাপারে আমাদের জানার পরিধি কম থাকায় আমরা তাদের রক্ষার্থে সচেতন হই না। প্রাণিজগতের সংখ্যাগুরু দলকে উপেক্ষা করে বাস্তুতন্ত্রে ভারসাম্য বজায় রাখা অসম্ভব। তাই আমাদের অমেরুদণ্ডী প্রাণিদের ব্যাপারে জানতে এবং তাদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে সচেতন হতে হবে।

প্রজাপতি (Butterflies)

প্রজাপতি Arthropoda পর্বের Lepidoptera বর্গের প্রাণি। Lepidoptera দ্বারা আঁশযুক্ত ডানা বোঝানো হয়। প্রজাপতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো ডানা, যা বেশিরভাগ সময় রঙিন হয়। এছাড়াও এদের বৃহৎ শুঁড় (proboscis) যা দ্বারা এরা মধু সংগ্রহ পান করে। প্রজাপতি ডিম পাড়ে যা লার্ভা (caterpillars) পরিণত হয়। এদের লার্ভার আকৃতি লম্বাটে সিলিন্ডারের মতো এবং কাঁটায়ুক্ত যা পরবর্তীতে প্রজাপতিতে পরিণত হয়। কোনো স্থানের বাস্তুতান্ত্রিক অবস্থা এবং জীববৈচিত্রের সূচক হিসেবে প্রজাপতির ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। কোনো স্থানে প্রজাপতির সংখ্যা বেশি দ্বারা বোঝা যায় সেখানে অন্যান্য আর্থ্রোপোডের সংখ্যাও বেশি এবং জীববৈচিত্র্য উন্নত।

মৌমাছি (Bees)

মৌমাছি মূলত আমাদের কাছে মধু সংগ্রহের মাধ্যম হিসেবেই বেশি পরিচিত। মৌমাছি Arthropoda পর্বের Hymenoptera বর্গের প্রাণি। মৌমাছি মধুর জন্যে পরিচিত হলেও বাস্তুতন্ত্রে এর মূল অবদান পরাগায়নের মাধ্যম হিসেবে। উদ্ভিদে পরাগায়নের মাধ্যম হলো বাতাস, ছোট পাখি কিংবা পোকা জাতীয় প্রাণি। এছাড়া স্বপরাগায়ণও ঘটে। তবে মৌমাছির ভূমিকা পরাগায়নে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। উদ্ভিদজগতে অতোপ্রতোভাবে জড়িত থাকার জন্যে আমরা কেবল মধু না, আমাদের খাদ্য এবং বেঁচে থাকার জন্যেও মৌমাছির ওপর নির্ভরশীল। তাই মৌমাছিকে বাস্তুতন্ত্রের লাইফলাইন বলা হয়।

ক্রাস্টেসিয়ান (Crustaceans)

Arthropoda পর্বের Crustacea উপপর্বের প্রাণিদের ক্রাস্টেসিয়ান বলা হয়। ক্রাস্টেসিয়ানরা জলজ খোলস আবৃত প্রাণি যেমন- চিংড়ি, কাঁকড়া, লবস্টার, ক্রেফিশ ইত্যাদি। এদের খোলস কাইটিনসমৃদ্ধ। ক্রাস্টেসিয়ানরা জলজ বাস্তুতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ প্রাণি। কারণ এরা জলজ খাদ্যশৃঙ্খলে যোগসূত্র হিসেবে ভূমিকা পালন করে। এছাড়া ক্রাস্টেসিয়ানরা খাদ্য উৎস হিসেবে অর্থনৈতিক ভাবে মানুষের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

গুবরে পোকা (Beetles)

বিটলস বা গুবরে পোকা Arthropoda পর্বের Coleoptera বর্গের অন্তর্ভুক্ত। এরা সাধারণত মৃত এবং পচনশীল গাছ থেকে খাদ্যসংগ্রহ করে। বাস্তুতন্ত্রে বিটলসের ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এরা পাখি এবং বেশ কিছু স্তন্যপায়ীদের মুখ্য খাদ্যউৎস। এছাড়াও এদের কিছু প্রজাতি পরাগায়নের সাথে জড়িত। পাশাপাশি পুষ্টির পুনর্ব্যবহারে এরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মথ (Moths)

মথ Arthropoda পর্বের Lepidoptera বর্গের প্রাণি। মথ জীববৈচিত্রে জন্যে দরকারি প্রাণি। এরা প্রজাপতির চেয়ে আকারে ছোট ডানাবিশিষ্ট প্রাণি। পূর্ণবয়স্ক মথ এবং এদের লার্ভারা বিভিন্ন বন্যপ্রাণি, যেমন- পোকা, মাকড়সা, পাখি, ব্যাঙ ইত্যাদি প্রাণির খাদ্য। এছাড়া এরা পরাগায়ন ঘটায় এবং পুষ্টির পুনর্ব্যবহার নিশ্চিত করে। মথেরা বেশিরভাগ সময় খাদ্যউৎস হিসেবে নির্দিষ্ট কোনো উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল।

মেরুদণ্ডী প্রাণির সংখ্যা অমেরুদণ্ডী প্রাণির তুলনায় অনেক কম। মেরুদণ্ডী প্রাণিদের প্রাথমিকভাবে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হলো- মাছ(Fishes), উভচর(Amphibians), সरीসृপ (Reptiles), পাখি (Birds) এবং স্তন্যপায়ী (Mammals)। মেরুদণ্ডীদের মাঝে জলজ পরিবেশ থেকে স্থলভাগে বসবাস করতে সর্বপ্রথম সক্ষম হয় উভচরেরা। মেরুদণ্ডী প্রজাতির সংখ্যা অমেরুদণ্ডীদের তুলনায় কম হলেও বাস্তুতন্ত্রে এরা গুরুত্বপূর্ণ।

উভচর (Amphibians)

বিবর্তনের ধারায় উভচরেরা জলজ পরিবেশ থেকে মাছের সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে সর্বপ্রথম স্থলে বিচরণ শুরু করে। লার্ভা বা ট্যাডপোল দশায় এরা পানিতে থাকে এবং ফুলকার মাধ্যমে শ্বাসগ্রহণ করে। পরিণত অবস্থায় এরা ডাঙায় বসবাস শুরু করে। তিন ধরনের উভচর দেখা যায়। এরা হলো ব্যাঙ(Frogs), স্যালাম্যান্ডার(Salamanders) এবং সিসিলিয়ান(Caecilians)। বাংলাদেশে ব্যাঙ সবচেয়ে বেশি পরিচিত। এরা আকারে ছোট হয়। ব্যাঙের চামড়া খসখসে এবং আঙুল চামড়া দ্বারা পরস্পরের সাথে যুক্ত। এদের লেজ নেই। অন্যদিকে, স্যালাম্যান্ডাররা সरीসृপ ধরনের। এদের দেহ কঙ্কালসার, পা ছোট এবং লেজ রয়েছে। সিসিলিয়ানদের হাত কিংবা পা নেই। এরা দেখতে অনেকটা সাপের মতো। এদের শক্ত খুলি এবং চোখা নাক রয়েছে যা তারা মাটি খোঁড়ার কাজে ব্যবহার করে। উভচরেরা শীতল রক্ত বিশিষ্ট প্রাণি। এরা মূলত পোকামাকড় এবং অন্যান্য অমেরুদণ্ডী প্রাণি খায়। ফলে

এরা কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণে বড় ভূমিকা পালন করে। এরা চামড়া দিয়ে পানি এবং বায়ু শোষণ করতে পারে। ফলে বায়ু এবং পানি দূষণের প্রতি সংবেদনশীল।

সরীসৃপ (Reptiles)

সরীসৃপ বৈচিত্র্যপূর্ণ মেরুদণ্ডী। উভচরদের মতো এদের কোনো লার্ভা দশা নেই। এরা ডিম পাড়ে এবং ডিম থেকে আকারে ছোট পরিপূর্ণ সরীসৃপ জন্ম নেয়। সরীসৃপের দেহ লম্বাটে এবং সরু, চামড়া খসখসে, লেজ থাকে। সরীসৃপের কিছু প্রজাতি জীবনকালের বিভিন্ন অংশ স্থল এবং জলজ পরিবেশে কাটায়। বেশিরভাগ প্রজাতি পুরোপুরি স্থলভাগে কাটায়, কেউ বৃক্ষবাসী। এমনকি কিছু প্রজাতি রয়েছে যারা জীবনের পুরো সময় স্থলভাগেই কাটায়। শীতল রক্তবিশিষ্ট হওয়ায় এদের মেরু এবং তুন্দ্রা অঞ্চল বাদে সব জায়গায় দেখা যায়। প্রজাতি অনুযায়ী সরীসৃপদের খাদ্যাভাস বিভিন্নরকম হয়। কিছু প্রজাতি শিকারি হলেও অনেক প্রজাতিই তৃণভোজী। এরা পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখতে এবং দুর্গন্ধ দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পাখি (Birds)

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মাঝে পাখির পরিচিতিমূলক আলোচনা প্রায় অপরিহার্য। পালক আবৃত মেরুদণ্ডী হিসেবে পাখি পৃথিবী অঞ্চল, এমনকি সমুদ্রেও দেখা যায়। এখনও পর্যন্ত প্রায় সাড়ে দশ হাজার প্রজাতির পাখি আবিষ্কৃত হয়েছে এবং ক্রমাগতই এর সংখ্যা বাড়ছে। প্রজাতি অনুসারে পাখি উড়তে কিংবা সাঁতার কাটতেও পারে। পাখিরা উষ্ণ রক্তবিশিষ্ট প্রাণি। এদের খাদ্যাভাস বৈচিত্র্যপূর্ণ। এরা ফলমূল থেকে শুরু কীটপতঙ্গ সবই খায়। শরীর হালকা এবং হাঁড় ফাঁপা হওয়ায় এদের অনেক প্রজাতি উড়তে পারে।

স্তন্যপায়ী প্রাণি (Mammals)

প্রাণিজগতের সবচেয়ে বুদ্ধিমান দল হলো স্তন্যপায়ী। স্তন্যপায়ী প্রাণিরা পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র বসবাস করছে। স্তন্যপায়ীরা আকারে ৩০-৪০ মিলিমিটার (বাঁদুড়) থেকে ৩৩ মিটার (নীল তিমি) পর্যন্ত হতে পারে। স্তন্যপায়ীরা জন্মের পর মায়ের স্তনপানের মাধ্যমে বেড়ে ওঠে। এরা উষ্ণ রক্তবিশিষ্ট এবং এদের শরীর লোমাবৃত। জন্মের পরে কিছুকাল এরা প্যারেন্টাল কেয়ার কিংবা বাবামায়ের যত্নে বেড়ে ওঠে। বাসস্থান অনুযায়ী এদের খাদ্যাভাস একেকরকম। এরা যেমন মাংসাশী হতে পারে (যেমন-বাঘ) আবার তৃণভোজীও হতে পারে (যেমন-হরিণ)। জলজ স্তন্যপায়ীরা (যেমন ডলফিন, তিমি) সামুদ্রিক জীব এবং মাছ খেয়ে বেঁচে থাকে।

বাস্তুতন্ত্রে ভারসাম্য রক্ষার্থে সকল মেরুদণ্ডী এবং অমেরুদণ্ডী প্রাণি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ প্রত্যেকের বাস্তুতন্ত্রে আলাদা আলাদা ভূমিকা রয়েছে। পরস্পরের অস্তিত্ব রক্ষার্থে প্রাণিদের মাঝে নানারকম আদান-প্রদান দেখা যায় যা ক্ষেত্রবিশেষে কোনো প্রজাতির জন্যে ক্ষতিকর কিংবা লাভজনক হতে পারে। তবে এই আন্তঃসম্পর্ক জালের ফলে ভারসাম্য রক্ষা হয়। কোনো একটি উপাদানের পরিবর্তন কিংবা বিলুপ্তির ফলে পুরো বাস্তুতন্ত্রে এবং বৃহৎ চিত্রে সমগ্র পরিবেশেই খারাপ প্রভাব পড়ে। বাস্তুতন্ত্রে কোনো প্রজাতি ভিন্ন প্রজাতিভুক্ত প্রাণির দেহে জীবনের এক বা একাধিক পর্যায়ে বাস করতে পারে। এধরনের সম্পর্কে পরজীবিতা (Parasitism) বলা হয়। পরজীবিতায় বেশিরভাগ সময়ই পোষক জীব ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যেমন- উঁকুন। যখন কোনো প্রজাতির নির্ভরশীলতার ফলে অন্য প্রজাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, বরং ক্ষেত্রবিশেষে লাভবান হয় তাকে সহভোজিতা (Commensalism) বলে। যেমন গৃহপালিত পশুর গায়ে থেকে বক পোকামাকড় খায় যা সহভোজিতার উদাহরণ। এছাড়া উভয় প্রাণি যখন উপকৃত হয় তাকে পারস্পারিকতা (Mutualism) বলে। যখন ভিন্ন প্রজাতির মাঝে দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্কের ফলে দুই প্রজাতিই উপকৃত হয় তাকে মিথোজীবিতা বলা হয়। বাস্তুতন্ত্রে এধরনের আন্তঃসম্পর্কগুলোর ফলে খাদ্যাশৃঙ্খল বজায় থাকে।

এছাড়াও পরিবেশে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা দেখা যায়। মাইগ্রেশন কিংবা পরিযায়ন এরমধ্যে অন্যতম। ঋতু পরিবর্তন, খাদ্য স্বল্পতা, জলবায়ু পরিবর্তন কিংবা বংশানুক্রমিক ধারার ফলে কোনো প্রজাতি নিজ অঞ্চল থেকে দূরবর্তী কোনো অঞ্চলে গমন করাকে পরিযায়ন বলা হয়। সবচেয়ে পরিচিত পরিযায়নের উদাহরণ হলো পাখির পরিযায়ন। শীতকালে আমরা অসংখ্য পরিযায়ী পাখি দেখি যারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ঋতু পরিবর্তন কিংবা খাদ্য স্বল্পতার জন্য বাংলাদেশে আসে। তবে কোনো প্রজাতি নিজ অঞ্চল ছেড়ে অন্যকোনো অঞ্চলে গিয়ে বংশবিস্তার করলে এবং সে অঞ্চলের পরিবেশ এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের ক্ষতি করলে তাকে আক্রমণকারী প্রজাতি (Invasive species) বলা হয়। যেমন- কচুরিপানা বাইরে থেকে সৌন্দর্যবর্ধনের জন্যে নিয়ে আসা হলেও বর্তমানে তা সংখ্যাবৃদ্ধি করে দেশের বেশিরভাগ জলাধারে ছড়িয়ে গিয়েছে এবং জলজ উদ্ভিদ এবং প্রাণিদের ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

পরিবেশ রক্ষার্থে পরিবেশের উপাদান এবং এদের মাঝে পারস্পারিক সম্পর্ক বোঝা জরুরি। মানবসভ্যতার উন্নয়নের সাথে সাথে পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে নানানভাবে। এর মাঝে সবচেয়ে আশঙ্কাজনক হলো বন্যপ্রাণির বিলুপ্তি। বন্যপ্রাণি সংরক্ষণ করা বাস্তুতন্ত্র এবং পরিবেশের জন্য দরকারি। তাই বন্যপ্রাণির জীবনতত্ত্ব এবং বাস্তুতন্ত্রে এদের আন্তঃসম্পর্কগুলো সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে হবে। এদের সংরক্ষণের উদ্যোগ নিতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ দূষণ রোধ করে একটি সুস্থ পৃথিবী গড়ে তোলার জন্য সকলের নিজ নিজ অবস্থান থেকে সচেতন হতে হবে।



বন্যপ্রাণী যে স্থানে বাস করে মূলত সেটিই তার আবাসস্থল। আমাদের দেশের প্রায় ২৩ লক্ষ হেক্টর বনভূমি রয়েছে যা দেশের মোট ভূমির ১৫.৫৮ শতাংশ। দেশের বনভূমির বেশিরভাগ অংশ জুড়েই রয়েছে পার্বত্য বনভূমি, সমতলীয় শালবন ও উপকূলীয় বনাঞ্চল। এ বনাঞ্চলসূহই দেশীয় বন্যপ্রাণীর প্রধান আবাসস্থল হিসেবে বিবেচিত। এই অধ্যায়ে আমরা বাংলাদেশে বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল নিয়ে আলোচনা করবো। বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল দুই ধরনের হতে পারে – ক. স্থলজ আবাসস্থল (Terrestrial Habitats) ও খ. জলজ আবাসস্থল (Aquatic Habitats)

2.1 স্থলজ আবাসস্থল

ভৌগলিক অবস্থান ও বনের চরিত্র অনুযায়ী বন্যপ্রাণীর বিভিন্ন রকমের স্থলজ আবাসস্থল আছে বাংলাদেশে। এই পার্বত্য বনভূমি ও সমতলীয় শালবন অঞ্চলই বাংলাদেশের স্থলভাগে বন্যপ্রাণীর মূল আবাসস্থল হিসেবে বিবেচিত। এছাড়াও স্থলজ আবাসস্থল হিসেবে তৃণভূমি, ফসলি জমি, বাঁশবন ও গ্রামীণ বন বা জঙ্গল উল্লেখযোগ্য।

2.1.1 পার্বত্য বনভূমি

বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব অংশে অবস্থিত ক্রান্তীয় পার্বত্য বন বা পাহাড়ি বন, যার বেশিরভাগ মিশ্র-চিরসবুজ বন যা ৬৮০,০০০ হেক্টর জমি জুড়ে বিস্তৃত। উত্তর-পূর্ব এলাকার বনগুলি বেশিরভাগই খণ্ডিত এবং এটি দক্ষিণে অপেক্ষাকৃত বড় মিশ্র-চিরসবুজ বনে বিস্তৃত হয়েছে। এ বনের জলবায়ু মূলত আর্দ্র তাই বাংলাদেশের এই অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়। দেশের দক্ষিণ-পূর্ব এলাকাজুড়ে চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের পাহাড়ি বনাঞ্চল। উত্তর-পূর্ব এলাকার সিলেট ও মৌলভীবাজার জেলায়ও এই বনের বিস্তৃতি দেখা যায়।

এই বনে রয়েছে গর্জন (*Dipterocarpus terbinatus*), বৈলাম (*Anisoptera scaphula*), সিভিট (*Swintonia floribunda*), চাপালিশ (*Artocarpus chaplasha*), জারুল (*Lagerstroemia speciosa*), ডুমুর (*Ficus auriculata*), আমলকি (*Phyllanthus emblica*), ভাদি (*Engelhardtia spicata*), কালোজাম (*Eugenia janbulana*), নাগেশ্বর (*Mesua ferrea*), গোদা (*Vitex heterophylla*) সহ আরও অনেক জাতের বৃক্ষ। বাংলাদেশের এই পার্বত্য বনে এশিয়ান হাতি (*Elephas maximus*), কালো ভাল্লুক (*Ursus thibetanus*), সূর্য ভাল্লুক (*Helarctos malayanus*) চশমাপরা হনুমান (*Trachypithecus phayrei*), উল্লুক (*Hoolock hoolock*), লজ্জাবতি বানর (*Nycticebus bengalensis*), পাতি শিয়াল (*Canis aureus*), বন কুকুর (*Cuon alpinus*) বনমোরগ (*Gallus gallus*), বনছাগল (*Capricornis rubidus*), সজারু (*Hystrix brachyura*), সাধারণ হরিণ (*Rusa unicorn*) সহ

ইত্যাদি স্তন্যপায়ী; পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা সাপ গোলবাহার বা জালি অজগর (*Python reticulatus*) পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা বিষধর সাপ রাজ গোথরা (*Ophiophagus hannah*), এশিয়ার সবচেয়ে বড় কচ্ছপ শিলা কচ্ছপ (*Manouria emys*), তিন প্রজাতির গুইসাপ (*Varanus spp*), তক্ষকসহ অনেক জাতের সরীসৃপ, নানা প্রজাতির ব্যাঙ, রাজ ধনেশ (*Buceros bicornis*), কাঠ ময়ূর (*Polyplectron bicalcaratum*), বনমোরগ (*Gallus gallus*), পাহাড়ি ময়না (*Gracula religiosa*) সহ নানান জাতের পাখি ইত্যাদি প্রাণীর দেখা মেলে। এই বনাঞ্চল থেকে হারিয়ে গেছে – গন্ডার, ভাদি হাঁস (*Asarcornis scutulata*) সহ আরো অনেক প্রজাতির প্রাণী।

2.1.2 সমতলীয় শালবন

যে সব বনে বেশিরভাগ উদ্ভিদের পাতা শীতকালের শেষের দিকে ঝরে পড়ে, সেগুলিই মূলত পত্রঝরা বা পর্ণমোচী বনাঞ্চল। এসব বন শাল-প্রধান (*Shorea robusta*) হওয়ায় এগুলোকে সমতলীয় শাল বনও বলা হয়। এই বন বাংলাদেশের মাঝামাঝি ও উত্তরের অপেক্ষাকৃত শুষ্ক অঞ্চলে ছড়ানো ছিটানো আছে। এই পর্ণমোচী বন প্রায় ১২০,০০০ হেক্টর, যা বাংলাদেশের মোট ভূমির প্রায় ০.৮১% অংশ জুড়ে রয়েছে। প্রধানত গাজীপুর, নেত্রকোণা, শেরপুর, জামালপুর, টাঙ্গাইল, রংপুর, দিনাজপুর, পঞ্চগড়, কুমিল্লা জেলায় পত্রঝরা বনাঞ্চল অবস্থিত। বেশিরভাগ পত্রঝরা বন টাঙ্গাইলের পূর্বাংশ, ময়মনসিংহের পূর্বাংশ ও পশ্চিমাংশে এবং গাজীপুর জেলার উত্তরাংশ নিয়ে গঠিত। মধুপুরের গড় ও ভাওয়ালের গড় নামে পরিচিত শালবনের দৈর্ঘ্য প্রায় ৬০ মাইল এবং প্রস্থ স্থান বিশেষে ৫-২৫ মাইল, মোট আয়তন প্রায় ৯০০ বর্গমাইল। উত্তরাঞ্চলের শালবন বরেন্দ্র বনাঞ্চল নামেও পরিচিত। এছাড়া কুমিল্লা জেলার লালমাই শালবন বিহার ও ময়নামতিতে প্রায় ২০০ হেক্টর এলাকায় পত্রঝরা বনাঞ্চল রয়েছে। অবস্থানগত পার্থক্য থাকলেও এসকল বনের বৈশিষ্ট্যগত তেমন পার্থক্য নেই। পত্রঝরা বনের মাটি সর্বত্রই প্রায় লালচে হলুদ। উত্তরাঞ্চলের কোনো কোনো বনের মাটি হালকা বাদামি বা বাদামি-লালচে। শীতকালে মাটি শুষ্ক থাকে কিন্তু বৃষ্টিপাতের পর কাদায় পরিণত হয়। এ বনের মাটি অনেকটা মধুপুর বনের মাটির মতো।

এ বনাঞ্চলের প্রধান উদ্ভিদসমূহ হল-শাল (*Shorea robusta*), বেল (*Aegle marmelos*), নিম (*Azadirachta indica*), সোনালা (*Cassia fistula*), বাবলা (*Acacia nilotica*)। এই পর্ণমোচী বনে রয়েছে তক্ষক (*Gekko gekko*), গুইসাপ (*Varanus bengalensis*), রক্তচোষা (*Calotes versicolor*), শঙ্খিনী (*Bungarus fasciatus*) এবং গোথরা (*Naja naja*), ২০০-২৫০ প্রজাতির পাখি এবং স্তন্যপায়ীদের মধ্যে রয়েছে রেসাস বানর (*Macaca mulatta*), লালবুক হনুমান (*Trachypithecus pileatus*), গন্ধগোকুল (*Viverra zibetha*), কাঠবিড়ালী ও বাদুর ইত্যাদি। তবে একটা সময়ে শালবনে হাতি, বাঘ ও হরিন ছিল কিন্তু সেসব এখন আর নেই।

2.1.3 অন্যান্য স্থলজ আবাসস্থল

তোমরা আগেই জেনেছ পার্বত্য ও সমতলভূমির বন ছাড়াও স্থলজ আবাসস্থল হিসেবে বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রাকৃতিক অঞ্চল যেমন – তৃণভূমি, বাঁশবন, ও গ্রামীণ বন বা জঙ্গল রয়েছে, যেখানে বিভিন্ন প্রজাতির বন্যপ্রাণী বসবাস করে থাকে।

2.1.3.1 তৃণভূমি

তৃণভূমি এমন অঞ্চল যেখানে গাছপালার মধ্যে ঘাসের আধিপত্য থাকে। তবে শর এবং নলখাগড়া ও দেখা যায়। সঙ্গে নানা অনুপাতে ক্লোভার (ত্রিপত্রবিশেষ) এর মতো শিম জাতীয় গুল্ম এবং অন্যান্য ভেষজ পাওয়া যায়। বাংলাদেশের অধিকাংশ তৃণভূমি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। বেশিরভাগ অবশিষ্ট তৃণভূমি অঞ্চলগুলি খণ্ডিত ও ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। চাষাবাদের জন্য প্রচুর ব্যবহৃত হওয়ার এবং বছরে তিনবার পর্যন্ত ফসল ফলানো হয় ঘাসজমিতে। অধিকন্তু, উত্তর-পূর্ব বাংলাদেশের খাগড়ার জমিগুলি কাগজ উৎপাদনের জন্য ইজারা দেওয়া হয়েছিল এবং পরবর্তীতে তা ক্রমান্বয়ে বিলুপ্ত হয়ে যায়। নদী ও হ্রদের আশেপাশের উঁচু তৃণভূমিও বাংলাদেশে বিদ্যমান ছিলো। জলাশয় সংলগ্ন এইসব তৃণভূমিতে ইকরা, হোগলা, নল-খাগড়া, উলু প্রভৃতি উদ্ভিদের এর আধিপত্য ছিল। তৃণভূমিতে বিভিন্ন প্রজাতির তৃণভোজী বন্যপ্রাণীরা চরে বেড়াতে একসময়, এবং জলাশয় সংলগ্ন তৃণভূমিতে মাছরাঙা, পানকৌড়ি, ডাছক, জল-ময়ূর সহ আরো অনেক জাতের পাখি বাসা তৈরী করে।

বাংলাদেশের নদী কিংবা জলাভূমিকে কেন্দ্র করে খাগড়া-আধিক্য তৃণভূমি একসময় ছিল নানা প্রাণীর বিচরণ ক্ষেত্র। এসব তৃণভূমিতে বিচরিত যেসব প্রাণী হারিয়ে গেছে বলে ধরা হয় সেগুলির মধ্য জাভান গন্ডার (*Rhinoceros sondaicus*), বুনো মহিষ (*Bubalus arnee*), বারশিঙ্গা (*Rucervus duvaucelii*), কৃষ্ণসার (*Antelope cervicapra*) এবং বাংলার ফ্লোরিকান (*Houbaropsis bengalensis*) উল্লেখযোগ্য।

2.1.3.2 বাঁশবন

বাংলাদেশের বিভিন্ন বনাঞ্চলে প্রাকৃতিক বাঁশবাগানগুলোর পাশাপাশি সারাদেশেই বিভিন্ন গ্রামের আনাচে-কানাচে প্রচুর বাঁশবাগান বা বাঁশঝাড় দেখা যায়। গ্রামের মানুষ ঘরবাড়ি, গৃহপালিত পশু-পাখির ঘর, ক্ষেতের বেড়া, নদী পারা পারে সঁকো তৈরী ছাড়াও গৃহস্থালী নানা কাজে ও বিভিন্ন সামগ্রী তৈরিতে বাঁশ ব্যবহার করে। এসব বাঁশঝাড় বক-জাতীয় পাখিদের কলোনী (একসাথে অনেক পাখি বাসা তৈরী করে) ছাড়াও দোয়েল, শালিক, কাঠবিড়ালী সহ নানা বন্যপ্রাণী বাস করে।

2.1.3.3 গ্রামীণ বন বা জঙ্গল

তথাকথিত ঘন বনাঞ্চল বাদেও লোকালয়ের মাঝে বা গ্রামীণ এলাকায় বাড়ির আওনা ও তার আশে পাশে স্থানীয় ফলদ ও অন্যান্য গাছপালা মিলে গৃহস্থালী বন তৈরী হয়। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বনগুলো স্থানীয় বন্যপ্রাণীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ আবাসস্থল। বন বিড়াল, মেছো বিড়াল, পাতিশিয়াল, কাঠবেড়ালি, সজারু, সাপ ও নানা জাতের পাখি (জাতীয় পাখি দোয়েল, বুলবুলি, ঘুঘু, শালিক) এই ছোটো

ছোটো বাগান সদৃশ বনে বাসা তৈরী করে। মানুষের দৈনন্দিন জীবন ও বন্যপ্রাণীর সাথে নিয়মিত সংযোগের জন্য এই ধরনের বনাঞ্চল গুরুত্বপূর্ণ অনেক। একসময় গ্রামীণ বনের গাছেগাছে নানান জাতের পাখির বাসা ঝুলতে দেখা যেত। বর্তমানে নগরায়ন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, কৃষিকাজ সম্প্রসারণের জন্য এই বনাঞ্চল আশংকাজনক ভাবে হ্রাস পাচ্ছে।

2.2 জলজ আবাসস্থল

এবার আসা যাক জলজ আবাসস্থল নিয়ে। বাংলাদেশের জলজ আবাসস্থলকে মূলত তিনভাগে বিভক্ত করা যায় – মিঠাপানির আবাসস্থল, উপকূলীয় আবাসস্থল ও সামুদ্রিক আবাসস্থল – বঙ্গোপসাগর।

2.2.1 মিঠাপানির আবাসস্থল

হিমালয়ের পাদদেশে জালের মতো ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য নদ-নদী নিয়ে গঠিত আমাদের এই বাংলাদেশ। পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনাসহ অন্যান্য নদীগুলি একটি বিস্তৃত জালিকা তৈরি করে বাংলাদেশকে জড়িয়ে রেখেছে। এই জলপথ জলজ জীবজগত ও মানুষ উভয়ের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ। নদীর এ বিস্তৃত অঞ্চল ছাড়াও বাংলাদেশ জলাভূমি, হ্রদ, হাওর, বাওর এবং বিল দিয়ে ঘেরা। এই মিঠাপানির জলাশয়ের পানি মানুষের প্রয়োজন ছাড়াও অধিকাংশ স্তন্যপায়ী প্রাণীর খাবার, মাছের আবাসস্থল এবং কৃষি জমির সেচের পানির অন্যতম উৎস। মিঠাপানির জলাশয় বন্যা থেকে রক্ষা পেতেও গুরুত্বপূর্ণ সাহায্য করে। মিঠাপানির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আবাসস্থল হলো নদীর চরাঞ্চল। এ চরাঞ্চলগুলোতে পানকৌড়ি, মাছরাঙ্গা, বক, কাঁকড়া, সাপ, শেয়াল, ব্যাঙ, হাঁস ও কচ্ছপ দেখা যায়।

বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নিম্নভূমিতে মিঠাপানির যে আবাসস্থল অবস্থিত তা আমরা জলাবন হিসেবে চিহ্নিত করে থাকি। এই ধরনের বনে বন্যা-সহনশীল চিরহরিৎ গাছ রয়েছে যা মিঠাপানির জলাভূমির ১০-১২ মিটার উচ্চতার বন্যার পানিতে সহনশীল। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব দিকে বিভিন্ন সোয়াম্প ফরেস্টের মধ্যে রাতারগুল জলজবন অন্যতম। মিঠাপানির জলাভূমির গাছগুলির বিস্তৃত শিকড় ব্যবস্থার কারণে এটা ঘনিষ্ঠ ছাউনির মত তৈরি করে। এই বনের প্রধান বৃক্ষ প্রজাতি গুলো হলো: নোনা হিজল (*Barringtonia asiatica*), করচ (*Pongamia pinnata*) নল খাগড়া (*Phragmites karka*), হরগজা (*Acanthus ilicifolius*)। এই সকল গাছের বীজ মূলত জলের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে এবং কাদার সাথে যুক্ত হয়ে পুনরুৎপাদিত হয়। এই বনের বন্যপ্রাণী হলো: বানর, কাঠবিড়ালী, ভেড়াদাঁড়, সাপ ও পাখি।

মিঠাপানির জলাশয় হিসেবে টাংগুয়ার হাওর, হাইল হাওর ও বাইক্লা বিলের নাম উল্লেখযোগ্য। এ জলাশয়গুলি আন্তর্জাতিক ফ্লাইওয়ে সাইটের অন্তর্গত, যা দেশী ও পরিযায়ী পাখি সংরক্ষণের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এসব জলাশয়ে শীতকালের পাশাপাশি সারা বছরই পরিযায়ী পাখির দেখা মেলে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: রাজহাঁস, দাগী রাজহাঁস, রাজ সরালি, পাতি সরালি, ঝুঁটি হাঁস, চকাচকি, লেজা হাঁস, খুন্তে হাঁস, বালি হাঁস, তিলি হাঁস, লালশির, নীলশির, গিরিয়া হাঁস, পিয়ং হাঁস, ভুতি হাঁস, স্মিট হাঁস, পাতি মারগেজার, ওমচা, পাপিয়া, খঞ্জন, ফুটকি, সাহেলি, চ্যাগা, গুলিন্দা, সারস, গ্রিধিনি, মানিকজোড়, এশীয় শামোকখোল, নীলকণ্ঠ ইত্যাদি।

টাঙ্গুয়ার হাওর বাংলাদেশের বৃহত্তম জলমহালগুলোর মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা এবং তাহিরপুর উপজেলায় অবস্থিত এ হাওর স্থানীয় লোকজনের কাছে *নয়কুড়ি কান্দার ছয়কুড়ি বিল* নামে পরিচিত। হিজল-করচ বন ও নলখাগড়া বনসহ বর্ষাকালে সমগ্র হাওরটির আয়তন দাঁড়ায় প্রায় ২০,০০০ একর। প্রকৃতির অকুপণ দানে সমৃদ্ধ এ হাওর পাখি, মাছ এবং অন্যান্য জলজ প্রাণীর এক বিশাল অভয়াশ্রম। টাঙ্গুয়ার হাওরে ১৬৭ প্রজাতির পাখি পাওয়া যায়; যার মোট সংখ্যা ৬৫ হাজারের বেশি। জলচর পাখি জরিপের গণনা অনুযায়ী, প্রতি বছর শুধু শীতকালেই পৃথিবীর বিভিন্ন শীতপ্রধান দেশ থেকে প্রায় ৮৪ প্রজাতির পরিযায়ী পাখিরা এ হাওরকে নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে বেছে নেয়। ২০২৩ সালে পরিচালিত জলচর পাখিশুমারী অনুযায়ী, ৬৫ প্রজাতির ৫৪,১৮০টি জলচর পাখি পাওয়া গেছে। এ হাওরে বিশ্বব্যাপী বিপন্ন ও বিপদাপন্ন পাখি প্রজাতির মধ্যে বৈকাল-তিলিহাঁস (*Baikal teal*, *Sibirionetta formosa*) এর দেখা মেলে। বাংলাদেশে ‘মহাবিপন্ন’ এবং বিশ্বে ‘বিপন্ন’ প্রাণী হিসেবে বিবেচিত পালাসি-কুরাঙ্গলের (*Pallas's fish eagle*, *Haliaeetus leucoryphus*) দেখা মেলে এ হাওরের হিজল-করচ গাছে। এরা শীত মৌসুমে এদেশে আসে এবং প্রজনন শেষে বর্ষা মৌসুমে উত্তর মেরুর দিকে চলে যায়।

হাকালুকি হাওর বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ হাওর। এই হাওর মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা, কুলাউড়া ও সিলেট জেলার ফেঞ্চুগঞ্জ, গোলাপগঞ্জ ও বিয়ানীবাজার জুড়ে বিস্তৃত। হাকালুকি হাওরের বিশাল জলরাশির মূল প্রবাহ হলো জুরী এবং পানাই নদী। হাকালুকি হাওরে ছোট, বড় ও মাঝারি আকারের প্রায় ২৩৮টি বিল রয়েছে। প্রায় সারাবছরই বিল গুলোতে পানি থাকে। শীতকালে এসব বিলকে ঘিরে পরিযায়ী পাখিদের বিচরণে মুখর হয়ে উঠে গোটা এলাকা। এ হাওরে বিশ্বব্যাপী মহাবিপন্ন বেয়ারের-ভুতিহাঁস (*Baer's pochard*; *Aythya baeri*). সংকটাপন্ন পাতি-ভুতিহাঁস (*Common pochard*; *Aythya ferina*), প্রায়-সংকটাপন্ন মরচেরং-ভুতিহাঁস (*Red-crested pochard*; *Netta rufina*) ইত্যাদি পাখি প্রজাতির দেখা মেলে।

এছাড়া **হাইল হাওর** বাংলাদেশের বৃহত্তর সিলেটের মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার বেশ কিছু অংশ জুড়ে অবস্থিত একটি বৃহদায়তন জলাভূমি। এতে রয়েছে ১৪টি বিল এবং পানি নিষ্কাশনের ১৩টি নালা। তন্মধ্যে বাইক্লা বিলে প্রতিবছর শীত মৌসুমে প্রচুর পরিযায়ী পাখির সমাগম ঘটে। ২০১১ সালে নতুন ৪টি পরিযায়ী পাখির দেখা মিলেছে এ বিলের চারপাশের বনে; সেগুলো হলো: বড়ঠুটি-নলফুটকি, উদয়ী-নলফুটকি, বৈকাল-ঝাড়ফুটকি ও সাইক্লের-ফুটকি।

2.2.2 উপকূলীয় আবাসস্থল

বাংলাদেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর বরাবর একটি বিস্তৃত উপকূলরেখা রয়েছে, এই সমুদ্রসৈকত পৃথিবীর অন্যতম দীর্ঘতম প্রাকৃতিক সমুদ্রসৈকত। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল বিভিন্ন ধরনের বাস্তুতন্ত্রের ধারক। সুন্দরবন, মোহনা অঞ্চল ও

গভীর সমুদ্রে বিচিত্র জীবজগতের অস্তিত্ব রয়েছে। বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত। বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ এই রামসার সাইটটি অন বেঙ্গল টাইগার সহ অসংখ্য প্রজাতির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ আবাসস্থল। জোয়ারের জলপথ, কাদা এবং অসংখ্য খালের জটিল জালিকা সুন্দরবনকে জীবজগতের এক অনন্য আবাসস্থল হিসাবে পরিচিত করেছে।

2.2.2.1 সুন্দরবন

বাংলাদেশের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত বঙ্গোপসাগরের উপকূলীয় এলাকার জোয়ার-ভাটায়ুক্ত বনকে বাদা বন বা ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট বা সুন্দরবন বলা হয়। এ বনের মাটি প্রতিদিন দুইবার জোয়ারের পানিতে তলিয়ে যায়। পুরো সুন্দরবনের আয়তন প্রায় ১০,০০০ বর্গ কিলোমিটার। এ বনের শতকরা ৬০ ভাগ বাংলাদেশে ও বাকি ৪০ ভাগ ভারতে অবস্থিত। বাংলাদেশের অংশ সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, বরগুনা ও পটুয়াখালীর উপকূল অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত। এর ভিতর দিয়ে হাড়িভাড়া, রায়মঙ্গল, মালঞ্চ, শিবসা, পশুর ও বেলেশ্বর নদী প্রবাহিত হচ্ছে। বাংলাদেশের অংশের পরিমাণ ৬,০১৭ বর্গকিলোমিটার। কক্সবাজার জেলার চকোরিয়ায় সুন্দরবনের অনুরূপ একটি বন আছে যে বন “চকোরিয়া সুন্দরবন” নামে পরিচিত। সুন্দরবন ক্রান্তীয় অঞ্চলে অবস্থিত হলেও সমুদ্র উপকূলবর্তী হওয়াতে এর জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ ও আর্দ্র। এখানে গড় বৃষ্টিপাত প্রায় ২০০ সেন্টিমিটার। অনেক নদী, খাল জালের মতো ছড়িয়ে থাকার কারণে এটি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হয়েছে। পলি ও বেলে মাটির সাথে হিউমাস মিশ্রিত ভেজা মাটিই এ বনের মাটির প্রধান বৈশিষ্ট্য। সুন্দরবনের মাটি লবণাক্ত। এর উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকের উদ্ভিদের ভিতর কিছু পার্থক্য দেখা যায়।

এ বনাঞ্চলের প্রধান কিছু উদ্ভিদ হল-সুন্দরী (*Heritiera fomes*), গেওয়া (*Excoecaria agallocha*), গোলপাতা (*Nipa fruticans*), পশুর (*Carapa moluccensis*), বাইন্ (*Avicennia officinalis*), গরান্ (*Ceriops decandra*), কেওড়া (*Sonneratia apetala*) ইত্যাদি। বাদা বন তথা ম্যানগ্রোভ বনে কাঁকড়া, চিংড়ি সহ নানা জাতের অমেরুদণ্ডী প্রাণী ছাড়াও প্রায় ৪০০ প্রজাতির মাছ, সবুজ ব্যাঙ (*Euphyllactus hexadactylus*), সোনা ব্যাঙ (*Hoplobatrachus tigerinus*) সহ ১০ প্রজাতির উভচর, অজগর (*Python molurus*), গুইসাপ (*Varanus salvator*), কুমির (*Crocodylus porosus*), কাছিম (*Nilssonia hurum*), রাজ্ গোখরা (*Ophiophagus hannah*) সহ প্রায় ৫০ প্রজাতির সরীসৃপ, কালামুখ-প্যারাপাখি বা Masked Finfoot (*Heliopais personatus*), শঙ্খ চিল বা Brahminy kite (*Haliastur indus*), White-bellied Sea Eagle (*Haliaeetus leucogaster*), Mangrove Pitta (*Pitta megarhyncha*) সহ ৩০০ অধিক প্রজাতির পাখি পাওয়া যায়। এছাড়া স্তন্যপায়ীদের মধ্য বাঘ (*Panthera tigris*), চিত্রা হরিণ (*Axis axis*), বন্যশুকর (*Sus scrofa*), ভোঁদড় (*Aonyx cinereus*) ও শুশুক (*Platanista gangetica*) উল্লেখযোগ্য।

2.2.2.2 উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ বনায়ন

নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, ভোলা, পটুয়াখালী, বরগুনা, পিরোজপুর, চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার জেলার উপকূলীয় এলাকাতে বিগত পাঁচ দশক যাবত উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ বনায়ন প্রচেষ্টা চলছে। উপকূলীয় এলাকায় জেগে উঠা চরভূমিতে ১৯৬৫ সাল থেকে এ বন সৃষ্টি করা হচ্ছে। একে প্যারাবনও বলা হয়। প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বনের মত এ বন জোয়ার-ভাটায় প্লাবিত হয়। সুন্দরবন ও উপকূলীয় বনায়নের ফলে সৃষ্ট বনাঞ্চল প্রায়শই ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের তীব্রতা হতে এ এলাকার মানুষ ও প্রাণীদের সুরক্ষা প্রদান করে। উপকূলীয় চরাঞ্চলে এ যাবৎ ২ হাজার ৫ শত ২১ বর্গ কি.মি. চর বনায়ন করা হয়েছে। এই বনগুলোতে উদ্ভিদ প্রজাতির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কেওড়া, বাইন্, গোলপাতা, হৈলা ইত্যাদি। বন্যপ্রাণীর মধ্যে সচরাচর হরিণ, মেছোবাঘ, শিয়াল ইত্যাদি দেখা যায়। কালালেজ জৌরালী, দেশি গাওঁচ্যা, কালামাথা কাস্তেচরা, খয়রাপাখ মাছরাঙা ইত্যাদি পাখির আবাসস্থল হিসাবে এসকল বনাঞ্চল উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। তাছাড়া, উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ বন মৎস্য ভান্ডারেরও একটি বিরাট উৎস। এখানে ভেটকি, পারসে, গলদা, বাগদা ইত্যাদি মাছ পাওয়া যায়। উপকূলীয় এসব অঞ্চলে ছোট-বড় নানা চর ও দ্বীপাঞ্চল রয়েছে। এই চরগুলো নানা জলচর ও পরিযায়ী পাখির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ আবাসস্থল। বিপন্ন দেশি গাওঁচ্যা (Indian Skimmer), বাদামী মাথা গাংচিল (Brown-headed Gull) ও ধূসর রাজহাঁসের দেখা পাওয়া যায় এই চরগুলোতে।

2.2.2.3 সেইন্ট মার্টিন'স দ্বীপ

বাংলাদেশের সেইন্ট মার্টিন'স দ্বীপে (নারিকেল জিনজিরা নামে পরিচিত) প্রবাল-সমৃদ্ধ প্রাকৃতিক আবাসস্থলের দেখা মেলে। বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণ অংশে বঙ্গোপসাগরের উত্তর-পূর্বে কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলা থেকে ৯ কিমি দক্ষিণে গড়ে ওঠা একটি ছোট দ্বীপ। এই অঞ্চলে বসবাসরত জলজ প্রাণীরা অনেকাংশে বৈচিত্র্যময় এবং পর্যটক ও গবেষকদের মনোযোগের কেন্দ্রে রয়েছে। সেইন্ট মার্টিন'স প্রবাল (প্রবাল সৃষ্ট চূনাপাথর), বিনুক-শামুকের খোলস সৃষ্ট কোকুইনা স্তর দ্বারা গঠিত। অত্যন্ত প্রবেশ্য (permeable) এবং রন্ধ্রযুক্ত (porous) হওয়ার জন্য বিনুক-শামুকের খোলস সৃষ্ট চূনাপাথর যেখানে পলল স্তরের নিচে সঞ্চিত হয় সেখানে একটি ভূগর্ভস্থ জলস্তরের (aquifer) সৃষ্টি করে। সাম্প্রতিক (Recent) সামুদ্রিক বালি এবং বিনুক-শামুকের খোলস সৃষ্ট চূনাপাথর স্বাদু পানির প্রধান উৎস। সমস্ত দ্বীপ জুড়ে ভাটার পানি স্তরের অত্যন্ত কাছাকাছি ক্ষুদ্র খাড়িসমূহে বিভিন্ন ধরনের জীবিত ছোট ছোট প্রবাল গোষ্ঠী দেখা যায়। দ্বীপের চারপাশে অগভীর সমুদ্রেও এদের দেখা যায়। প্রধানত সৈকত শিলা (beach rock) জমে থাকা পাথরে এবং চুনযুক্ত বেলেপাথরে বেড়ে ওঠে। মৃত প্রবাল গোষ্ঠীগুলি ক্ষুদ্র জলমগ্ন নিম্নভূমিতে জোয়ারভাটা উভয় সময়েই দেখা যায়। এদের কিছু কিছু ভাটার সময়ের পানি স্তরের চেয়ে প্রায় ৩.৫০ মিটার উপরেও দেখা যায়। সেইন্ট মার্টিন দ্বীপ জীববৈচিত্র্যের দিক দিয়ে পৃথিবীর মধ্যেই অনন্য। সেখানে স্বচ্ছ পানির কারণে প্রবাল জন্ম নেয়। সাধারণত সামুদ্রিক দ্বীপে জলরাশির তাপমাত্রা, পানিতে লবণের পরিমাণ, বালুকণার পরিমাণ, পানির অম্লতা, তেউয়ের তীব্রতা, দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ প্রবালের জন্মানোর নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। তবে ধীরে ধীরে এই নিয়ামকগুলোর প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অনিয়ন্ত্রিত পর্যটন, আবাসিক হোটেলগুলোর দুর্বল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পর্যটকদের ব্যবহৃত সামগ্রী সমুদ্রের

পানিতে নিক্ষেপ, পাথর উত্তোলন, প্রবাল উত্তোলন ও উপকূলীয় এলাকায় মাছ ধরার জালের যত্রতত্র ব্যবহারের কারনে সামুদ্রিক এই দ্বীপের বিভিন্ন নিয়ামক পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে।

সেন্ট মার্টিন বৈশ্ব কয়েক প্রজাতির কচ্ছপের প্রজননক্ষেত্র। সামুদ্রিক কচ্ছপের প্রজনন মৌসুম নভেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত। এর মধ্যে সেন্ট মার্টিন দ্বীপে মা কচ্ছপ ডিম পাড়তে আসতে শুরু করে। তবে নিষিদ্ধ জালের ব্যবহার, বেওয়ারিশ কুকুরের সংখ্যা বৃদ্ধি, অতিরিক্ত পর্যটকের উপস্থিতি ও দূষণের কারণে কচ্ছপের নিরাপদ প্রজননক্ষেত্রটি যাতে ধ্বংসের সম্মুখীন হচ্ছে। শুধু প্রজনন ক্ষেত্রই নয়, অনিয়ন্ত্রিত ও অতিরিক্ত পর্যটকের আনাগোনার কারণে দ্বীপের প্রবাল ধ্বংস হচ্ছে, ভূমি, পানি ও বায়ু দূষিত হয়ে পড়ছে,। এ সকল ব্যাপারে আমাদের সকলকেই সচেতন থাকা প্রয়োজন যাতে কোনভাবে আমাদের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ সেন্ট মার্টিন দ্বীপের জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ বিনষ্ট না হয়।

2.2.2.4 অন্যান্য দ্বীপসমূহ

বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলে অসংখ্য ছোট-বড় দ্বীপ রয়েছে। এইসকল দ্বীপ আমাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক স্থান হিসাবে বিবেচিত। এইসবের মধ্যে অন্যতম দ্বীপগুলো হলো: দুবলার চর যা বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ শুল্কিকি পল্লী হিসেবে পরিচিত, বাংলাদেশের একমাত্র পাহাড়ি দ্বীপ মহেশখালী, সোনাদিয়া ও নিঝুম দ্বীপ। তন্মধ্যে সোনাদিয়া ও নিঝুম দ্বীপ আন্তর্জাতিক ফ্লাইওয়ে সাইটের অন্তর্ভুক্ত।

সোনাদিয়া দেশের সর্বদক্ষিণের জেলা কক্সবাজারের একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। বঙ্গোপসাগরের উপকূল সংলগ্ন এ দ্বীপটি নানা ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। সোনাদিয়ার প্যারাবনে প্রায় ১৯ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী, ৮ প্রজাতির সরীসৃপ, ৪ প্রজাতির উভচর প্রাণী এবং ২৭ প্রজাতির পাখির দেখা মেলে। জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ এ দ্বীপেই দেখা মেলে বিশ্বব্যাপী মহাবিপন্ন পাখি চামচটুটো বাটান (*Calidris pygmaea*)। শীতকালে এই দ্বীপে মহাবিপন্ন এ পাখি সবচেয়ে বেশি পরিমাণে দেখা যায়। কেবল সামুদ্রিক বা পরিযায়ী পাখিই নয়, দ্বীপের উপকূল ১৯ প্রজাতির চিংড়ি, লবস্টার, লাল কাঁকড়া, ১৪ প্রজাতির শামুক, ঝিনুক, ডলফিন আর নানা প্রজাতির কচ্ছপের আবাসস্থল। দ্বীপের সমুদ্র উপকূলে শীতকালে হাজার মাইল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ডিম পাড়তে আসে অসংখ্য মা-কচ্ছপ।

অপরদিকে **নিঝুম দ্বীপ** গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা নদী মোহনা মুখে অবস্থিত একটি ছোট দ্বীপ যা নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার অন্তর্গত। নিঝুম দ্বীপের পূর্ব নাম ছিলো চর-ওসমান। তবে, এটি ইছামতীর চর নামেও পরিচিত ছিল। শীতকালে, বিশেষত ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত প্রায় ১০,০০০-২০,০০০টি পরিযায়ী পাখির আনাগোনা থাকে এ এলাকা জুড়ে। পরিযায়ী পাখিদের মধ্যে বিশ্বব্যাপী বিপন্ন কিছু প্রজাতির পাখিরও দেখা মেলে এখানে। সোনাদিয়ার মতো এই নিঝুম দ্বীপেও বিশ্বব্যাপী মহাবিপন্ন চামচটুটো বাটান (*Calidris pygmaea*) এর দেখা মেলে, আর মেলে সংকটাপন্ন দেশী গাউচা (Indian Skimmer; *Rynchops albigollis*)।

2.2.3 সামুদ্রিক আবাসস্থল

বাংলাদেশের সামুদ্রিক আবাসস্থল হিসেবে আমরা মোহনা, অগভীর মহীসোপান ও গভীর সমুদ্রের অঞ্চল নিয়ে আলোচনা করবো।

2.2.3.1 মোহনা অঞ্চল

মিঠাপানির নদ-নদী ও সাগরের লোনাপানি যে এলাকায় মিলিত হয়, সেই অঞ্চলই আসলে মোহনা হিসেবে পরিচিত। সমুদ্র, স্থলভূমি ও স্বাদুপানির সমন্বয়ে গঠিত বড় নদীর স্রোতমুখে স্বাদুপানি ও সামুদ্রিক পরিবেশের মধ্যে অনন্য বৈশিষ্ট্যের একটি অন্তর্ভুক্তি এলাকা গঠিত হয়। সমুদ্র ও স্বাদুপানির অনেক জীব এখানে জীবনচক্রের একটি বিশেষ ধাপ অতিবাহিত করে। একটি মোহনার বৈশিষ্ট্য এতই গতিময় যে, সেখানে মাসে, দিনে এমনকি প্রতি ঘণ্টায়ও পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এসব পরিবর্তন পরিযায়ী জীবের ও তাদের জীবনচক্রের ওপর, এমনকি সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দাদের শারীরবৃত্তের ওপরও গভীর প্রভাব ফেলে। বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূল একটি জটিল মোহনা প্রণালীর জালিকা বিন্যাসে চিহ্নিত। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, কর্ণফুলি প্রভৃতি বড় বড় নদী প্রশস্ত মোহনা সৃষ্টি করে বঙ্গোপসাগরে এসে মিশেছে। অল্প কয়েক দশক আগেও এখানকার মোহনাগুলি মাছ ও বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ নানা জলজ প্রাণীতে যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল, কিন্তু অতি আহরণের ফলে তা এখন বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে।

2.2.3.2 অগভীর মহীসোপান

মহীসোপান হলো সমুদ্রতলের অংশ যেখানে পানির গভীরতা সর্বোচ্চ ২০০ মিটার। মহীসোপানের উপরের অগভীর পানি গভীর ও সমুদ্রের পানি থেকে পৃথক হয়ে থাকে। উপকূলীয় নদীসমূহের প্রচুর দ্রবীভূত পুষ্টি উপাদান এই অগভীর পানিতে এসে মিশে যায়। এতে পলির পরিমাণ উচ্চমাত্রায় থাকে বলে মাঝ সমুদ্রের পানির চেয়ে এ পানি কম পরিষ্কার। বিভিন্ন সামুদ্রিক উদ্ভিদ, শৈবাল, প্রবাল, ঝিনুক, শামুক, বিভিন্ন প্রজাতির গর্তবাসী, পোকামাকড়, খোলসবিশিষ্ট প্রাণী, উদ্ভিদ ও বিভিন্ন সিলেন্টারেটা (coelenterates) মহীসোপানের অগভীর পানিতে নিবাস গড়ে তোলে। এছাড়া বিভিন্ন সামুদ্রিক ক্ষুদ্র প্রাণী, স্টার ফিস, বুটল স্টার, সি কুকুমবার ও স্পঞ্জ ফিস এই অঞ্চলে বসবাস করে। বাংলাদেশের উপকূলভাগের মহীসোপানের বিস্তার স্থানবিশেষে বিভিন্ন। হিরণ পয়েন্ট ও সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ডের মধ্যে বাংলাদেশের দক্ষিণ উপকূলভাগে এর বিস্তার ১০০ কিলোমিটারের কম।

আবার কক্সবাজার উপকূলে তা ২৫০ কিলোমিটারেরও বেশি। সমুদ্রতলের শিলা বৈশিষ্ট্যাদি বিশ্লেষণে দেখা যায় বাংলাদেশের মহীসোপানে অবক্ষেপিত সূক্ষ্ম পলিকণার পরিমাণ দেশের দক্ষিণ ও পশ্চিমেই বেশি। এগুলো সবচেয়ে বেশি অবক্ষেপিত হয়েছে অন্তঃসাগরীয় গিরিখাত সোয়াচ অফ নো গ্রাউন্ডে। বাংলাদেশের মহীসোপানের বেশিরভাগ অংশ পলি ও কদমে আবৃত। চট্টগ্রাম ও টেকনাফের মহীসোপানের অগভীর অংশ (২০ মিটারের কম) বালি আবৃত এবং জোয়ারভাটার সময় সুগঠিত বালুকাবেলা দৃষ্টিগোচর হয়। এই অঞ্চলের মহীসোপানে দৃষ্ট বালু তরঙ্গের প্রকটতা খুবই উল্লেখযোগ্য (৩-৫ মিটার), যা উচ্চ শক্তিসম্পন্ন

অবক্ষেপ পরিবেশের বিদ্যমানতা প্রমাণ করে। এমনকি সুন্দরবন-পটুয়াখালী-নোয়াখালী উপকূলে অবস্থিত মহীসোপানের দক্ষিণাংশের অগভীর অংশও পলি ও কর্দমে ঢাকা, যা তীর বরাবর কর্দমপূর্ণ জোয়ারভাটা গঠিত সোপান সৃষ্টি করেছে।

2.2.3.3 গভীর সমুদ্র

গভীর সমুদ্রে গভীরতার সাথে সাথে লবণাক্ততা বেড়ে যায়, এবং সেই সাথে সেখানের বাস্তুতন্ত্রও। বাংলাদেশের দক্ষিণে সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড, যাকে স্থানীয়রা ‘নাই বাম’ বলে চিনে সেটি বাংলাদেশের সমুদ্রাঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে গভীর স্থান। সেখানে দেখা মেলে ডলফিন, তিমি সহ আরো অনেক বিরল ও বৈচিত্র্যময় সামুদ্রিক জীবের। এই সামুদ্রিক প্রাণীরা উপকূলীয় ও সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রের সূক্ষ্ম ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া উপকূলীয় সম্প্রদায়ের জীবিকাকে সমর্থন করার সাথে সাথে এই অঞ্চলের জীববৈচিত্র্যও উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রাখে।

বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য সামুদ্রিক প্রাণীর মধ্যে রয়েছে সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণী, যার মধ্যে বেশ কয়েকটি প্রজাতির ডলফিন এবং তিমি রয়েছে। ইরাবতী ডলফিন, বাংলাদেশের নদী ও মোহনায় বাস কর। আর, বোটলনোস ডলফিন প্রায়ই গভীর সমুদ্রে দেখা যায়। উপরন্তু, বঙ্গোপসাগরে ব্রেডিস তিমি, যা কিনা একটি প্রজাতির বালিন তিমি (তাদের দাঁতের পরিবর্তে বালিন রয়েছে যা তারা সমুদ্র থেকে চিংড়ির মতো ক্রিল, প্লাঙ্কটন এবং ছোট মাছ সংগ্রহ করতে ব্যবহার করে), দেখা যায়।

সামুদ্রিক কচ্ছপ বাংলাদেশের সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাণী। দেশের উপকূল মহাবিপন্ন অলিভ রিডলি কচ্ছপ সহ বিভিন্ন প্রজাতির কচ্ছপের জন্য ডিম পাড়ার জায়গা সরবরাহ করে। এই কচ্ছপগুলি সামুদ্রিক অমেরুদণ্ডী প্রাণী এবং সাগর ঘাসের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে সুস্থ সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

অতিরিক্ত মাছ ধরা এবং বাসস্থানের অবক্ষয়ের কারণে অনেক প্রজাতি আজ হুমকির সম্মুখীন। বিপন্ন প্রজাতির মধ্যে রয়েছে করাত মাছ (Sawfish), পিতাম্বর (Guitarfish) এবং বিভিন্ন প্রজাতির হাঙর ও শাপলাপাতা মাছ, যেমন সুন্দরবনের মহা বিপন্ন গ্যাঙ্গেস হাঙর (Ganges shark) আর বিশাল আকৃতির মিঠাপানির শাপলাপাতা মাছ (Giant freshwater stingray)। এদের অনেক গুলো প্রজাতি উপকূলের অগভীর পানিতে ও সুন্দরবনে বাচ্চা দিতে চলে আসে। এই প্রাণীগুলি সামুদ্রিক খাদ্য জালের ভারসাম্য বজায় রাখতে এবং অন্যান্য সামুদ্রিক প্রজাতির জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য অপরিহার্য। বাংলাদেশের সামুদ্রিক প্রাণীরা দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের পরিবেশগত স্বাস্থ্য এবং আর্থ-সামাজিক কল্যাণের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাদের সুরক্ষা এবং সংরক্ষণকে অগ্রাধিকার দেওয়ার মাধ্যমে, বাংলাদেশ তার সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র এবং তাদের উপর নির্ভরশীল সম্প্রদায়গুলির জন্য একটি টেকসই ভবিষ্যত নিশ্চিত করতে পারে।

3.1 অমেরুদণ্ডী, মাছ, উভচর, সরীসৃপ, পাখি, ও স্তন্যপায়ী প্রাণীর সাধারণ বিবরণ

3.1.1 অমেরুদণ্ডী প্রাণী

পৃথিবীতে আবিষ্কৃত প্রাণীর প্রায় শতকরা ৮০ ভাগই অমেরুদণ্ডী প্রাণী। আমাদের চারপাশে মাকড়শা, শামুক, ফড়িং, প্রজাপতি থেকে শুরু করে অসংখ্য প্রজাতির অমেরুদণ্ডী প্রাণী আছে। বাস্তুতন্ত্রে এই প্রাণীগুলোর অসামান্য অবদান ও ভূমিকা রয়েছে। উদ্ভিদের পরাগায়নের বাহকের অধিকাংশই অমেরুদণ্ডী কীটপতঙ্গ। অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ও তোমাদের পরিচিত কিছু প্রাণী নিয়ে আমরা আলোচনা করবো।

3.1.1.1 প্রজাপতি

প্রজাপতি Anthropoda পর্বের Lepidoptera বর্গের প্রাণী। প্রজাপতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর রঙিন ডানা। প্রজাপতি তার বিশাল ঞুঁড় দিয়ে মধু পান করে। আনুমানিক ২০ কোটি বছর আগে ওদের উদ্ভব হয়েছিল। বিশ্বব্যাপী ১৫-২০ হাজার প্রজাতির প্রজাপতি রয়েছে। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ৪৩০টি প্রজাতি তালিকাভুক্ত হলেও মোট প্রজাতি সংখ্যা পাঁচ শতাধিক হতে পারে।

প্রজাপতি সচরাচর দিনে ফুলে ফুলে উড়ে রস পান করে। ফুলের পরাগায়ন ও গাছের বংশবিস্তারে সাহায্য করে। জীবনচক্র ডিম, শূককীট, মুককীট ও পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গ—চার পর্বে বিভক্ত। প্রজাপতি দেখতে যতটা সুন্দর শূককীটগুলো কিন্তু মোটেও তেমন নয়। তা ছাড়া ওরা গাছের বেশ ক্ষতি করে। অবশ্য কোনো কোনো প্রজাতির শূককীট ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় খেয়ে কৃষকদের উপকারও করে। শূককীট অনেক পাখির প্রিয় খাদ্য, তাই পাখিরাও প্রজাপতির ওপর কিছুটা নির্ভরশীল।

গুরুত্বপূর্ণ প্রজাপতির গোত্রগুলির মধ্যে রয়েছে Papilionidae (সোয়ালোটাইলস), এখানে আছে লেমন বাটারফ্লাই (*Papilio demoleus* এবং *P. polytes*)। Pieridae গোত্রের প্রজাপতি সারাদেশে বিস্তৃত। এদের

ভূ-প্রাকৃতিকভাবে বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ।

সুজলা সুফলা এ দেশে একসাথে টিকে থাকে বনভূমি, বন্যপ্রাণ

আর মানুষ। আবার জীববৈচিত্র্যের সরল-সৌন্দর্যের একটি বড়

নিয়ামক হলো তার বাসস্থান। বাংলাদেশের স্থলভূমি আর

জলভূমি জুড়ে বেঁচে থাকা বন্যপ্রাণীগুলো অনেকটাই নির্ভর

যেহেতু উদ্ভিদের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত তাই পরিবেশের যেকোন প্রতিকূল পরিবর্তনে এরা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। খাদ্যচক্রে প্রজাপতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এরা পাখি, টিকটিকি এবং উভচর প্রাণীদের শিকার। আদতে কোনো বাস্তুতন্ত্র কতটা ভালো আছে, তার নির্দেশক হচ্ছে প্রজাপতি। তুষারে-মোড়ানো অ্যান্টার্কটিকা বাদে বিশ্বব্যাপী প্রজাপতির বিচরণ রয়েছে। পৃথিবীতে প্রায় ১৯ হাজার প্রজাতির প্রজাপতি আছে। তার প্রায় এক-চতুর্থাংশই অস্ট্রেলীয় অঞ্চলে বাস করে।

3.1.1.2 মৌমাছি

মৌমাছি মধু সংগ্রহকারী পতঙ্গ। এরা ফুলে ফুলে ঘুরে ফুলের নির্যাস (nectar) সংগ্রহ করে এবং তা থেকে অর্থতরল মিষ্টি, মধু প্রস্তুত করে। কর্মী বা শ্রমিক মৌমাছি এই নির্যাস খাদ্যনালীর ক্রপ বা হানি স্টমাকে (crop or honey stomach) সংগ্রহ করে এবং এখানেই উৎসেচকের বিক্রিয়ায় তা ডেক্সট্রোজ ও লিভিউলোজে পরিণত হয়। পরিবর্তিত এই অংশটুকু কর্মী মৌমাছি মৌচাকের বিশেষ প্রকোষ্ঠে জমা করে। জমা করা এ তরল অংশই মধু। বাংলাদেশে মৌমাছির প্রধানত তিনটি প্রজাতি আছে, যথা: *Apis indica*, *A. dorsata* এবং *A. florea*। বেশ কিছুদিন আগে ইউরোপ থেকে *Apis mellifera* নামক একটি প্রজাতি বাংলাদেশে আনা হয়েছে। বাংলাদেশের জন্য *A. indica* বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং কাঠের বাক্সে অর্থাৎ কৃত্রিমভাবে এদেরকে প্রতিপালন করা যায়। *A. dorsata* বন্য প্রকৃতির, জঙ্গল কিংবা বাড়ির চারদিকের বড় বড় গাছে এদের চাক দেখতে পাওয়া যায়, এমনকি ঘরের কার্নিসেও এরা বাসা বাঁধে। পেশাদার মধু সংগ্রহকারী *A. dorsata*-র কলোনিকে মধুর উৎস হিসেবে বেছে নিয়ে মধু সংগ্রহ করে। সে কারণে কোন কোন সময় এসব মৌচাক এবং মৌমাছির ক্ষতি সাধিত হয়।

মৌমাছি প্রাণিজগতের অন্যতম পরিশ্রমী পতঙ্গ। ক্ষুদ্র এই জীবের বিপুল পরিশ্রমের পুরোটা ফল ভোগ করে মানুষ ও পরিবেশ। এই উপকারী প্রাণীদের জন্য একটি দিনও নির্ধারণ করেছে জাতিসংঘ। ৪ বছর ধরে ২০ মে বিশ্ব মৌমাছি দিবস হিসেবে পালন হচ্ছে। মৌমাছি থেকে মধু, মোম পরাগ, রয়েল জেলি ও বিষ পাওয়া যায়। পৃথিবীর অন্য কোনো পতঙ্গ থেকে এত দামি ও প্রয়োজনীয় জিনিস পাওয়ার নজির নেই বললেই চলে। বাংলাদেশে একসঙ্গে সবচেয়ে বেশি মৌমাছি বসত গড়ে সুন্দরবনে। সুন্দরবনের সঙ্গে মৌমাছির নিবিড় সম্পর্কই এ বৃহৎ ম্যানগ্রোভ বনটিকে হাজার বছর ধরে টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে ভূমিকা রাখছে বলে মনে করা হয়। এই মৌমাছিরাই বিশাল বনজুড়ে বিপুল পরাগায়নে সহায়তা করে বনের গাছ ও ফল উৎপাদনে নিরলস সহায়তা করে যাচ্ছে।

মৌমাছির তৎপর না থাকলে, ফুলে ফুলে না বসলে বনে পরাগায়ন কমে যাবে। তাদের গাছের বংশবৃদ্ধির হার কমতে থাকবে। গাছ কমলে বিপজ্জনকভাবে ছোট হয়ে আসবে বনের পরিধি। এ জন্য বলা হয়, নতুন গাছের মাধ্যমে বনের বৃদ্ধি সচল রাখতে মৌমাছির বড় ভূমিকা রাখে।

3.1.1.3 শক্ত খোলসের প্রাণী

Anthropoda পর্বের Crustacea উপপর্বের প্রাণীদের ক্রাস্টেসিয়ান বলা হয়। এরা জলজ ও খোলস আবৃত প্রাণী। চিংড়ি, কাঁকড়া, লবস্টার ইত্যাদি এই দলভুক্ত প্রাণী। এই উপপর্বের প্রাণীর বাস্তুতন্ত্রের খাদ্য-জালিকার অন্যতম যোগসূত্র হিসাবে কাজ করে। এসব প্রাণী প্রধানত স্বাদুপানি ও লোনাপানির বাসিন্দা। কয়েকটি থাকে আর্দ্রভূমিতে, কিছু আবার পরজীবী। এদের সবার থাকে একজোড়া করে শুঙ্গক (antennule) ও শুঙ্গ (antenna)। এদের খোলস কাইটিন (chitin) নামক পদার্থে গঠিত এবং তারা খোলস বদলে বাড়তে থাকে। অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতির কাঁকড়া ও চিংড়ি বাংলাদেশে রয়েছে। এদেশে স্বাদুপানির অন্তত ১০টি ও সামুদ্রিক ১৯টি প্রজাতির চিংড়ি পাওয়া যায়। স্বাদুপানির গলদা চিংড়ি (*Macrobrachium rosenbergii*) বাণিজ্যিকভাবে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এবং কাঁকড়া ও চিংড়ি রপ্তানি থেকে প্রতি বছর প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। সামুদ্রিক চিংড়ির মধ্যে অর্থকরী প্রজাতি হলো কোলা চিংড়ি (*Penaeus merguensis*), বাগদা চিংড়ি (*P. monodon*), চাপড়া চিংড়ি (*P. indicus*), বাঘাতারা চিংড়ি (*P. semisulcatus*), হরিনা চিংড়ি (*Metapenaeus monoceros*) এবং কুচো চিংড়ি (*M. brevicornis*)।

3.1.1.4 অন্যান্য

কীটপতঙ্গদের Lepidoptera বর্গের দুটি বড় দলের একটি হচ্ছে মথ। নানা ধরনের শুঙ্গ (সাধারণত আগা গদাকৃতি নয়), নিশাচর বা গোধূলিচর স্বভাবের জন্য এগুলি প্রজাপতি থেকে পৃথক। অধিকাংশ মথের আছে সামনের ডানার সঙ্গে পেছনের ডানা সংযোগকারী একটি কাঁটা, ফ্রেনুলাম (frenulum)। দিবাচর, উজ্জ্বল রঙের সরু ও পাতলা প্রজাপতির তুলনায় মথরা অনুজ্জ্বল ও অনাকর্ষী, শরীর ভারী, ওড়ে গোধূলি বা রাতের বেলায়।

অবশ্য লম্বাটে গড়নের উজ্জ্বল রঙের মথও আছে। মথদের আকারে পার্থক্য রয়েছে। বৃহত্তম মথদের একটি, লুনা মথের (*Attacus atlas*) ছড়ানো ডানার দৈর্ঘ্য প্রায় ৩০ সেমি, আর পাতা-খনক (leaf miner) ক্ষুদ্রতমদের ৩ মিমি। অন্যান্য পতঙ্গের মতো মথের শরীরও মাথা, বক্ষ ও উদরে বিভক্ত। মাথায় আছে শুষ্ক, চোখ এবং সাইফনিং ধরনের মুখোপাঙ্গ। দুচোখের মাঝখান থেকে উঁচানো এক জোড়া শুষ্ক, প্রায়শ ফিলিফর্ম। শুষ্ক বাতাসের রাসায়নিক পদার্থ সম্পর্কে অত্যন্ত সংবেদী। পুরুষ মথ স্ত্রী মথের শরীর থেকে নিঃসৃত ফেরোমোনের 'গন্ধ' অনেক দূর থেকেও টের পায়।

পূর্ণাঙ্গ মথ নিশাচর জীবনযাপন করে। তবে কিছু কিছু মথ দিনেও ঘুরে বেড়ায়। প্রজাপতির মতো এরাও বাহারি রঙে ভরিয়ে তোলে বাংলার বন বনানী। ফুলের পরাগায়ণে কয়েক প্রজাতির মথের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাতে যেসব ফুল ফোটে তারা পরাগায়ণের জন্য নিশাচর মথের ওপরই সাধারণত নির্ভরশীল। আবার কিছু মথের দেহ নিঃসরিত বর্জ্য ব্যবহৃত হয় উন্নতমানের সিল্ক সামগ্রী তৈরিতে।

3.1.2 মৎস

নদীমাতৃক এই দেশে নদ-নদী, খাল-বিল এবং হাওর-বাওর জুড়ে দেখা মেলে হরেক রকমের মিঠাপানির মাছের, রুই, কাতলা, চাপিলা, কই, পুঁটি, ট্যাংরা, মলা, ডেলা সহ শতশত রকমের মাছ। আবার বাংলাদেশের জাতীয় মাছ ইলিশ ও তার চকচকে রূপ আর ব্যাপক পরিচিতি নিয়ে এখানে জনসমাদৃত। এছাড়াও বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণের বঙ্গোপসাগর, উপকূলীয় অঞ্চল এবং মোহনাতো পাওয়া যায় সামুদ্রিক সব মাছ যেমন- আইডু, রূপচাঁদা, অলুয়া, ভোল, কোরাল, টুনা ইত্যাদি, এখানে মাঝে মাঝে দেখা মেলে হরেক প্রজাতির সমুদ্রঘোড়া মাছ (*Hippocampus kuda*), হাঙর (*Selachimorpha*), শাপলাপাতা (*Himantura imbricata*) এবং করাতমাছেরও (*Epalzeorhynchus frenatum*)। বাংলাদেশের এই জলের দুনিয়ায় মাছ ছাড়াও পাওয়া যায় তারামাছ, সমুদ্রশশা, অক্টোপাস, স্কুইডসহ মজার মজার সব প্রাণী।

এবার দুটো জলজ প্রাণী শাপলাপাতা ও হাঙ্গরের কথা বলা যাক। ভূপৃষ্ঠের পরিবেশকে শকুন যেমন মরা-পচা জিনিসে খেয়ে সুস্থ রাখে, তেমনি হাঙর ও শাপলাপাতা সাগরের পানির সুস্থ পরিবেশ ধরে রাখতে ভূমিকা রাখে। বিশেষ করে সমুদ্রে মরে যাওয়া মাছ ও প্রাণী খেয়ে বেঁচে থাকে এ দুটি প্রাণী। সাগরের ঝাড়দারের ভূমিকায় থাকা হাঙর ও শাপলাপাতা ইকোসিস্টেম রক্ষায় বড় ধরনের অবদান রাখছে। এছাড়া এ দুটি প্রাণী বৈশ্বিকভাবে অনেকটাই মহাসংকটাপন্ন। বিলুপ্তির উচ্চ ঝুঁকিতে থাকা হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছের প্রজাতি আমাদের জাতীয় আইন দ্বারা কঠোরভাবে সুরক্ষিত।

শাপলাপাতা মাছ স্টিং রে (Sting Ray) নামেও পরিচিত। শাপলাপাতার প্রজাতিসমূহের মধ্যে খর্বনাক শাপলাপাতা (*Pastinachus solocirostris*), রামি/চুনি শাপলাপাতা (*Pateobatis uarnacoides*), হরিণা শাপলাপাতা (*Pateobatis uarnacoides*), বাঘা শাপলাপাতা (*Himantura leoparda*), গোলাকার শাপলাপাতা (*Maculabatis pastinacoides*) এবং পাইন্যা শাপলাপাতা (*Urogymnus polylepis*) উল্লেখযোগ্য। উপকূলীয় অঞ্চলে প্রায়শই শাপলাপাতা মাছ কেনা-বেচার সংবাদ পাওয়া যায়। আমাদের জানা থাকা প্রয়োজন যে বন্য প্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ অনুসারে শাপলাপাতা মাছ ধরা, ক্রয়-বিক্রয় করা নিষেধ। এ ধরনের মাছ না ধরার জন্য জেলেদের সচেতন করার ক্ষেত্রে তরুণেরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

হালদা বিশ্বের একমাত্র জোয়ার-ভাটার নদী, যেখান থেকে রুইজাতীয় মাছের (রুই, কাতলা, মৃগেল, কালিবাউশ) নিষিক্ত ডিম সংগ্রহ করা হয়। পৃথিবীর আর কোনো জোয়ার-ভাটার নদী থেকে রুইজাতীয় মাছের নিষিক্ত ডিম সংগ্রহ করা যায় না। বাংলাদেশে মৎস্য প্রজননক্ষেত্র অনেকগুলো আছে, কিন্তু মাছের নিষিক্ত ডিম সংগ্রহ করা হয় এমন নদী একটিও নেই। হালদা নদীর আরেকটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আইইউসিএনের রেড লিস্ট অনুযায়ী, পৃথিবীতে বর্তমানে ১ হাজার থেকে ১ হাজার ২০০ ফ্রেস ওয়াটার ডলফিন বা গাঙ্গেয় ডলফিন বেঁচে আছে। হালদা নদীতে এখনো ১৪৭টি গাঙ্গেয় ডলফিন বেঁচে আছে। আগে অন্যান্য নদীতেও এই ডলফিন পাওয়া যেত। অনেক নদী থেকে এখন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। একমাত্র হালদা নদীতেই এই ডলফিনের সবচেয়ে বড় পপুলেশন পাওয়া যায়।

তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে হালদা নদীতেই কেন রুই জাতীয় মাছেরা ডিম ছাড়ে। হালদা নদী এবং নদীর পানির কিছু বৈশিষ্ট্যের জন্য এখানে মাছ ডিম ছাড়তে আসে যা বাংলাদেশের অন্যান্য নদী থেকে ভিন্নতর। এই বৈশিষ্ট্যগুলো ভৌতিক, রাসায়নিক ও জৈবিক। ভৌতিক কারন গুলোর মধ্যে রয়েছে নদীর বাঁক, অনেকগুলো নিপাতিত পাহাড়ী ঝর্ণা বা ছড়া প্রতিটি পতিত ছড়ার উজানে এক বা একাধিক বিল, নদীর

গভীরতা, কম তাপমাত্রা, তীব্র খরস্রোত এবং অতি ঘোলাত্ব। রাসায়নিক কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে কম কন্ডাক্টিভিটি, সহনশীল দ্রবীভূত অক্সিজেন ইত্যাদি। জৈবিক কারণগুলো হচ্ছে বর্ষার সময় প্রথম বর্ষাণের পর বিল থাকার কারণে এবং দুকুলের বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত হয়ে নদীর পানিতে প্রচুর জৈব উপাদানের মিশ্রণের ফলে পর্যাপ্ত খাদ্যের প্রাচুর্য থাকে যা প্রজনন পূর্ব গোনাডের পরিপক্বতায় সাহায্য করে। অনেকগুলো পাহাড়ী ঝর্ণা বিধৌত পানিতে প্রচুর ম্যাক্রো ও মাইক্রো পুষ্টি উপাদান থাকার ফলে নদীতে পর্যাপ্ত খাদ্যাণুর সৃষ্টি হয়, এই সব বৈশিষ্ট্যগুলোর কারণে হালদা নদীতে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে রুই জাতীয় মাছকে বর্ষাকালে ডিম ছাড়তে উদ্বুদ্ধ করে যা বাংলাদেশের অন্যান্য নদী থেকে আলাদা। হালদা নদীর বাঁকগুলোকে “অক্সবো” বাঁক বলে। এদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল পানির প্রচণ্ড ঘূর্ণন যার ফলে গভীর স্থানের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় ভাবে গভীর স্থানগুলোকে “কুম” বা “কুয়া” বলা হয়। উজান হতে আসা বিভিন্ন পুষ্টি ও অন্যান্য পদার্থ কুমের মধ্যে এসে জমা হয়। ফলে পানি অতি ঘোলা হয়। মা মাছেরা কুমের মধ্যে আশ্রয় নেয় এবং ডিম ছাড়ে।

ইলিশ (Hilsa) – আমাদের জাতীয় মাছ। এটি Clupeiformes গোত্রের Tenulosa গণের সদস্য। বাংলাদেশে তিন প্রজাতির ইলিশ পাওয়া যায়, *Tenulosa. ilisha*, *T. toli* এবং *T. keleel* এর মধ্যে *T. ilisha* অধিক পরিমাণে সংগৃহীত হয়। ইলিশের বিচরণক্ষেত্র ব্যাপক এবং এদের সাধারণত দেখা যায় সমুদ্র, মোহনা ও নদীতে। সমুদ্রে এরা পারস্য উপসাগর, লোহিত সাগর, আরব সাগর, বঙ্গোপসাগর, ভিয়েতনাম ও চীন সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। শাতিল আরব, ইরান ও ইরাকের ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস, পাকিস্তানের সিন্ধু, ভারতের পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলীয় নদীসমূহ, মায়ানমারের ইরাবতী এবং বাংলাদেশের উপকূলীয় বিভিন্ন নদীসহ পদ্মা, যমুনা, মেঘনা ও কর্ণফুলি নদী ইলিশের আবাসস্থল।

ইলিশ প্রজননের উদ্দেশ্যে স্বাদুপানির স্রোতের উজানে অগভীর পানিতে উঠে আসে এবং ডিম ছাড়ে। মুক্ত ভাসমান ডিম থেকে পোনা বেরোয়। অপ্ৰাপ্তবয়স্ক মাছ (জাটকা) নদীর ভাটিতে নেমে সমুদ্রে পৌঁছে বড় হয়। প্রাপ্তবয়স্ক ও প্রজননক্ষম হয়ে জীবনচক্র পূর্ণ করার জন্য আবার নদীতে ফিরে আসে। ইলিশ মূলত প্ল্যাঙ্কটোনভোজী। নীল-সবুজ শৈবাল, ডায়াটম, ডেসমিড, কোপিপোড, রটিফার ইত্যাদিও খেয়ে থাকে। তবে এদের খাদ্যাভ্যাস বয়স ও ঋতুর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। ইলিশ বাংলাদেশের উন্মুক্ত জলাশয়ের অতি গুরুত্বপূর্ণ ও এককভাবে সর্বাধিক সংগৃহীত মাছ।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানি আয় ও আমিষ সরবরাহে ইলিশের গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনে ইলিশের অবদান সর্বোচ্চ। উপকূলীয় মৎস্যজীবীদের জীবিকার প্রধান উৎস হচ্ছে ইলিশ। প্রায় ৫.০ লক্ষ লোক ইলিশ আহরণে সরাসরি নিয়োজিত এবং ২০-২৫ লক্ষ লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত। বিশ্বে ইলিশ আহরণকারী ১১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান এখন শীর্ষে। সারা বিশ্বের মোট উৎপাদিত ইলিশের প্রায় ৪০ শতাংশ আহরিত হয় এ দেশের নদ-নদী থেকে।

3.1.3 উভচর প্রাণী

উভচর প্রাণীর মাঝে বিভিন্ন প্রজাতির ব্যাঙ যেমন কুনোব্যাঙ, সোনাব্যাঙ, সবুজ ব্যাঙ, গেছো ব্যাঙ, কোলাব্যাঙ পাওয়া যায় বাংলাদেশের চিরসবুজ বন, শালবন এবং পাহাড়ি অঞ্চলগুলোতে। কিছু চিকিলা বা সিসিলিয়ান এরও দেখা পাওয়া যায় এখানে।

ব্যাঙ (Frog and Toad) Amphibia শ্রেণির Anura বর্গের উভচর প্রাণী। গোটা বিশ্বে ব্যাঙের ২৮টি গোত্র এবং ৩৩৮টি গণের অধীনে প্রায় ৪,৩৬০টি প্রজাতি আছে। বাংলাদেশে উভচর শ্রেণির একটিমাত্র বর্গ (Anura) রয়েছে, কিন্তু Gymnophiona (caecilians) ও Caudata (salamanders ও newts) বর্গের কোন প্রজাতি নেই। ব্যাঙ ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ খেয়ে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এরা জীবনধারণের জন্য কখনও ডাঙায় আবার কখনও জলে বিচরণ করে। বাংলাদেশের নদী-নালা, খাল-বিল, পাহাড়, বনজঙ্গলসহ প্রায় সব জায়গাতেই বিভিন্ন প্রজাতির ব্যাঙ দেখা যায়। এদের মধ্যে কোলাব্যাঙ অন্যতম। এরা বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় আকারের ব্যাঙ। সোনাব্যাঙ নামেও অনেকের কাছে এরা পরিচিত। এদের ইংরেজি নাম Indian Bull Frog. বৈজ্ঞানিক নাম *Hoplobatrachus tigerinus*. এরা দেখতে ধূসর, বাদামি ও হলদে রঙের। স্ত্রী ও পুরুষ ব্যাঙের রঙে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। শক্তিশালী পায়ের কারণে এরা জলে-স্থলে স্বাচ্ছন্দ্যে বিচরণ করতে পারে। আগে বর্ষা মৌসুমে গ্রাম-বাংলার জলাশয়গুলো এদের ডাকাডাকিতে মুখরিত থাকত। এখন আগের মতো দেখা যায় না।

3.1.4 সরীসৃপ

সরীসৃপ Reptilia শ্রেণীর মেরুদণ্ডী প্রাণী। প্রাণিজগতে এদের অবস্থান উভচর ও পাখিদের মধ্যবর্তী। কাছিম ও কাউটা, টিকটিকি, সাপ, কুমির এবং টুয়াটারা (Sphenodon) সরীসৃপ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এরা প্রধানত চতুষ্পদী, কিন্তু সাপ ও কিছু টিকটিকি উপাঙ্গহীন। এদের ত্বকের বহির্ভাগ বহিস্থকীয় আঁশে ঢাকা, যা ত্বককে আঘাত ও শুষ্কতা থেকে রক্ষা করে। বাংলাদেশে অজগর সাপ ও তক্ষক বেশ পরিচিত সরীসৃপের মধ্যে। বাংলাদেশে অজগরের দুটি প্রজাতি আছে। এর একটি অজগর বা ময়াল সাপ (*Python molurus*), এবং অন্যটি গোলবাহার (*Python reticulata*), এদের মধ্যে আকারে বড় ময়াল সাপ। এরা ৫.৭ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব অথবা দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের মিশ্র-চিরহরিৎ বন ও সুন্দরবনে এদের পাওয়া যায়। বাংলাদেশে দুটি প্রজাতিই বিরল। দেশে উভয়কে বিপন্ন অথবা অতি বিপন্ন প্রজাতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অজগর স্তন্যপায়ী, পাখি এবং সরীসৃপজাতীয় প্রাণী খায়। তবে স্তন্যপায়ী প্রাণী বেশি পছন্দ করে। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে হাঁদুর, খরগোশ, ছাগল, ভেড়া, শিয়াল এবং হরিণ শিকার করে। খাবার পূর্বে অজগর তার শিকার পেঁচিয়ে শ্বাসরুদ্ধ করে মেরে ফেলে। অন্যান্য সরীসৃপের মধ্যে রয়েছে কচ্ছপ, কাছিম, কুমির ও ঘড়িয়াল, গুইসাপ ও তক্ষক।

3.1.4.1 কচ্ছপ ও কাছিম

পৃথিবীতে টিকে থাকা আদিম প্রাণিগুলোর মধ্যে কচ্ছপ-কাছিম অন্যতম। শতশত বছর ধরে প্রতিকূল পরিবেশে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে তারা আজও বেঁচে আছে। আমাদের দেশের বন-জঙ্গলে এক সময় প্রচুর কচ্ছপ ও হাওড় অঞ্চলে কাছিমের দেখা মিলত। তবে নানা কারণে কমছে কচ্ছপ-কাছিমের সংখ্যা। ক্রিয়েটিভ কনজারভেশন এলায়েন্স'র তথ্যমতে, পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত ৩৬১ প্রজাতির কচ্ছপ-কাছিম টিকে রয়েছে। এদের মধ্যে ৫১ শতাংশ বর্তমানে বিপন্ন অবস্থায় রয়েছে। বাংলাদেশে ২৫ প্রজাতির মিঠাপানির কচ্ছপ-কাছিমের দেখা মেলে। এর মধ্যে ২১ প্রজাতির কচ্ছপ-কাছিমকে বাংলাদেশসহ সারা পৃথিবীব্যাপী বিপন্ন, মহাবিপন্ন ও সংকটাপন্ন হিসেবে ঘোষণা করেছে আইইউসিএন। তোমরা কি বলতে পারবে কচ্ছপ এবং কাছিমকে আলাদা কেন? এদেরকে চেনার করার সহজ উপায় হলো, যেগুলো পানিতে থাকে সেগুলো কাছিম এবং যেগুলো স্থলে বসবাস করে সেগুলো কচ্ছপ।

কাছিম মূলত কিলোনিয়া বা চিলোনিয়া (Chelonia) বর্গের অন্তর্ভুক্ত। কাইট্রা, কাছিম বা, কচ্ছপ নাম প্রায় একই মনে হলেও সূক্ষ্ম কিছু পার্থক্যের ভিত্তিতে প্রচলিত নাম রয়েছে। যেমন, পিঠে নরম বর্ম থাকলে তাকে কাছিম, শক্ত বর্মের ডাঙায় থাকা প্রাণিদের কচ্ছপ, শক্ত বর্মের পানিতে থাকা প্রাণিদের কাইট্রা এবং সমুদ্রে বসবাসকারীদের সামুদ্রিক কাছিম নামে লোকমুখে অভিহিত করা হয়। তবে সাধারণত কিলোনিয়া বর্গের সবাইকেই এক কথায় কাছিম বলা হয়ে থাকে। বাংলাদেশে এখন ৫ গোত্রের প্রায় ২৫ প্রজাতির কাছিম দেখা যায়।

সরীসৃপ শ্রেণির হলেও কাছিম দেখতে অনেকটা গোলাকার এর বিশেষ আকৃতির কারণে। কাছিম বলতেই চোখে ফুটে উঠবে পিঠে নরম বা, শক্ত খোলার আবরণধারী প্রাণি যে প্রয়োজনে তার শরীর খোলার ভিতরেই পুরোটো ঢুকিয়ে নিতে পারে। পিঠের দিকে উঁচু উত্তল কৃন্তিকাবর্ম বা, (Carapace) এবং নিচে বুকোর দিকে চ্যাপ্টা বক্ষস্ত্রাণ (Plastron) এর বিশেষ শারীরিক গঠন দান করে। ঘাড়, মাথা, অগ্রপদ, পশ্চাৎপদ, অবসারণী ছিদ্র, লেজ বাদে বাকি অংশ খোলার অভ্যন্তরেই থাকে। কৃন্তিকাবর্ম ও বক্ষস্ত্রাণ দেহের দুই পাশের বাকি অংশে জোড়া লাগানো থাকে। এদের দাঁত না থাকলেও চোয়লের শক্ত আঁকাবাঁকা গঠন দিয়েই এরা শক্তভাবে কোনোকিছু ধরা, কাটা এবং ছিঁড়ে ফেলতে পারে। এদের কৃন্তিকাবর্মের ভিতরে বুকোর পাঁজর ও কশেরুকা এমনভাবে যুক্ত হয়ে থাকে যে এরা চাইলেও পাঁজরের হাড় দিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজ ইচ্ছানুযায়ী চালনা করতে পারে না। ফলে, ভয়াব্র কাছিম যদি সমস্ত দেহ খোলার মধ্যে ঢুকিয়ে নেয়, জায়গা স্বল্পতায় শ্বাসপ্রশ্বাসের বিঘ্ন অল্প সময় পরেই শুরু হয়ে যায়। নখরযুক্ত এই প্রাণিটি অক্সিজেন রক্তের পাশাপাশি মাংসপেশির মায়োগ্লোবিন (Muscular myoglobin) এর মাধ্যমেও ধরে রাখতে পারে। যেসব কাছিম সমুদ্রে থাকে, তাদের অবসারণী ছিদ্রের পাশে থাকা রক্তনালীযুক্ত পর্দার সাহায্যেও ফুসফুসের পাশাপাশি অক্সিজেন নিতে পারে। অতি পরিমাণে মাংসধারী এ প্রাণিটিকে কোনো কোনো এলকায় জলখাসীও বলা হয়ে থাকে। মেয়ে কাছিম একটু ভারী ও এদের লেজ মোটা। অন্যদিকে পুরুষ কাছিম সাধারণত মেয়ে কাছিমের তুলনায় চ্যাপ্টা ও লম্বা লেজের গঠনসমৃদ্ধ হয়।

বাংলাদেশে পাঁচ প্রজাতির সামুদ্রিক কাছিম পাওয়া যায়। তার মধ্যে চারটি কিলোনিডি ও একটি ডারমোকেলিডি গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। প্রজাতি পাঁচটি হল যথাক্রমে ডারমোকেলিস কোরিয়াসিয়া (*Dermochelys coriacea*), ইরিটমোকেলিস ইমব্রিকাটা (*Eretmochelys imbricata*), কিলোনিয়া মাইডাস (*Chelonia mydas*) বা, গ্রিন

টারটল, কেরেটা কেরেটা (*Caretta caretta*) বা, লগারহেড টাইটল এবং লেপিডোকেলিস অলিভেসিয়া (*Lepidochelys olivacea*) বা, অলিভ রিড্লেটারটল। বাংলাদেশে সামুদ্রিক কাছিম মূলত পশ্চিমে হরিণটানা ও রাইমঙ্গল নদীর মোহনা হতে পূর্বের নাফ নদীর মোহনা পর্যন্ত বিস্তৃত সমুদ্রসৈকত এবং বঙ্গোপসাগরের বিশাল জলরাশির মধ্যে পাওয়া যায়। শীত হতে বর্ষার শুরু পর্যন্ত এদের ডিম পাড়ার সময়, তখন এসব সৈকত অথবা প্রবালদ্বীপের বালুবেলায় এরা ডিম পাড়ে ও রোদ পোহাতে আসে।

বাসস্থানের অভাব, প্রাকৃতিক বনভূমি ধ্বংস, কৃষি জমি তৈরি বা চাষের জন্য বনভূমি পোড়ানো এবং বিশেষ কিছু ধর্মের মানুষের কাছে কচ্ছপের মাংস প্রিয় হওয়ায় শিকারের উৎসবে হারিয়ে যাওয়ার শেষ প্রান্তে রয়েছে বাংলাদেশের কচ্ছপ এবং কাছিম। বিলুপ্ত হওয়ার শেষ প্রান্তে থাকা এসব কচ্ছপ এবং কাছিমকে সংরক্ষণের জন্য আমাদের সকলে সচেতন থাকা উচিত।

3.1.4.2 কুমির ও ঘড়িয়াল, গুঁইসাপ এবং তক্ষক

Crocodylia বর্গের বৃহৎ মাংসাশী সরীসৃপ হলো কুমির ও ঘড়িয়াল। এই বর্গের ৩ গোত্র Crocodylidae (কুমির ১৩ প্রজাতি), Alligatoridae (অ্যালিগ্যাটর ২ প্রজাতি) এবং Gavialidae (ঘড়িয়াল ২ প্রজাতি)। এগুলি উষ্ণমন্ডলীয় ও উপউষ্ণমন্ডলীয় অঞ্চলে জলাভূমি বা নদীর তীরে বাস করে ও পানিতে শিকার ধরে। কুমিরের শরীর ও লেজ চ্যাপ্টা, পা খাটো ও চোয়াল শক্তিশালী। মাথার আগার কাছাকাছি চোখ, কান ও নাকের ছিদ্র এবং পানিতে ভেসে থাকার সময় এগুলি খোলা থাকে।

ছোট কুমির মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী খেয়ে থাকে। বড় কুমির মাছ ছাড়াও পানির কাছাকাছি আসা ডাঙ্গার স্তন্যপায়ী প্রাণী ও পাখি ও শিকার করে। কুমিরগোষ্ঠীর কতকগুলি বৃহদাকার সদস্য কখনও কখনও মানুষকে আক্রমণ করে। স্ত্রী কুমির নদীর তীরে পচা আগাছা দিয়ে তৈরি বাসায় বা অগভীর গর্তে সাধারণত ২০টি পর্যন্ত ডিম পাড়ে এবং ডিম ফোটার শব্দ শুনলে সেগুলি মাটি খুঁড়ে বের করে। অধিকাংশ প্রজাতির কুমিরের গড় দৈর্ঘ্য ১.৮-৩ মিটার তবে সর্ববৃহৎ কুমির, সুন্দরবনের লোনাপানির কুমির (*Crocodylus porosus*) ৭ মিটার পর্যন্ত লম্বা, ওজন প্রায় ১৫০০ কিলোগ্রাম হয়ে থাকে। স্বাদুপানির জলাভূমির কুমির বা মকর (*Crocodylus palustris*) বাংলাদেশে মুক্ত জলাশয়ে এই কুমির আর নেই। অবশ্য কয়েকটি এখনও দক্ষিণাঞ্চলের বাগেরহাট জেলায় হযরত খানজাহান আলীর দরগাহর পুকুরে দেখা যায়।

ঘড়িয়াল (*Gavialis gangeticus*) অত্যন্ত লম্বা, সরু ও যা বৈশিষ্ট্যে কুমির থেকে স্পষ্টত পৃথক। ঘড়িয়ালের নামকরণের একটা মজার কাহিনী আছে। এদের চোয়াল মাথা থেকে ক্রমশ সরু হতে থাকে, তারপর হঠাৎ চোয়ালের শেষপ্রান্তে এসে বেশ মোটা ও ভোঁতা হয়ে যায়। পুরুষ ঘড়িয়ালের এই ভোঁতা প্রান্ত কলস বা ঘড়ার মতো ছোট একটি বর্ধিত অংশ দেখা যায়। এই ঘড়ার মতো অংশের জন্যই এদের ঘড়িয়াল নামকরণ করা হয়। আর ইংরেজরা এই ঘড়িয়ালকেই ভুলভাবে উচ্চারণ করে ডাকতেন গেভিয়াল, যা থেকে এর ইংরেজি নামের উৎপত্তি। বাংলাদেশের দক্ষিণে সুন্দরবনে মোহনার কুমির (*Crocodylus porosus*) এবং উত্তরে পদ্মা নদীতে ঘড়িয়াল (*Gavialis gangeticus*) রয়েছে।

মিঠা পানিতে বাস করা এই প্রাণী লোকজন বিরক্ত না করলে দিনের বেশিরভাগ সময়েই বালুচরে মুখ হাঁ করে শুয়ে থাকতে পছন্দ করে, কিন্তু দিনের বেলা সে সুযোগ খুব কম হয় বলে তাদের রাতের দিকেই চরে শুয়ে বিশ্রাম নিতে হয়। শুনে হাস্যকর মনে হলেও এটা সত্য যে, এদের মুখ হাঁ করে বিশ্রাম নিতেই বেশি সুবিধা হয়, কেননা এদের মুখ বন্ধ করার চেয়ে খোলা রাখাই কম কষ্টসাধ্য। কারণ মুখ খোলার সাথে সাথেই তা চোয়ালের মাংসপেশীর সাথে তাল চাবির মতো লেগে যায়, ফলে মুখ খোলা রাখাই সহজতর হয়।

ঘড়িয়ালের খাদ্যাভাস ও খাদ্যগ্রহণ কৌশল বেশ কৌতুহলোদ্দীপক। আমরা এদেরকে কুমিরের সাথে গুলিয়ে ফেলে ভুল করি, আসলে এদের থেকে আমাদের জীবননাশের কোনো সুযোগ নেই। কারণ এদের প্রধান খাদ্য মূলত আইশবিহীন মাছ যেমন, বোয়াল, পাঙ্গাস, আইডু ইত্যাদি। এজন্য এদের আমরা কখনো কখনো মেছো কুমিরও বলে থাকি। এরা সাধারণত পুরো মাছকে মুখে নিয়ে আস্ত গিলে ফেলে। বোয়াল, পাঙ্গাস, আইডু মাছগুলো রাস্কুসে ও মাংসাশী, যারা অন্য তৃণভোজী মাছ যেমন, রুই, কাতলার মতো মাছের ডিম, পোনা খেয়ে তাদের সংখ্যা হ্রাস করে। কিন্তু ঘড়িয়াল বোয়াল, পাঙ্গাস খেয়ে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করে থাকে।

যখন বসন্তকালে এক ঘড়িয়াল অন্য এক ঘড়িয়ালের ঘাড় কামড়ে ধরার চেষ্টা করে কিংবা ধাওয়া করে বেড়ায় তখন বুঝতে হবে এটা তাদের প্রজননের পূর্বপ্রস্তুতি। পুরুষ ও স্ত্রী ঘড়িয়ালের এই রাগের পালা শেষ হয় দৈহিক মিলনের মাধ্যমে। মিলনের পর ডিম পাড়তে মা ঘড়িয়াল বালুচরে এসে সুবিধাজনক স্থানে গর্ত করে একসাথে ৪০-৫০টা ডিম পাড়ে, এটাকে ঘড়িয়ালের বাসা বলা হয়। ডিমগুলো রাজহাঁসের ডিম থেকেও বেশ বড় ও সাদা

ধবধবে। ওজন প্রায় ২৫০ গ্রামের কাছাকাছি। দেখতে পুরু খোলসযুক্ত ক্যাপসুলের মত। এ পুরু খোলস এদেরকে ভেঙে যাওয়া থেকে রক্ষা করে, আবার আর্দ্রতাও ধরে রাখে।

ঘড়িয়ালের সবচেয়ে বড় শত্রু মানুষ, তারপরে তারা নিজেরাই কিংবা অপরাপর কুমির। মানুষ ওদের চামড়া দিয়ে বিভিন্ন ব্যাগ, বেল্ট, জুতা বানায়। অনেকে মাংস বা ডিমের জন্য হারপুন দিয়ে মেরে ফেলে। অনেকে আবার নিজের আনন্দ কিংবা বীরত্ব দেখাতে গুলি করে ঘড়িয়াল মারে। এখন নাইলনের ফাঁসি জালে আটকেও অনেক ঘড়িয়ালের শ্বাসরোধ হয়ে মৃত্যু হচ্ছে। বাচ্চা ঘড়িয়ালকে অনেক সময় বড় ঘড়িয়াল, কুমির, শিকারী পাখি বা বোয়াল মাছ খেয়ে ফেলে। তাছাড়াও চর জনপদে মানুষের আনাগোনা বৃদ্ধিও এদের সংখ্যা হ্রাসের অন্যতম একটা কারণ। পদ্মার পাড় থেকে হয়তো ঘড়িয়াল বিলুপ্ত হয়েছে ইতোমধ্যে, যমুনার তীরে দুই-একটা বেঁচে থাকতে পারে। তবে এখনো আমাদের সুযোগ আছে ঘড়িয়ালকে পুরোপুরি বিলুপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা করার। এক্ষেত্রে পাশের দেশ ভারতের মত ঘড়িয়াল পুকুর বানানো যেতে পারে কিংবা যেখানে ঘড়িয়াল পাওয়া যায় তা ঘড়িয়ালের জন্য অভয়াশ্রম হিসেবে ঘোষণা করা যেতে পারে। সর্বোপরি আমাদের সচেতনতা ও ঘড়িয়ালের প্রতি সদয় আচরণ ওদের সংখ্যাবৃদ্ধি করতে পারে। নতুবা অচিরেই ঘড়িয়ালমুক্ত হবে বাংলাদেশ।

গুঁইসাপ

বাংলার একসময়ের অতিপরিচিত সরীসৃপ ছিলো গুঁইসাপ। চিনা লোককথার টিকটিকি সদৃশ এই প্রাণি এখন প্রায় দেখাই যায় না। গুঁইসাপের বৈজ্ঞানিক নাম *Varanus bengalensis*। এরা Squamata বর্গের Varanidae গোত্রের প্রাণি। যদিও বিবর্তনের ধারায় বহুলক্ষ বছর ধরেই গুঁইসাপ পৃথিবীর বুকে বিচরণ করছে, এদের এখন কেবল গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলেই দেখা যায়। বিভিন্ন কিংবদন্তীর অংশ এই সাপ এখন বাংলাদেশ থেকে প্রায় বিলুপ্ত।

গুঁইসাপকে অন্ধকার স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় বেশি দেখা যায়। গ্রামাঞ্চল, ছোট ঝোপঝাড়, জলাভূমির পাশের এলাকা এদের আদর্শ বাসস্থান। এদের সুন্দরবন ছাড়াও গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন বনভূমি, তাপক্লিষ্ট মরুভূমি এবং নদী উপত্যকায় পাওয়া যায়। এছাড়াও গাছের কোটর, খানাখন্দে এরা বিশ্রাম নেয়। গুঁইসাপ গাছে উঠতে যেমন পারদর্শী তেমনই সাঁতারেও পটু।

সরীসৃপ হওয়ায় গুঁইসাপও শীতল রক্তবিশিষ্ট প্রাণি বা Poikilothermic অর্থাৎ, দেহের তাপমাত্রা পরিবেশের সাথে ওঠানামা করে। তবে জৈবিক কজের জন্য গুঁইসাপ দরকারি তাপ গ্রহণ করে সূর্য থেকে। গ্রীষ্মের মাঝামাঝি এদের শরীরের তাপমাত্রা ৩৪-৪০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে পৌঁছালে এরা ঝোপঝাড়ে বা গর্তে আশ্রয় নেয়। বিকালে সূর্য পশ্চিমদিক বরাবর থাকলে এরা সোজা হয়ে শুয়ে থাকে যেন সমস্ত শরীর দিয়ে তাপ গ্রহণ করতে পারে। শীতকালে তাপগ্রহণের জন্য দেহকে সরাসরি সূর্যের আলোর নিচে রাখে।

গুঁইসাপের প্রিয় খাবার পাখি, পাখির ডিম, ইঁদুরসহ অগণ্য ছোট প্রাণি। গুঁইসাপ সাপের প্রবল শত্রু। গুঁইসাপের চামড়া শক্ত হওয়ায় সাপের দাঁত চামড়া ভেদ করতে পারে না। ফলে বিষধর সাপেরাও এদের এড়িয়ে চলে। গুঁইসাপ তার শিকারকে সরাসরি গিলে ফেলে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী মুখগহ্বর ছোট-বড়ও করতে পারে। গুঁইসাপ নিজের শত্রুকে দেখলে হিসহিস শব্দ করে। আত্মরক্ষা করতে হলে শরীর ফুলিয়ে লেজ দিয়ে বারবার শত্রুকে আঘাত করতে থাকে। সুযোগ পেলে এরা মানুষকেও কামড়াতে ছাড়ে না। এই কামড় ছাড়ানো তখন অনেক শক্ত হয়ে যায়। তবে সাধারণত এরা যুদ্ধে জড়ায় না। বিপদ বুঝলেই গাছে উঠে যায়। আবার শিকার ধরার আশায় মাটিতেও নিঃশব্দে মিশে থাকে। দেহের জলপাই রঙের জন্য এদের তখন আলাদাভাবে বোঝা যায় না। যদিও এরা হাঁস-মুরগি এবং এদের ডিম খেয়ে গৃহস্থের ক্ষতি করে, এরা শস্য বিনষ্টকারি ইঁদুর, কাঠবিড়ালী ইত্যাদি প্রাণি মেরে উপকারও করে।

একসময় গুঁইসাপের জন্য গ্রামাঞ্চলে মানুষ প্রচলিত সাবধানে থাকতো। তবে গুঁইসাপ এখন প্রায় দেখাই যায় না। রঙচঙে চামড়ার জন্য মানুষ গুঁইসাপ মেরে নানারকম ব্যাগ, জুতা ইত্যাদি তৈরির জন্য বিক্রি করতে থাকে। এর চামড়ার দাম বিদেশেও অনেক। নির্বিচারে হত্যার জন্য গুঁইসাপ লোকালয়ে তো দেখাই যায় না, বর্তমানে প্রকৃতি থেকেও বিলুপ্তপ্রায়।

তক্ষক

Lacertilia বর্গের Gekkonidae গোত্রের একটি গিরগিটি প্রজাতি তক্ষক। পিঠের দিক ধূসর, নীলচে-ধূসর বা নীলচে বেগুনি-ধূসর। সারা শরীরে থাকে লাল ও সাদাটে ধূসর ফোঁটা। পিঠের সাদাটে ফোঁটাগুলি পাশাপাশি ৭-৮টি সারু সারিতে বিন্যস্ত। এরা কীটপতঙ্গ, ঘরের টিকটিকি, ছোট পাখি ও ছোট সাপ খেয়ে থাকে। ছাদের পাশের ভাঙা ফাঁক-ফোঁকর বা গর্তে অথবা গাছে বাস করে। তক্ষক রাতে খুব পরিষ্কার দেখতে পায়। তক্ষকের অক্ষিগোলকে ট্রান্সপারেন্ট মেমব্রেন থাকে যা তাকে মানুষের চেয়ে ৩৫০ গুণ বেশি দৃষ্টিসম্পন্ন করেছে। তক্ষক

আল্ট্রা-ভায়োলেট রশ্মিতেও (বেগুনি ও সবুজ) খুব পরিষ্কার দেখতে পায়। অন্যান্য আত্মরক্ষী প্রাণীদের মতো তক্ষকের ইন্দ্রিয়ক্ষমতা দাপুটে। এটির শরীরের লেজ, দাঁত, পা প্রভৃতি কোনোভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও তা আবার প্রাকৃতিকভাবে গজাতে পারে।

তক্ষকের ডাক চড়া, স্পষ্ট ও অনেক দূর থেকে শোনা যায়; ডাকের জন্যই এই নাম। কক্কক্ আওয়াজ দিয়ে ডাক শুরু হয়, অতঃপর 'তক্-ক্কা' ডাকে কয়েক বার ও স্পষ্টস্বরে। ভুলবশত এটিকে বিষাক্ত মনে করা হলেও এই সরীসৃপ মোটেই বিষাক্ত নয় তবে স্বভাবসুলভ কিছুটা আগ্রাসী ভাব আছে এদের, কামড় দিলে জ্বালাপোড়া করে এবং ক্ষতস্থানে ব্যথা হতে পারে।

অনেক সময় প্রায়ই সংবাদের শিরোনাম হিসেবে দেখা যায় কোটি টাকায় বিক্রি হচ্ছে তক্ষক, যা মূলত রক্তচোষা, আনজিলা, শাল্লা নামেও পরিচিত এবং বিলুপ্তপ্রায় প্রাণীদের মধ্যে অন্যতম। এই বুনা টিকটিকি জাতীয় প্রাণী নিয়ে গুজবের শেষ নেই যা এর অস্তিত্বকে আজ সংকটের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শাল্লার তেল নামে এই প্রাণিটির তেল বিক্রি করা হয়। চোরাকারবারি এবং অসাধু মানুষ ক্যাস্পার নিরাময়কারী ওষুধ নামে বিক্রি করে এই প্রাণী। আবার ভবিষ্যৎ গণনাকারী কিছু মানুষ ডাইনোসরদের বংশধর হিসেবে চিন্তা করে ভবিষ্যৎ গণনাকারী হিসেবে এটা ব্যবহার করে, যা প্রতারণা আর ভণ্ডামির সামিল। মূলত এসব কারণেই এই প্রাণীটি আজ সংকটাপন্ন। তক্ষক কেনাবাচা বা সংরক্ষণ আন্তর্জাতিকভাবেই অবৈধ, বাংলাদেশেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। কাজেই এ ধরনের সকল গুজব ও অবৈধ লেনদেন, তক্ষক শিকার থেকে নিজেদের বিরত থাকতে আমাদের সচনতা জরুরী।

3.1.4.3 বিষধর ও নির্বিষ সাপ

Serpentes বর্গভুক্ত লম্বা ও সরু গড়নের সরীসৃপ হলো সাপ। সাপ বছরে কয়েকবার ত্বক বদলায়। অধিকাংশ মেরুদণ্ডী প্রাণীর কশেরুকার তুলনায় সাপে কশেরুকার সংখ্যা বেশি (মানুষে ৩২, সাপে ৪ শতাধিক)। এদের ফুসফুস একটি। (ব্যতিক্রম অজগর, যাদের দুটি ফুসফুস)। সাপের কান নেই তাই বায়ুবাহিত শব্দ শোনে না, কিন্তু ভূমি থেকে কেরাটির হাড়ে পরিবাহিত নিম্ন-কম্পনাঙ্কের তরঙ্গ (১০০-৭০০ Hz) অনুভব করতে পারে। সাপের মুখের তালুতে একটি সংবেদী (chemosensory) অঙ্গ থাকে এবং চলাচলের সময় সাপের জিভের মাধ্যমে সংবেদন গ্রহণ করে। সাপের স্বরযন্ত্র না থাকলেও হিস্ হিস্ শব্দ করতে পারে। অধিকাংশ সাপই স্থলচর এবং কোন কোনটি গর্তবাসী অথবা বৃক্ষবাসী। জলচর সাপও আছে এবং পুরো একটি দলের সাপের সবগুলিই সামুদ্রিক। নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলের সাপেরা শীতনিদ্রায় যায়। সাধারণত একা থাকাই অভ্যাস, তবে খাদ্য ও আশ্রয়ের প্রয়োজনে কখনও একত্রে জড়ো হয় এবং শীতনিদ্রায় অনেকগুলি একত্রে থাকে। ছোট সাপ পতঙ্গভুক এবং বড় সাপ নিজ দেহের তুলনায় বড় আকারের প্রাণী খায়।

সাপে কাটা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য সমস্যা। বাংলাদেশে গ্রামাঞ্চলে গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে এবং বন্যার সময় বিভিন্ন প্রকারের সাপের উপদ্রব দেখা দেয়। প্রতি বছর আমাদের দেশে সাপের কামড়ে অনেক মানুষের মৃত্যু হয়। শহরের চেয়ে গ্রামে সাপের কামড়ে মৃত্যুর ঘটনা বেশি। বিষধর সাপের কামড়ে মৃত্যুর অন্যতম কারণ সচেতনতার অভাব, সঠিক চিকিৎসার অভাব বা চিকিৎসা নিতে বিলম্ব হওয়া। এখনো অনেক গ্রামে কুসংস্কার আছে, সাপে কাটলে ওঝা বা বেদের কাছে নিয়ে যেতে হবে। অনেকেই সাপে কাটলে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কীভাবে চিকিৎসা নিতে হবে বা সাপে কাটলে করণীয় কী তা জানেন না। ফলে অনেক ক্ষেত্রে রোগীর বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও, শুধু সঠিক জ্ঞানের অভাবে মারা যান।

সাপে কাটলে যত দ্রুত সম্ভব আক্রান্ত ব্যক্তিকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। এখন প্রতিটি সরকারি জেলা ও উপজেলা হাসপাতালে সাপের এন্টিভেনম পাওয়া যায়। কাজেই, আতংকিত না হয়ে আক্রান্ত ব্যক্তিকে বারবার আশ্বস্ত করতে হবে এবং সাহস দিতে হবে। নির্বিষ সাপের কামড়েও আতঙ্কিত হয়ে মানসিক আঘাতে মারা যেতে পারে মানুষ। বাংলাদেশের অধিকাংশ সাপই বিষহীন, অল্প কিছু সাপ বিষধর। আবার বিষধর সাপ পর্যাপ্ত বিষ ঢুকিয়ে দিতে ব্যর্থ হতে পারে। এসব জানানোর মাধ্যমে রোগীকে আশ্বস্ত করা যেতে পারে।

জনস্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করলে গোখরা, কেউটে ও চন্দ্রবোড়া এই তিন ধরনের বিষধর সাপ গুরুত্বপূর্ণ। সাপ কেবল আত্মরক্ষার জন্য কিংবা উত্যক্ত করলে মানুষকে দংশন করে, তাই সাপকে এড়িয়ে চলাই প্রতিরোধের একমাত্র উপায়। ঘাস বা ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে চলাফেরার সময় সাবধানে চলতে হবে। মাছ ধরার চাঁই কিংবা জালের মধ্যে সাপ আছে কিনা তা দেখে নিতে হবে। রাতে হাটার সময় আলো ও লাঠি সাথে রাখতে হবে। গরমের দিনে বাইরে ঘুমানোর ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

3.1.5 পাখি

প্রজাপতি ও ফড়িং বাদে পৃথিবীর বৃক্কে আরও যে উদ্ভূত সৌন্দর্য রয়েছে সে হলো পাখি। সাধারণভাবে পাখি হলো পৃথিবীজুড়ে নানা ধরনের পরিবেশে বসবাসকারী বিভিন্ন আকার-আকৃতি, ওজন ও বর্ণের উষ্ণ-রক্তবিশিষ্ট মেরুদণ্ডী প্রাণী যাদের দেহ পালকে আচ্ছাদিত, চোয়ালের উপর রয়েছে দাঁতবিহীন শক্ত চঞ্চু বা ঠোঁট, হৃৎপিণ্ড চার প্রকোষ্ঠে বিভক্ত, স্ত্রীরা শক্ত খোলসযুক্ত ডিম পাড়ে, দেহের বিপাকীয় হার বেশি, হাড় ফাঁপা ও কঙ্কাল হালকা এবং, কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া, যারা সচরাচর উড়তে সক্ষম। বিশ্বব্যাপী কমবেশি ৯,৯৩০ প্রজাতি (Species) ও ২২,০০০ উপপ্রজাতির (Subspecies) পাখি রয়েছে। অনুমান করা হয়, বিভিন্ন প্রজাতির এই পাখিগুলোর মোট সংখ্যা ২০-৪০ হাজার কোটি। পুরো ভারতে যেখানে ১,৩১১ প্রজাতির পাখির বাস, সেখানে বাংলাদেশে কমবেশি ৭২২ প্রজাতির পাখি রয়েছে। বিভিন্ন গবেষণা থেকে জানা যায়, গত কয়েক শতকে দু'শ' প্রজাতির পাখি পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বর্তমানে প্রায় বার শ' প্রজাতির পাখি নানা কারণে হুমকির সম্মুখীন।

বাংলাদেশের পাখিপাখালি বেশ বৈচিত্র্যময়। চড়ই, দোয়েল, শালিক, ময়না, সারস, বক, ইষ্টিকুটুম, বসন্তবৌরী, মাছরাঙা সহ দারুন সব রং-বেরঙের পাখির দেখা মেলে বাংলাদেশের সর্বঅঞ্চলে। দেশীয় এ পাখিগুলো ছাড়াও প্রতিবছর শীতে হাজার হাজার পরিযায়ী পাখি আসে বাংলাদেশে, যেমন- সরালী, কালোমাথা গাওঁচিল, পানচিল ইত্যাদি। ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসা এই পাখিগুলোর সাময়িক আবাসস্থল হয় বাংলাদেশের বিশিষ্ট এবং চিহ্নিত কিছু স্থান।

3.1.5.1 আবাসিক পাখি

বাংলাদেশের মোট পাখির মধ্যে কমবেশি ৩৪০ প্রজাতি স্থায়ীভাবে বসবাস করে, অর্থাৎ এরা সারাবছর এদেশে থাকে, ডিম পাড়ে ও ছানা তোলে। এরাই হলো এদেশের আবাসিক পাখি (Resident Bird)। এছাড়াও প্রায় ৩৭২ প্রজাতির পাখি পরিযায়ী (Migratory – অর্থাৎ বছরের কোনো একটি নির্দিষ্ট সময় এদেশে আসে, বসবাস করে ও সময়মতো মূল আবাসে ফিরে যায়), পশু-পরিযায়ী ও ভবঘুরে। এসব পাখি এদেশের মানুষের কাছে আগে, এমনকি এখনও, 'অতিথি পাখি' নামেই পরিচিত। এদেরই এক বিশাল অংশ এদেশে আসে শীতকালে যারা শীতের পরিযায়ী পাখি (Winter Migrant) নামেও পরিচিত। এরা এদেশে বংশবিস্তার করে না। এছাড়াও কিছু পাখি গ্রীষ্মেও পরিযায়ন করে, যেমন- বিভিন্ন প্রজাতির কোকিল (Cuckoo) ও সুমচা (Pitta) পাখি। এরা গ্রীষ্মের প্রজনন পরিযায়ী (Summer Breeder Migrant) বলে থাকেন। এছাড়াও বেশকিছু প্রজাতির পরিযায়ী পাখির উপস্থিতি এদেশে অনিয়মিত। হয়তো এক বছর এল, এরপর আবার ৫ বা ১০ বছর পর এল, অন্যদের মতো প্রতি বছর এল না। এদেরকে তাই যাযাবর বা ভবঘুরে বা অনিয়মিত পরিযায়ী পাখি বলে। আর এদের সংখ্যাও নেহাত কম না, এদেশে আসা সকল পরিযায়ী পাখির প্রায় এক-তৃতীয়াংশই এরা। আবার কোনো কোনো প্রজাতির পাখি অন্য কোনো দেশে পরিযায়নের এক পর্যায়ে এদেশে স্বল্প সময়ের জন্য বিশ্রাম নিতে আসে, যেমন- বাদামি চটক (Asian Brown Flycatcher), বন খঞ্জন (Forest Wagtail) ইত্যাদি। এরা পশু-পরিযায়ী (Passage-migrant) পাখি নামে পরিচিত। মূলত হেমন্তে অর্থাৎ সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবরে অন্য কোনো দেশে পরিযায়নের পথে অল্প সময়ের জন্য এদেশে ওরা যাত্রা বিরতি করে ও বসন্তে অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চে মূল দেশে ফিরে যাওয়ার সময়ও আরেকবার এদেশে যাত্রা বিরতি করে।

3.1.5.2 পরিযায়ী পাখি

এবার পাখির পরিযায়ন সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা যাক। পরিযায়ণ হলো একটি নিয়মিত মৌসুমী স্থানান্তর যা সচরাচর তার প্রজনন এলাকা ও শীতের আবাসের মধ্যে হয়ে থাকে। মেরু গাংচিল তার প্রজনন ক্ষেত্র উত্তর মেরু থেকে শীতের আবাস দক্ষিণ মেরুতে সবচেয়ে লম্বা পথ পাড়ি দেয়। ডোরা-লেজ জৌরালি এক উড়নে প্রায় ১১,০০০ কিলোমিটার উড়ন পথ পাড়ি দিয়ে আলাস্কা থেকে নিউজিল্যান্ডে পরিযায়ন করে। প্রধানত দুই ধরনের পাখিরা পরিযায়ণ করে।

প্রথম ধরন হলো সৈকত, নদী, মোহনা ও জলাভূমির পাখি। কমবেশি ৮২ প্রজাতির পাখি এই ধরনের অর্ন্তভুক্ত; মোট সংখ্যার হিসেবে পরিযায়ী পাখিদের মধ্যে ওদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। এদেশে ওরা মূলত ছয়টি উড়নপথ আবাসস্থল, যেমন- হাকালুকি, টাঙ্গুয়া ও হাইল হাওর (বাইস্কার বিলসহ), সোনাদিয়া দীপপুঞ্জ, নিঝুম দ্বীপ (দমার চরসহ) এবং গাঙ্গুইরার চর ছাড়াও রাজশাহীর পদ্মা নদী ও চরাঞ্চল, চাঁপাইনবাবগঞ্জের চরইল বিল, যমুনার চর, মেঘনার মোহনা, কাপ্তাই লেক, সুন্দরবন, উপকূলীয় এলাকাব্যাপী বিস্তৃত। সৈকত ও জলচর পাখিগুলোর মধ্যে বেশকিছু মহাবিপন্ন পাখি রয়েছে। যেমন- চামচুঁটো চাপাখি, সোনাজুঁঘা, মানিকজোড়, খুন্তে বক, বড়ো ভূতিহাঁস, তিলা সবুজ চাপাখি ইত্যাদি।

দ্বিতীয় ধরন হলো বনজঙ্গল, বাগান, কুঞ্জবন ও ঝোপঝাড়ের পাখি। প্রায় ১৫৬ প্রজাতির পাখি এই ধরনের অন্তর্ভুক্ত; মোট প্রজাতির হিসেবে এই ধরনের পাখির প্রজাতি সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। আর ওদের আশ্রয়স্থল সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন মিশ্র চিরসবুজ বন, কেন্দ্রীয় ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় বিভিন্ন পত্রঝরা বা শালবন, সুন্দরবন ও উপকূলীয় বাদা বন, গ্রামীণ বন, ঝোপঝাড়, ঘাসবন ও বাঁশবনজুড়ে বিস্তৃত। অনেকের ধারণা পরিযায়ী পাখিরা আমাদের খাদ্যে ভাগ বসায়, ওদের মলের মাধ্যমে আমাদের পরিবেশ নষ্ট করে, বিভিন্ন রোগ ছাড়ায় ইত্যাদি ইত্যাদি। কাজেই এগুলো শিকার করে খেয়ে ফেলাই ভালো। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি ঠিক নয়। কারণ পরিযায়ী পাখিরা তো আমাদের কোনো অপকার করেই না বরং প্রকৃতি ও পরিবেশের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির পাশাপাশি ওরা আমাদের অনেক উপকার করে। যেমন- কৃষির ক্ষতিকারক পোকমাকড় দমনে সাহায্য করে, ময়লা-আবর্জনা খেয়ে পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখে, ওদের মল জমির উর্বরশক্তি বৃদ্ধি করে ও মাছের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়, এবং পরিবেশের দূষণ নিয়ন্ত্রণ, ভারসাম্য রক্ষা ও পরিবেশ সূচক হিসেবে কাজ করে। এছাড়াও বর্তমানে এদেশের মানুষের মধ্যে পাখি পর্যবেক্ষণের হিড়িক পড়ে গেছে, যা অত্যন্ত জনপ্রিয় বিনোদনমূলক বিষয়। ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক পরিবেশ-পর্যটনের উন্নয়নে এটি সাহায্য করে যা বিলিয়ন ডলার শিল্প হয়ে উঠেছে। কাজেই ধীরে ধীরে এটি দেশের জন্য জৈব-অর্থনীতির সম্ভাব্য একটি উৎস হয়ে উঠছে। প্রতি বছর এদেশে যে সংখ্যক পরিযায়ী পাখি আসে সেগুলোর মধ্যে ৮টি মহাবিপন্ন, ৬টি বিপন্ন ও ৮টি সংকটাপন্ন প্রজাতি। কাজেই এসব পাখিদের অতিথি না ভেবে আমাদের প্রকৃতি ও পরিবেশের অংশ হিসেবেই বিবেচনা করা উচিত। এ কথা মনে রাখা উচিত যে, এসব পরিযায়ী পাখি শিকার করে ওদের সংখ্যা কমিয়ে দিলে কোনো কোনো মহাবিপন্ন পাখি, এমনকি এদেশ তথা গোটা বিশ্ব থেকেই বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। আর তা নিশ্চয়ই আমাদের জন্য ভালো হবে না। কাজেই নিজেদের অস্তিত্বের জন্যই পরিযায়ী পাখি রক্ষায় সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে।

3.1.6 স্তন্যপায়ী

স্তন্যপায়ী (Mammal) হলো মানুষসহ Mammalia শ্রেণীর যেকোন সদস্য, এদের সাধারণত মেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যে সবচেয়ে উন্নত বলে বিবেচনা করা হয়। এই শ্রেণীর অনন্য বৈশিষ্ট্য দুগ্ধদায়ী স্তনগ্রন্থি থেকেই স্তন্যপায়ী শব্দটির উৎপত্তি। বৃহৎ ও জটিল মস্তিষ্কের সুবাদে এরা শিক্ষণ, দ্রুত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা ও নমনীয় আচরণ প্রদর্শনের ক্ষমতা লাভ করেছে। পাখির মতো স্তন্যপায়ীরাও দেহের তাপ নিয়ন্ত্রণে সক্ষম। বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় ৪,৫০০ প্রজাতির স্তন্যপায়ীর এক-দশমাংশ রয়েছে ভারত উপমহাদেশে। বাংলাদেশে ১২ বর্গে, ৩৫ গোত্রে ১১০ প্রজাতির স্থলভাগের স্তন্যপায়ী এবং একটি বর্গ ও একটি গোত্রে ৩ প্রজাতির সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী আছে। এদের মধ্যে মাত্র কয়েক গ্রাম ওজন ও কয়েক সেমি মাপের ক্ষুদ্র ছুঁচো ও চামচিকা থেকে ৩ মিটার উচ্চতা ও ৪ মে. টনের বেশি ওজনের হাতি রয়েছে। বলে রাখা ভালো, নীল তিমি বৃহত্তম স্তন্যপায়ী, দৈর্ঘ্যে প্রায় ৩০ মিটার ও ওজন হয় প্রায় ১৫০ মে. টন। বাংলাদেশের স্তন্যপায়ী প্রাণীগুলোকে স্থলজ আর জলজ দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। স্থলজ প্রাণী যেমন বিভিন্ন প্রজাতির বানর, হনুমান, বনবিড়াল, হরিণ, শিয়াল, নেকড়ে, চিতাবাঘ, বেজি, বনরুই ইত্যাদি বাস করে বাংলাদেশের বনভূমি জুড়ে। এদের মাঝে সুন্দরবনের বাঘ বেঙ্গল টাইগার এবং দক্ষিণপূর্ব অঞ্চলের এশীয় হাতির খ্যাতি জগৎজোড়া। জলজ স্তন্যপায়ীর মধ্যে বাংলাদেশে দেখা মেলে শুশুক ও কিছু প্রজাতির ডলফিনের। মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্র নদী, উপকূলীয় এলাকা, মোহনা, টেকনাফ, সুন্দরবন এবং সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ডে ভেসে বেড়ায় এই ডলফিনরা। হঠাৎ হঠাৎ এই পানিতে ভেসে উঠে তিমি মাছও।

বাঘ

বেঙ্গল টাইগার বা রয়েল বেঙ্গল টাইগার বাঘের একটি বিশেষ উপপ্রজাতি। বেঙ্গল টাইগার সাধারণত দেখা যায় ভারত ও বাংলাদেশে। এছাড়াও নেপাল, ভুটান, মায়ানমার ও দক্ষিণ তিব্বতের কোন কোন অঞ্চলে এই প্রজাতির বাঘ দেখতে পাওয়া যায়। বাঘের উপপ্রজাতিগুলির মধ্যে বেঙ্গল টাইগারের সংখ্যাই সর্বাধিক। বেঙ্গল টাইগার আমাদের জাতীয় পশু। এর গায়ে লালচে বর্ণের উপর কালো ডোরাকাটা দাগ থাকে। এছাড়া এই বাঘের রয়েছে রাজকীয় চলন ও ক্ষিপ্ৰগতি। সুন্দরবনের প্রায় সব জায়গাতে এর পদচারণা লক্ষ করা যায়। কখনো সে গভীর অরণ্যে লুকিয়ে থাকে বা নদী-খালের পাড়ে হেতাল বা গোলপাতা গাছের নীচে আয়েশী ভঙ্গিমায় বিশ্রাম নেয় অথবা ঘাসের উপর শুয়ে থাকে। কখনও বা সে সাঁতার কেটে খাল বা নদী পারাপার হয় বা সমুদ্র সৈকতের পাড় দিয়ে রাজকীয় ভঙ্গিমায় হেঁটে চলে।

বাঘ নির্দিষ্ট অঞ্চল বা সীমানায় (territory) বা নিজস্ব রাজত্বে বসবাসকারী নিঃসঙ্গ প্রাণী। মানুষের শংস্রবে আসতে এরা অপছন্দ করে। পরিণত বাঘ শিকার করে এবং একাকী বাস করে। একমাত্র যৌন মিলন অথবা লড়াইয়ের সময় অন্যের সাক্ষাতে আসে। বাঘ তার নিজস্ব সীমানা রক্ষা করতেই অধিকাংশ সময় ও শ্রম ব্যয় করে, কারণ এটা তাদের টিকে থাকার লড়াই। বাঘিনী জঙ্গলের বিশেষ কোন এলাকার দখল নেয়, যেখানে টিকে থাকার জন্য প্রচুর শিকার পাওয়া যায়। একটি বাঘ এমন একটি এলাকা পছন্দ করে তার বসবাসের জন্য যে এলাকার মধ্যে একাধিক বাঘিনী বাস করে। পুরুষ বাঘ তার এলাকার মধ্যে বসবাসরত বাঘিনীদের উপর প্রজননের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে এবং তার এলাকার মধ্যে অন্য পুরুষ বাঘদের প্রবেশ প্রতিরোধ করতে নিয়মিত টহলদারী অব্যাহত রাখে। একটি পুরুষ বাঘের এলাকার মধ্যে দুই থেকে চারটি প্রজননক্ষম বাঘিনী বাস করে। বাঘ এবং বাঘিনী উভয়ই চিহ্ন দিয়ে তাদের উপস্থিতি জানান দেয় যাতে অন্য বাঘ সাবধান হয় এবং তার এলাকায় অনধিকার প্রবেশ না করে। একটি বাঘের বন এলাকায় অন্য বাঘ আসলে মারামারি লেগে যায়। তাই সবাই সবার আবাসিক এলাকা সংরক্ষণ করে রাখে। প্রজনন ঋতুতে বাঘ ও বাঘিনী একত্রে চলাফেরা করে। শরৎকাল বাঘের প্রজনন সময়। প্রজনন ঋতু শেষ হলে বাঘ ও বাঘিনী আলাদা হয়ে যার যার আবাস এলাকায় চলে যায়।

একসময় পৃথিবীতে আট প্রজাতির বাঘের দেখা মিলত। কিন্তু, বিংশ শতাব্দীতে এসে মাত্র পাঁচ প্রজাতির বাঘ দেখা যায়। বাকি তিনটি প্রজাতি পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়েছে। গত একশ বছরে চোরাশিকারি এবং আবাস ধ্বংসের কারণে বাঘের সংখ্যা প্রায় ১ লাখ থেকে মাত্র ৩-৪ হাজারে নেমে এসেছে। এই পরিস্থিতি বাঘের অস্তিত্বকে হুমকির মুখে ফেলে দিচ্ছে। বাকি পাঁচটি প্রজাতিও আজ খুব বেশি সুখে নেই। বাঘের অস্তিত্বের জন্য প্রধান হুমকি হ'ল বন উজাড় হওয়া। প্রতিনিয়ত বন ধ্বংস করা হচ্ছে, ফলে কমে যাচ্ছে বাঘের আবাস ভূমি। চোরা শিকারি বা বাঘ ডাকাতদের হাতে সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকায় বহু বাঘ মারা পড়ছে। বাঘের মাথা ও চামড়া বিপুল অঙ্কের টাকায় কালোবাজারীদের কাছে বিক্রি হয়। বাঘের হাড়ও অনেক দামে বিক্রি হয়, কারণ পূর্ব-এশিয়ার অনেক দেশের মানুষ বাঘের হাড় ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে তৈরী ঔষধ ব্যবহার করে। বাঘ রক্ষায় সরকার ইতিমধ্যে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন সংশোধন করে বাঘসহ অন্যান্য বন্যপ্রাণী হত্যায় সর্বোচ্চ শাস্তি ১২ বছরের কারাদণ্ড ও বন্যপ্রাণীর আক্রমণে মানুষ নিহত হলে ক্ষতিপূরণ হিসেবে ১ লাখ টাকা এবং আহত ব্যক্তিকে ৫০ হাজার টাকা দেওয়ার বিধান রয়েছে।

হাতি

হাতি, ডাঙায় চরে বেড়ানো স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং আন্তর্জাতিক বন্যপ্রাণিসম্পদ হিসেবে বিবেচিত। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালনের জন্য হাতিকে ফরেস্ট ইঞ্জিনিয়ার বলা হয়। তাই হাতিকে বনের ইন্ডিকেটর স্পেসিসও বলা হয়। বেজায় ওজন হলেও হাতি কিন্তু সাঁতার কাটতে পারে। ডুবুরিরা যেভাবে একটা পাইপের সাহায্যে নিঃশ্বাস নেয়, ঠিক তেমনি সাঁতারানোর সময় ওদের ঝুঁড়ের মাথাটা থাকে পানির ওপরে। হাতি তৃণভোজী প্রাণী। হাতির খাদ্য হচ্ছে বাঁশ, কলাগাছ, ফলদ উদ্ভিদ ও তৃণলতা। দিনের একটা বড় সময় ধরে তারা খাবার সংগ্রহ করে। কখনো কখনো দিনের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১৬ ঘণ্টা ধরেই তারা পাতা, ডাল, মূল এগুলো জোগাড় করে খাওয়ার জন্য। দিনে প্রায় ১০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে পারে হাতি। এদের স্বাভাবিক গতি ঘণ্টায় ২৫ মাইল। পৃথিবীর স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে কম ঘুমায় আফ্রিকার বুনো হাতি। দিন-রাত মিলিয়ে এরা গড়ে মাত্র দুই ঘণ্টা ঘুমায়। প্রধানত রাতেই এই সংক্ষিপ্ত নিদ্রা সারে তারা। পৃথিবীতে দুই প্রজাতির হাতি আছে- এশিয়ান প্রজাতি ও আফ্রিকান প্রজাতি। আফ্রিকান হাতিরও আবার দুটি প্রজাতি আছে- আফ্রিকান ফরেস্ট এলিফ্যান্ট আর আফ্রিকান বুশ এলিফ্যান্ট। বাংলাদেশের হাতি এশিয়ান প্রজাতির। আফ্রিকান প্রজাতির হাতি পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েরই দাঁত গজায়। কিন্তু এশিয়ান প্রজাতির ক্ষেত্রে শুধু পুরুষ হাতির দাঁত গজায়।

বর্তমানে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি এলাকা, কক্সবাজার, কাপ্তাই জাতীয় উদ্যান, টেকনাফ, হিমছড়ি জাতীয় উদ্যান এবং চুনতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যে অল্প সংখ্যক বন্যহাতি দেখা যায়। হাতির জন্য প্রয়োজন বিশাল বিচরণক্ষেত্র আর দরকার পর্যাপ্ত খাবার, পানি ও বিশ্রামের জায়গা। হাতিকে বন্য পরিবেশ থেকে বিলুপ্তি রোধে সরকারি-বেসরকারি বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি জনসচেতনতা আজ বড় বেশি প্রয়োজন। হাতি-মানুষ দ্বন্দ্ব নিরসনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যেমন হাতি-মানুষ দ্বন্দ্বপ্রবণ এলাকায় 'এলিফ্যান্ট রেসপন্স টিম' গঠন, বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মশালা, লোকালয়ের সীমানা বরাবর হাতির অপছন্দনীয় খাদ্যের বাগান (যেমন- কাঁকরল, তিতা করলা, মরিচ ইত্যাদি) সৃজন, বনের সীমানার অভ্যন্তরে হাতির খাদ্যোপযোগী বাগান সৃজন, চুনতির অভ্যন্তরে বড় হাতিয়া আশ্রয়ণ প্রকল্প এলাকায়

সোলার ফেন্সিং নির্মাণ, হাতি চলাচলের রাস্তা নির্দেশক ও জনসচেতনতামূলক নির্দেশিকা বোর্ডসহ বিবিধ কার্যক্রম।

হরিণ

হরিণ Artiodactyla বর্গের Cervidae গোত্রের রোমন্থক একদল স্তন্যপায়ী। গোত্রের সব সদস্যই স্বভাব ও গড়নের দিক থেকে প্রায় অভিন্ন। পুরুষ হরিণের মাথায় থাকে এক জোড়া শিং। এগুলি প্রথমে কোমল ভেলভেট-এর মতো রোমশ চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকে এবং পরে পরিণত বয়সে চামড়া শুকিয়ে যায় ও এক সময় খসে পড়ে।

বাংলাদেশের কয়েক প্রজাতির হরিণের মধ্যে সাম্বার (*Cervus unicolor*) বৃহত্তম এবং চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেটের বনে বাস করে। সবচেয়ে সুন্দর ও পরিচিত প্রজাতি হলো চিত্রা হরিণ (*C. axis*)। এর হলুদ, হালকা বা গাঢ় বাদামি পিঠ জুড়ে থাকে সাদা রঙের গোল গোল ফোঁটা। এদের আবাস প্রধানত সুন্দরবন। এক সময় সিলেটের বনাঞ্চলে নাত্রিনি হরিণ (hog deer, *C. porcinus*) দেখা গেলেও বাংলাদেশে এটি এখন আর টিকে নেই। মায়াহরিণ (*Muntiacus muntjac*) আকারে সবচেয়ে ছোট। সুন্দরবনের চিত্রা হরিণ ছাড়া বাংলাদেশের অন্য সবগুলি হরিণের সংখ্যা মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে।

খাটোলেজি বানর

খাটোলেজি বা ছোটোলেজি বানর যার ইংরেজি নাম Stumped-tailed Macaque Bear Macaque.

Cercopithecidae গোত্রের বানরটির বৈজ্ঞানিক নাম *Macaca arctoides*. বিশ্বব্যাপী সংকটাপন্ন বানর প্রজাতিটি এদেশে এখন তথ্য অপ্রতুল শ্রেণিতে রয়েছে। বাংলাদেশ ছাড়াও এরা ভারতের সাত রাজ্য (আসাম, অরুণাচল, মেঘালয়, ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড, মণিপুর ও মিজোরাম), মিয়ানমার, চীন, লাওস, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড ও মালয়েশিয়ায় বাস করে।

প্রাপ্তবয়স্ক খাটোলেজি বানরের দেহের দৈর্ঘ্য ৪৮.৫-৬৫ সেন্টিমিটার ও লেজ ৩.২-৬.৯ সেন্টিমিটার; ওজন ৭.৫-১০.২ কেজি। মুখমণ্ডল উজ্জ্বল গোলাপি বা লাল যা বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গাঢ় হয়ে প্রায় কালো রং ধারণ করে। এ ছাড়া সূর্যের আলোতেও কালো হতে পারে। লম্বা, ঘন ও গাঢ় বাদামি লোমে এদের পুরো দেহ আবৃত থাকে, তবে মুখমণ্ডল ও খাটো লেজটি লোমশূন্য থাকে। সদ্য জন্মানো বাচ্চার রং সাদা থাকে, যা বয়স বাড়ার সঙ্গে গাঢ় হয়ে যায়। এছাড়াও প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের দাড়ি থাকে।

খাটোলেজি বানর আর্দ্র ও মিশ্র চিরসবুজ বনের গহিনে বাস করে। যদিও চার যুগের বেশি সময় ধরে এদের এদেশে দেখা যায়নি। তারপরও বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, ভারতের ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড ও মিজোরাম এবং মিয়ানমার সংলগ্ন সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগের গভীর বনে এদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। দিবাচর, বৃক্ষবাসী ও ভূমিচারী এই বানরগুলো লাজুক হলেও ভীতু নয় মোটেও। এরা পুরুষ, স্ত্রী, বাচ্চাসহ ৫ থেকে ৬০টির দলে বাস করে। মূলত ফলখেকো হলেও বীজ, ফুল, পাতা, শিকড়, মিঠাপানির কাকড়া, ব্যাঙ, পাখি, পাখির ডিম, কীটপতঙ্গ ইত্যাদি খায়।

সচরাচর অক্টোবর থেকে নভেম্বরে এরা প্রজনন করে। স্ত্রী বানর চার বছর বয়সে প্রজনন উপযোগী হয় ও প্রায় ১৭৭ দিন গর্ভধারণের পর একটি বাচ্চা প্রসব করে। স্ত্রী বানর ১৭ বছর বয়স পর্যন্ত প্রজননক্ষম থাকে। যদিও প্রকৃতিতে এদের আয়ুষ্কাল ১০-১২ বছর, তবে আবদ্ধাবস্থায় ৩০ বছর পর্যন্ত বাঁচতে পারে।

রেসাস বানর

Rh-ফ্যাক্টর, আমাদের কাছে অতি পরিচিত একটি শব্দ। সাধারণত ব্লাড গ্রুপ Rh+ নাকি Rh- এই ফ্যাক্টরটি যেই জিনগুলোর উপর নির্ভরশীল সেই সম্পূর্ণ ধারণাটি এসেছিলো রেসাস বানরকে নিয়ে গবেষণা করেই।

বৈজ্ঞানিক নাম *Macaca mullata* এবং গোত্র Cercopithecidae

রেসাস বানর বিপন্ন একটি স্তন্যপায়ী, প্রাইমেট বর্গের প্রাণী। বাংলাদেশে তিন প্রজাতির লম্বা লেজযুক্ত রেসাস বানর পাওয়া যায়। IUCN রেসাস বানরকে মহাবিপন্ন বলে চিহ্নিত করেছে। তাদের বসবাসের স্থান ধ্বংস করা, বনায়ন ধ্বংস করা ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবর্তন আসার কারণে এই প্রাণীটির সংখ্যা দিন দিন কমে আসছে। বর্তমানে বঙ্গোপসাগরের তীরে মূলত বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ও ইন্দোনেশিয়ায় অনেক রেসাস বানর পাওয়া যায়। ১৯৮০ সালের দিকে চকোরিয়া সুন্দরবনে ২৫৩টি রেসাস বানর দেখা গেছে (১৯৮০, ড. ফরিদ আহসান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়)। তখন সুন্দরবনের প্রাকৃতিক অবস্থা বেগতিক ছিলো না।

রেসাস বানর খুব-ই বুদ্ধিমান একটি প্রাণী। উক্ত প্রাণীর বুদ্ধিমত্তা প্রাইমেট বর্গের প্রাণীদের পূর্বপুরুষদের একটি ধারণা দেয়। তারা পাথরকে হাতুড়ি হিসেবে ব্যবহার করে বিভিন্ন কাজে যেমন: শক্ত খোলসের কোনো ফল বা শামুক ভাঙা।

উক্ত স্তন্যপায়ী প্রাণীটিকে বিলুপ্তি থেকে মুক্ত করতে নানান সচেতনতামূলক কাজ করা হচ্ছে। রেসাস বানরদের বসবাসের জন্যে সঠিক পরিবেশ তৈরি করতে পারলে ও তা বজায় রাখতে পারলে অবশ্যই তাদের আবার পরিবেশে ফিরিয়ে আনা যাবে বলে ধারণা করা যায়।

উল্লুক

উল্লুক হলো গিবন (হাইলোবাটিডি) পরিবারের দুইটি প্রজাতির প্রাণীর সাধারণ নাম। এরা লেজবিহীন বানরের ন্যায় দেখতে এক প্রাণী, হাতগুলো পায়ের চেয়ে অনেক লম্বা। সাধারণত থে-উ, হু-উ, হো-কো-উ ইত্যাদি স্বরের একটানা ও যৌগিক স্বরে ডাকে আর এই জন্যই এদের নাম উল্লুক। পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মৌলভীবাজার ও ময়মনসিংহের (মেঘালয়ের তুরা পাহাড় সংলগ্ন বালিকুরি জঙ্গলের বনাঞ্চলে) এরা বসবাস করে।

উল্লুক গিবন জাতের প্রাইমেটদের মধ্যে আকারে দ্বিতীয় বৃহত্তম। বৃহত্তমটি সিয়ামাং। এদের দৈর্ঘ্য প্রায় ৬০ হতে ৯০ সেন্টিমিটার, এবং ওজন ৬ হতে ৯ কেজি। পুরুষ উল্লুক আর মেয়ে উল্লুকের আকার সমান হলেও এদের গায়ের রঙে বেশ পার্থক্য রয়েছে। পুরুষদের গায়ের রঙ কালো কিন্তু সাদা ঋ রয়েছে আর অন্যদিকে মেয়ে উল্লুকের সারা গায়ে আছে ধূসর বাদামী লোম। এছাড়াও মেয়ে উল্লুকের চোখ আর মুখের চারপাশে গোল হয়ে সাদা লোমে আবৃত থাকে যা অনেকটা মুখোশের ন্যায় দেখা যায়।

উল্লুকরা মূলত বিভিন্ন ফল ও ডুমুর খায়। এছাড়াও পোকামাকড়, কচি পাতাও খেয়ে থাকে। এরা সাধারণত সামাজিক হয়ে থাকে এবং পরিবারে বাবা ও মা উল্লুকসহ আরও তিন চারটি উল্লুক বা এরও বেশি থাকে। উল্লুক পরিবারগুলো নিজেদের এলাকা ও সীমানা রক্ষা করে চলে। এরা উঁচু গাছের মাথায় থাকতে পছন্দ করে। এদের ক্ষেত্রে প্রায় ছয়/সাত মাসের গর্ভাবস্থা শেষে শিশু উল্লুকের জন্ম হয়। জন্মের সময় এদের গায়ে ঘোলাটে সাদা লোম থাকে। ছয় মাস পর তা লিঙ্গ অনুসারে কালো বা বাদামী ধূসর রং ধারণ করে। জন্মের ৮ থেকে ৯ বছর পর একটি উল্লুক প্রাপ্তবয়স্ক হয়। উল্লুকের আয়ুষ্কাল ২৫ বছর।

বিশ্বে ১৯ ধরনের উল্লুক থাকলেও দক্ষিণ এশিয়ায় তিনটি প্রজাতি দেখা যায়। বাংলাদেশে মূলত ওয়েস্টার্ন হোলক গিবন বা পশ্চিমা উল্লুক দেখা যায়। বর্তমানে পৃথিবীজুড়ে উল্লুক বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে। বাংলাদেশে অবস্থিত লাউয়াছড়া বনে যেখানে দুইদশক আগেও কয়েক হাজার উল্লুক দেখা যেতো, তা বর্তমানে একশোর নিচে চলে এসেছে। লাউয়াছড়া ও তার আশেপাশের বনে মোট ১৬ টি উল্লুকের পরিবার রয়েছে। নির্বিচারে বন নষ্ট করার ফলে উল্লুকের বাসস্থান ও খাদ্যসংকট সৃষ্টি এদের সংখ্যা হ্রাসের অন্যতম কারণ। তাই উল্লুককে বাচাঁতে দরকার আমাদের সবার সচেতনতা।

মেছোবিড়াল

মেছোবিড়াল (Fishing Cat) বাংলাদেশের একটি সংকটাপন্ন প্রাণী। বৈজ্ঞানিক নাম *Prionailurus viverrinus* এবং পরিবার Felidae। এরা হাওর অববাহিকা, উত্তরাঞ্চলের চলনবিল, দক্ষিণের ম্যানগ্রোভ ও জলাভূমি অঞ্চলে বসবাস করে। এরা মূলত জলাভূমি থেকে মাছ শিকার করে। কিন্তু জলাভূমি ধ্বংসের কারণে এরা সংঘাতময় প্রজাতিতে পরিণত হয়েছে, কারণ তারা খামার থেকে মাছ শিকার করতে বাধ্য হচ্ছে।

ইরাবতী ডলফিন

ইরাবতী ডলফিন একটি স্তন্যপায়ী প্রাণী। সমগ্র বিশ্ব থেকে প্রাণীটি ধীরে ধীরে বিলুপ্তির পথে চলে গেলেও, বিশ্বের মোট ইরাবতী ডলফিনের ৮০ শতাংশ এখনো বাংলাদেশে পাওয়া যায়। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Orcaella brevirostris* এবং গোত্র Delphinidae। ইরাবতী ডলফিন নদীর পানি থেকে উপকূলীয় অঞ্চলের লোনা পানিতেও অভিযোজিত এবং বসবাস করতে সক্ষম। এদের বঙ্গোপসাগরের উপকূলে, আন্দামান সাগরে, থাইল্যান্ডের উপসাগরে পাওয়া যায়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইরাবতী নদীতে এদের পাওয়া যায় এবং উক্ত নদীর নাম অনুসারেই এদের নামকরণ হয় “ইরাবতী ডলফিন”। এছাড়াও অস্ট্রেলিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার পানিতেও ইরাবতী ডলফিনের দেখা মেলে। বাংলাদেশে সুন্দরবন ও গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনার মিলিত অববাহিকায় ইরাবতী ডলফিন দেখা যায়। এদের গায়ের রং নীলাভ-ধূসর রঙের। প্রাণীটির মুখ ভোঁতা, ছোট চঞ্চু ও ছোট পাখনা বিদ্যমান। এদের খাদ্য মাছ এবং খুব-ই চতুরতার সাথে তারা জেলেদের জাল ফাঁকি দিয়ে বের হয়ে যেতে পারে।

বাদুড়

বাদুড় (*Pipistrellus savii*) স্তন্যপায়ী প্রাণী যারা স্বাধীনভাবে উড়তে সক্ষম। ছোট কালো লোমে আবৃত pipistrelle যাকে বাংলায় “চামচিকা” নামে আমরা চিনি তা বাদুড়ের-ই একটি জাত। বাদুড় স্বাধীনভাবে উড়তে পারে তবে বাদুড়ের দৃষ্টিশক্তি খুবই কম এবং তারা শব্দতরঙ্গের প্রতিধ্বনি সৃষ্টির মাধ্যমে চলাচল করে। শুধু তাই নয় শিকার করা, আত্মরক্ষা, উড়া সব কাজেই এই প্রাণীটি প্রতিধ্বনির ব্যবহার করে। এরা ডিম পাড়ে না। অন্য

সকল স্তন্যপায়ী প্রাণীর মতন তারা বাচ্চা প্রসব করে ও দুগ্ধপান করায়। বাদুড় ফল, নেকটার, পোকামাকড় খেয়ে বেঁচে থাকে। কিছু ধরণের বাদুড় আছে যারা রক্ত খেয়ে থাকতে পারে।

বাদুড় নিজে রোগ না ছড়ালেও, বিভিন্ন রোগের বাহক হিসেবে কাজ করে। নিপা ও ইবোলা ভাইরাস তার উদাহরণ। বাদুড় থেকে মানুষে সরাসরি ভাইরাস সংক্রমণ করে কিনা এই বিষয়ে এখনো স্পষ্ট প্রমাণ না পাওয়া গেলেও এটা স্পষ্ট যে বাদুড়ের মাংস খাওয়া, বাদুড়ের বাসস্থান নষ্ট করার মাধ্যমে বাদুড়ের মত বন্যপ্রাণী মানবসমাজে ঢুকে যাচ্ছে যা সম্ভবত বিভিন্ন রোগ ছড়াচ্ছে। কারণ যত বাস্তুতন্ত্রের ব্যাঘাত ঘটছে তত সংক্রমণকারী ভাইরাসেরা নতুন বাহকে নিজেদের অভিযোজিত করার চেষ্টা করে।

বাংলাদেশে প্রতি বছর-ই নিপা ভাইরাসের সংক্রমণে অনেকে মৃত্যুবরণ করে। মূলত খেজুরের রস নির্দিষ্ট তাপে ফুটিয়ে জীবাণুমুক্ত করে না খাওয়ার জন্যে এটি হয় কারণ বাদুড়ের বিভিন্ন প্রজাতি যারা খেজুর গাছে বাস করে, সেই প্রাণীর লাল ও মল-মূত্রে নিপা ভাইরাস থাকতে পারে।

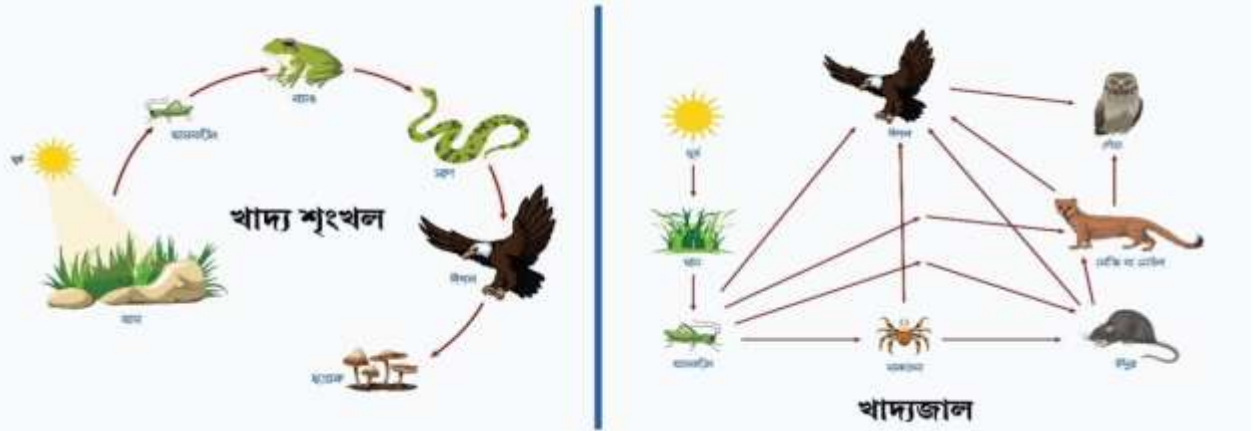
বাদুড়ের যে অপকারিতা রয়েছে তা ঠিক নয়, বাদুড় প্রতিরাতে গড়ে ৫০০-৩০০০ পোকামাকড় খেয়ে ফেলে। ফলে, বাদুড় একটি প্রাকৃতিক কীটনাশক হিসেবে কাজ করে। যদিও বর্তমানে গাছপালা কমে যাওয়ার কারণে বাদুড়ের বসবাসের স্থানেও ঘাটতি পড়ছে যা পরবর্তীতে পরিবেশের জন্যে ক্ষতিকারক হতে পারে।

3.2 বাস্তুতন্ত্রে বন্যপ্রাণীর অবদান

বাস্তুতন্ত্রে ভারসাম্য রক্ষার্থে সকল মেরুদণ্ডী এবং অমেরুদণ্ডী প্রাণী গুরুত্বপূর্ণ। কারণ প্রত্যেকের বাস্তুতন্ত্রে আলাদা আলাদা ভূমিকা রয়েছে। পরস্পরের অস্তিত্ব রক্ষার্থে প্রাণীদের মাঝে নানারকম আদান-প্রদান দেখা যায় যা ক্ষেত্রবিশেষে কোনো প্রজাতির জন্যে ক্ষতিকর কিংবা লাভজনক হতে পারে। তবে এই আন্তঃসম্পর্ক জালের ফলে ভারসাম্য রক্ষা হয়। কোনো একটি উপাদানের পরিবর্তন কিংবা বিলুপ্তির ফলে পুরো বাস্তুতন্ত্রে এবং ভবিষ্যতে সমস্ত পরিবেশেই খারাপ প্রভাব পড়ে।

3.2.1 খাদ্য শৃঙ্খল, খাদ্য জাল ও খাদ্য পিরামিড

উৎপাদক জীব যেমন উদ্ভিদ খেয়ে জীবনধারণ করে কিছু প্রথম স্তরের খাদক, যেমন ফড়িং। আবার ফড়িং খেয়ে জীবন ধারণ করে দ্বিতীয় স্তরের খাদক ব্যাঙ, ব্যাঙকে আবার তৃতীয় স্তরের খাদক সাপ খায়, আর সাপকে খায় সর্বোচ্চ স্তরের খাদক বাজপাখি। এই বাজপাখি মৃত্যুর পর বিয়োজক তথা মৃতভোজী জীব যেমনঃ ছত্রাক বাজপাখির দেহে বিয়োজন বা পচন ঘটায়। এভাবে উৎপাদক জীব থেকে শীর্ষে থাকা সর্বোচ্চ স্তরের খাদক ও বিয়োজক বা পচনকারীতে সমাপ্ত হওয়া পারস্পরিক রৈখিক সম্পর্ককে খাদ্যশৃঙ্খল বলে। খাদ্য শৃঙ্খলের মাধ্যমে অনুধাবন করা যায় বিভিন্ন জীব খাদ্যের জন্য একে অপরের সাথে কীভাবে সম্পর্কযুক্ত। খাদ্য শৃঙ্খলের ধাপগুলিকে **খাদ্যস্তর** বলে।



এখন, একটি প্রাণিকে কি শুধু একটি প্রাণিই শিকার করে? না। অন্য অনেক প্রাণিও তো তাকে শিকার করে। আবার সেই প্রাণিটিকেও একাধিক প্রাণি শিকার করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, একটি নির্দিষ্ট প্রাণী শুধু একটি খাদ্যশৃঙ্খলেরই অংশ নয়, বরং সে বিভিন্ন খাদ্যশৃঙ্খলেরও অংশ হতে পারে, এমনকি বিভিন্ন স্তরেরও। এভাবে, কোনো বিভিন্ন জীবের মধ্যে খাদ্য-খাদকের সম্পর্কের যে জটিল জাল বিস্তৃত, তাকে খাদ্য জাল বলে। একটি খাদ্যজালের অনেকগুলো খাদ্যশৃঙ্খল নিয়ে গঠিত হয়ে। খাদ্য শৃঙ্খল শুধুমাত্র অল্পসংখ্যক জীবের মধ্যকার

খাদ্য-খাদকের একমুখী সম্পর্ক। অন্যদিকে বিভিন্ন খাদ্য শৃঙ্খলের মধ্যে প্রাকৃতিক আন্তঃসংযোগগুলো মিলে গঠিত হয় একেকটি খাদ্য জাল।

খাদ্য পিরামিড:

বাস্তুতন্ত্রে অসংখ্য জীবজন্তু ও উদ্ভিদ একসাথে অবস্থান করে এবং এদের খাদ্যাভাস প্রায় একই ধরনের হয়। একই উৎস থেকে এরা নিজেদের খাদ্য জোগাড় করে। বাস্তুতন্ত্রে একটি খাদ্যস্তর থেকে অপর খাদ্যস্তরে শক্তি স্থানান্তরিত হওয়ার সময় কিছু পরিমাণ শক্তি তাপশক্তি রূপে পরিবেশ ফিরে যাওয়ার জন্য পরবর্তী খাদ্যস্তরে মোট শক্তির পরিমাণ কমে যায়। এই কারণে পরবর্তী খাদ্যস্তরে কম পরিমাণ শক্তির স্থানান্তরিত হয়। ফলে জীবের সংখ্যা কমে যায়। কারণ বেশি সংখ্যক জীবকে পূর্ববর্তী খাদ্যস্তর শক্তির জোগান দিতে সক্ষম হয় না। এই কারণে নিম্ন খাদ্যস্তর থেকে উচ্চ খাদ্যস্তর পর্যন্ত জীবের সংখ্যা, ভর এবং স্থানান্তরিত শক্তিকে পরপর সাজালে যে চিত্র পাওয়া যায় তাকে খাদ্য পিরামিড বলে।

বিজ্ঞানী জি. এলটন (G. Elton, 1939) প্রথম বাস্তুতন্ত্রের উৎপাদক থেকে সর্বোচ্চ খাদক পর্যন্ত জীবের সংখ্যা, শক্তি ও ওজনের হ্রাস পাওয়ার এই পিরামিড নিয়ে ধারণা দেন। খাদ্য পিরামিডের সবচেয়ে নীচের স্তরে থাকে উৎপাদক, যারা সংখ্যায় বা পরিমাণে সবচেয়ে বেশি হয় এবং সবচেয়ে শীর্ষে থাকে সর্বোচ্চ খাদক, যারা সংখ্যায় বা পরিমাণে সবচেয়ে কম থাকে।

বৈশিষ্ট্য:

বাস্তুতন্ত্রে উৎপাদকের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। এই কারণে উৎপাদক পিরামিডের নিচে অর্থাৎ ভূমিতে অবস্থান করে। খাদ্য পিরামিডে প্রাথমিক খাদকের স্থান উৎপাদকের ঠিক পরে। প্রাথমিক খাদকের সংখ্যা উৎপাদকের তুলনায় কম হওয়ায় উপরে স্থান পায়। গৌণ খাদক এবং প্রগৌণ খাদক প্রাথমিক খাদকের ঠিক উপরে অবস্থান করে। কারণ এর সংখ্যা প্রাথমিক খাদক এর তুলনায় কম। প্রগৌণ খাদক পিরামিডের শীর্ষে অবস্থান করে। কোন কোন ক্ষেত্রে অন্য কোন শীর্ষ খাদক পিরামিডের সর্বোচ্চ স্থান দখল করে থাকে। খাদ্য পিরামিডের প্রতিটি স্তরেই বিয়োজক অবস্থান করে।

বাস্তুতান্ত্রিক পিরামিড বা খাদ্য পিরামিড প্রধানত তিন প্রকারের হয়। যেমন- জীবের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে পিরামিড (Pyramid of Numbers), জীবের ভরের উপর ভিত্তি করে পিরামিড (Pyramid of Biomass), জীবের শক্তি বা এনার্জির উপর ভিত্তি করে পিরামিড (Pyramid of Energy)

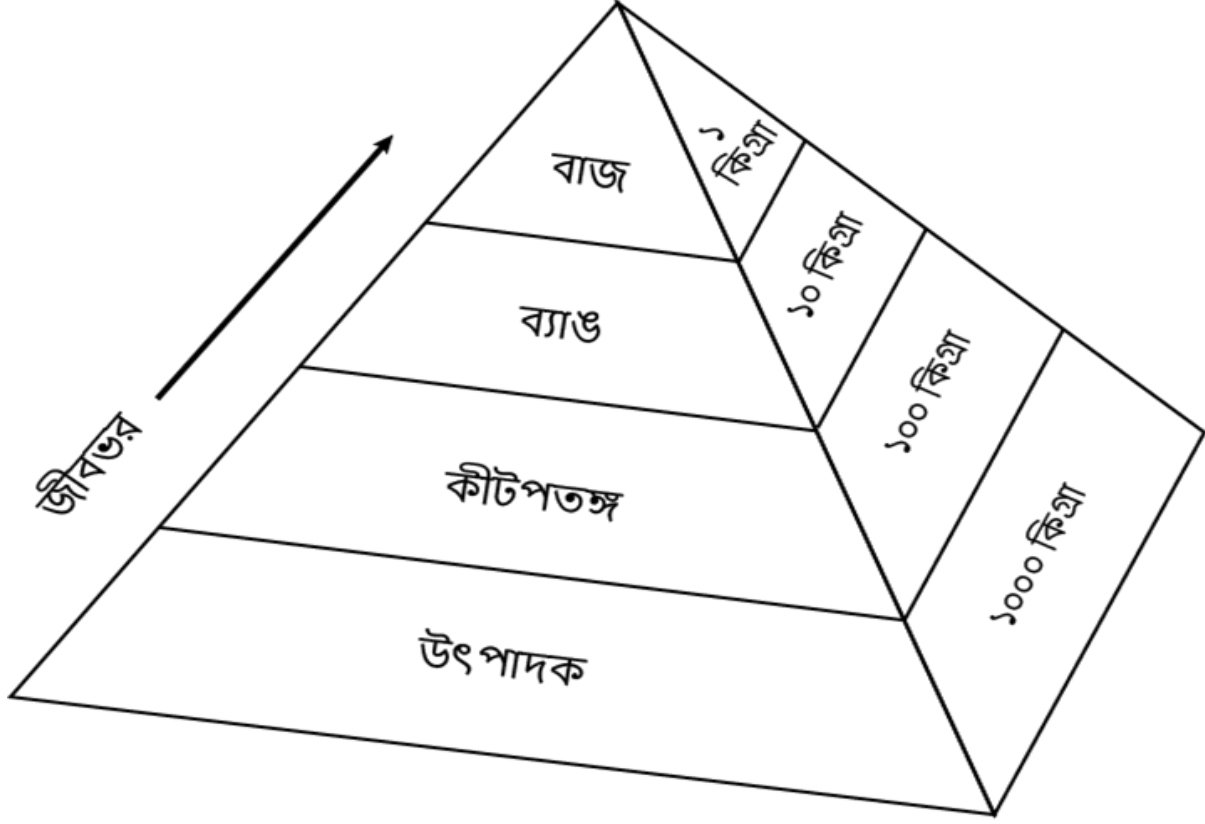
জীবসংখ্যার পিরামিড: কোন বাস্তুতন্ত্রের প্রতি একক ক্ষেত্রফলে প্রতি স্তরের খাদকের সংখ্যাকে পরপর সাজালে যে পিরামিড পাওয়া যাবে সেটিই জীব সংখ্যার পিরামিড। জীব পিরামিডের ভূমিতে অবস্থান করে উৎপাদক বা সবুজ উদ্ভিদ। পরবর্তী খাদ্যস্তরে (যেমন- প্রথম শ্রেণীর খাদক, দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদক, তৃতীয় শ্রেণীর খাদক) জীবের সংখ্যা ক্রমশ কমতে থাকে। কোন একটি খাদ্যস্তরের জীবের সংখ্যার ওপর পরবর্তী খাদ্যস্তরের জীবের সংখ্যা নির্ভর করে।



জীবের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে পিরামিড (Pyramid of Numbers)

যেমন: চারণভূমিতে বা তৃণভূমির বাস্তুতন্ত্রে ঘাসের তুলনায় তৃণভোজী প্রাণীর সংখ্যা কম। তৃণভোজী প্রাণীদের যেহেতু মাংসাশী প্রাণীরা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে একারণে মাংসাশী প্রাণীর সংখ্যা তৃণভোজী প্রাণীর সংখ্যার তুলনায় কম হয়। মাংসাশী প্রাণীদের ওপর যে সকল প্রাণী নির্ভরশীল অর্থাৎ মাংসাশী প্রাণীদের যে সকল প্রাণীরা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে তাদের সংখ্যা মাংসাশী প্রাণীর তুলনায় কম হয়।

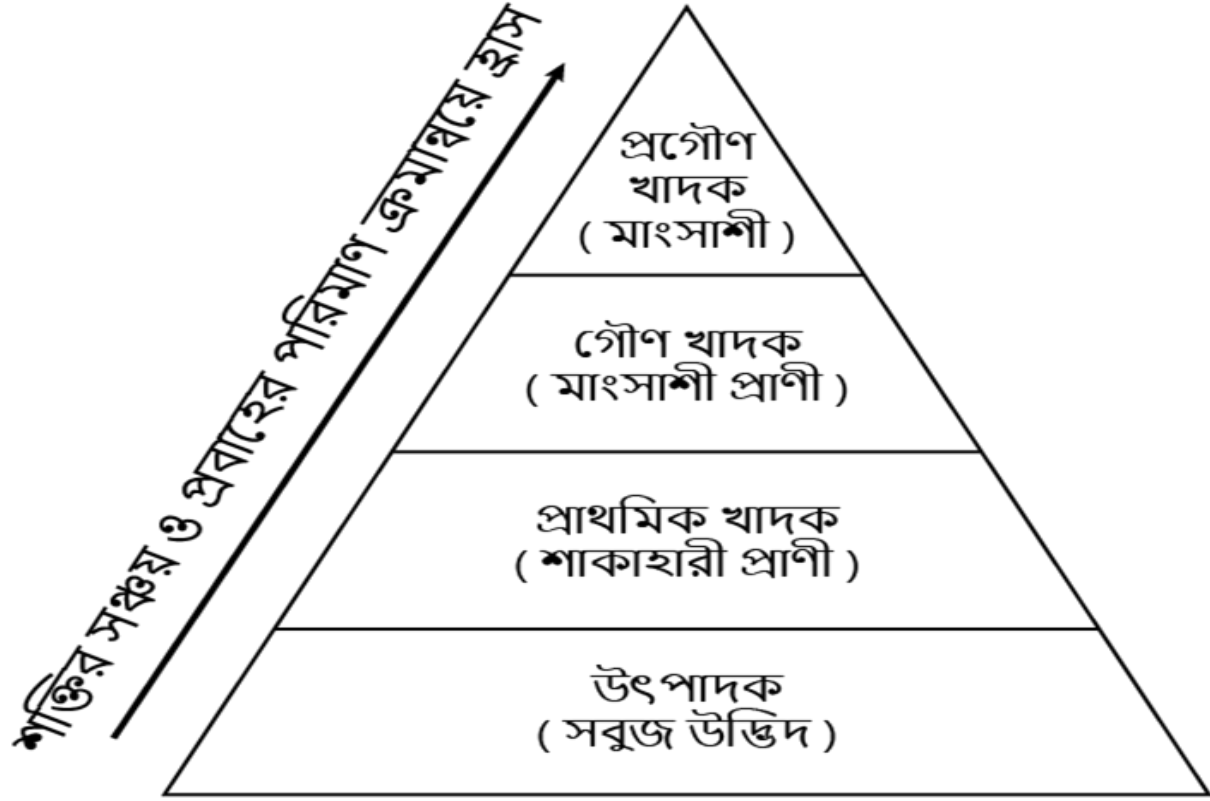
জীবভরের পিরামিড বা বায়োমাস পিরামিড: জীবভরের পিরামিড বোঝার আগে আমাদের জানতে হবে জীবের শুষ্ক ভর বা Dry Weight কী। কোন উদ্ভিদ বা প্রাণী থেকে পানির পরিমাণ সরিয়ে ফেললে যে ভর পাওয়া যাবে, সেটিই ওই জীবের শুষ্ক ভর বা Dry Weight। এই শুষ্ক ভর কোন জীবের নমুনা ভর হিসেবে ব্যবহার করা হয়। খাদ্য শৃঙ্খলের প্রতিটি স্তরের জীবের এই শুষ্ক ভরকে পরপর সাজালে যে পিরামিড পাওয়া যায় তাকে জীবভরের পিরামিড বলে।



জীবের শক্তি বা এনার্জির উপর ভিত্তি করে পিরামিড (Pyramid of Energy)

দেখা গেছে, কোন একটি খাদ্য শৃঙ্খলের একটি খাদ্যস্তরের ১৫ থেকে ২০ শতাংশ জীবভর পরবর্তী খাদ্যস্তরে স্থানান্তরিত হয়। এই কারণে উৎপাদকের তুলনায় প্রথম শ্রেণীর খাদকের জীবভর কম হয় এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদকের জীবভর প্রথম শ্রেণীর খাদকের তুলনায় কম হয়। যেমন- বনভূমির বাস্তুতন্ত্রে উৎপাদকের জীবভর সর্বাপেক্ষা বেশি হয় এবং সর্বোচ্চ স্তরের খাদকের জীবভর সবচেয়ে কম হয়।

শক্তির পিরামিড বা এনার্জি পিরামিড: বাস্তুতন্ত্রে উৎপাদক বা সবুজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সৌরশক্তিকে ব্যবহার করে নিজের খাদ্য নিজেই উৎপাদন করে। যে পরিমাণ শক্তিকে সবুজ উদ্ভিদ নিজেদের মধ্যে আবদ্ধ করে তার কিছু পরিমাণ তার শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়া-কলাপের জন্য ব্যয় করে। কিছু অংশ পরবর্তী খাদ্যস্তরে স্থানান্তরিত হয়। অর্থাৎ উৎপাদক যে পরিমাণ সৌরশক্তি ব্যবহার করে নিজের জন্য সবটাই কিন্তু পরবর্তী খাদ্যস্তরের স্থানান্তরিত হয় না।



জীবের ভরের উপর ভিত্তি করে পিরামিড (Pyramid of Biomass)

দেখা যায় যে, একটি খাদ্যস্তরের থেকে পরবর্তী খাদ্যস্তরে শক্তির স্থানান্তর ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ কমে যায়। এই কারণে উৎপাদক থেকে প্রাথমিক খাদকে স্থানান্তরিত শক্তির পরিমাণ কম হয়। গৌণ খাদকে প্রাথমিক খাদক যে পরিমাণ শক্তি অর্জন করে তার থেকে কম পরিমাণে স্থানান্তরিত হয়। উৎপাদক থেকে শক্তি বিভিন্ন খাদ্যস্তরের এই স্থানান্তরকে যে পিরামিডের মাধ্যমে দেখানো হয় তাকে শক্তির পিরামিড বলে।

3.2.2 বন্যপ্রাণির বিভিন্ন ধরনের আন্তঃসম্পর্ক

পরজীবিতা: বাস্তুতন্ত্রে কোনো প্রজাতি ভিন্ন প্রজাতিভুক্ত জীবের দেহে জীবনের এক বা একাধিক পর্যায়ে বাস করতে পারে। এধরনের সম্পর্কে পরজীবিতা (Parasitism) বলা হয়। পরজীবিতায় বেশিরভাগ সময়ই পোষক জীব ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যেমন- উঁকুন।

সহভোজিতা: যখন দুইটি প্রজাতির আন্তঃসম্পর্কের ফলে একটি প্রজাতি লাভবান হয়, কিন্তু অপর প্রজাতির তেমন কোনো লাভ বা ক্ষতি কিছুই হয়না, তখন তাকে সহভোজিতা (Commensalism) বলে। যেমন- গৃহপালিত পশুর গায়ে বসে থেকে বিভিন্ন পাখি পোকামাকড় খায়, যা সহভোজিতার একটি উদাহরণ।

পারস্পরিকতা: আন্তঃসম্পর্কের ফলে উভয় প্রাণিই যখন উপকৃত হয়, তখন তাকে পারস্পরিকতা (Mutualism) বলে। যেমন: ফুল এবং মৌমাছি। মৌমাছি ফুল থেকে নেক্টার আহরণ করে জীবনধারণ করে, আর মৌমাছির মাধ্যমে ফুলের পরাগায়ন ঘটে। এভাবে উভয়ই উপকৃত হয়।

মিথোজীবিতা: যখন দুইটি ভিন্ন প্রজাতির মাঝে দীর্ঘস্থায়ী পারস্পরিক সম্পর্কের ফলে দুই প্রজাতিই উপকৃত হয় তাকে মিথোজীবিতা বলা হয়। যেমন: লাল কাঁকড়া এবং ইস্ট। ইস্ট কাঁকড়ার দেহকে ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া থেকে রক্ষা করে, অন্যদিকে ইস্টের বেঁচে থাকার জন্য লাল কাঁকড়ার দেহ আদর্শ আবাসস্থল।

3.3 বন্যপ্রাণীর রোগের বিস্তার, সংক্রমণ ও প্রতিরোধ (Wildlife Diseases' Spread, Surveillance and Prevention)

মানুষ ও প্রাণী উভয়ই বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। পৃথিবীর অনেক দেশে পশু-পাখি থেকে যে সব রোগ মানুষের মাঝে সংক্রমিত হচ্ছে বা হতে পারে তা নিয়ে বিশেষভাবে রোগতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ, জরিপ ও গবেষণা শুরু হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে এ নিয়ে এখনো তেমন কোণ কাজ হয়নি। আমরা অনেকেই জানি না কোন কোন পশুপাখির রোগ মানুষের মাঝে সংক্রমিত হতে পারে বা হচ্ছে।

বাংলাদেশের বন্যপ্রাণীরা বিভিন্ন রোগের শিকার হতে পারে। এই রোগগুলো প্রাকৃতিকভাবে হতে পারে, আবার মানুষের কর্মকাণ্ডের ফলেও হতে পারে। বন্যপ্রাণীদের রোগের কিছু সাধারণ উদাহরণ হল:

- **অ্যানথ্রাক্স:** এটি একটি ব্যাকটেরিয়াঘটিত রোগ যা গরু, ছাগল, ভেড়া, এবং অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।
- **রেবিস:** এটি একটি ভাইরাসঘটিত রোগ যা কুকুর, বাদুর, এবং অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।
- **ক্যানাইন ডিসটেম্পার:** এটি একটি ভাইরাসঘটিত রোগ যা কুকুর, শেয়াল, এবং অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।
- **ফাউল পক্স:** এটি একটি ভাইরাসঘটিত রোগ যা মুরগি, হাঁস, এবং অন্যান্য পাখিদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।
- **নিউক্যাসল ডিজিজ:** এটি একটি ভাইরাসঘটিত রোগ যা মুরগি, হাঁস, এবং অন্যান্য পাখিদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

জুনোটিক রোগ বিভিন্ন ধরনের রোগজীবাণু (pathogen) দ্বারা সংঘটিত হয়। এসকল রোগজীবাণু ৪ টি ভাগে ভাগ করা যায় যথা: ব্যাক্টেরিয়া, ভাইরাস, রিকেটশিয়া ও পরজীবী।

ব্যাকটেরিয়া (Bacteria)

ব্যাকটেরিয়া এককোষী, প্রোক্যারিওট জীব যা কোষ প্রাচীর দ্বারা ঘেরা। এদের কোন নিউক্লিয়াস বা অন্যান্য ঝিল্লিবদ্ধ অঙ্গাণু নেই। ব্যাকটেরিয়া বিভিন্ন আকার, আকৃতি এবং রঙে পাওয়া যায়।

ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ:

- খাদ্যবাহিত সংক্রমণ: দূষিত খাবার খাওয়ার মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ হতে পারে।
- জলবাহিত সংক্রমণ: দূষিত জল পান করার মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ হতে পারে।
- শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ: দূষিত বাতাস শ্বাস গ্রহণের মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ হতে পারে।
- ত্বকের সংক্রমণ: দূষিত ত্বকের মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ হতে পারে।

অসংখ্য ব্যাক্টেরিয়ার মধ্যে শুধু যেগুলো এদেশে কোনো না কোনো রোগের জন্য দায়ী – কক্সাই, মাইকোব্যাকটেরিয়া, এক্টিনোমাইসিস, স্পেরবাহী ব্যাকটেরিয়া, বেসিলাই, পাস্তুরেলা ইত্যাদি।

ভাইরাস

ভাইরাস – এমন একটি শব্দ যা আমাদের সবার কাছেই চেনা। কখনও ঠান্ডা লাগে, কখনও ডেঙ্গু জ্বর, কখনও আবার করোনা – ভাইরাসই এসব রোগের জন্য দায়ী। ভাইরাস হলো অত্যন্ত ক্ষুদ্র, জীবন্ত নয় এমন কণিকা। এরা এতই ক্ষুদ্র যে মানুষের চোখে দেখা যায় না। নিজে থেকে বাঁচতে বা বংশবৃদ্ধি করতে পারে না। কিন্তু কোনো প্রাণীর কোষের ভিতরে ঢুকে পড়ে সেই কোষের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে নেয়। নিজের কপি তৈরি করে, সেই কোষকে ধ্বংস করে ফেলে। আর এইভাবেই রোগ ছড়িয়ে পড়ে।

তবে সব ভাইরাসই খারাপ না। কিছু ভাইরাস আমাদের উপকারও করে। যেমন, কিছু ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে, আবার কিছু ভাইরাস জিন থেরাপিতে ব্যবহৃত হয়।

ভাইরাসবাহিত জুনোটিক রোগ: বার্ড ফ্লু, এন্ড্রাক্স, রেবিস, করোনা ইত্যাদি।

রিকেটশিয়া

রিকেটসিয়া হলো এক ধরণের ব্যাকটেরিয়া, যা এতটাই ছোট যে সাধারণ আলোক মাইক্রোস্কোপেও দেখা যায় না। এরা মাকড়সা, টিক, এবং উকুনদের মতো রক্তচোষা প্রাণির দেহে বাস করে। যখন এগুলো কোনো প্রাণিকে কামড়ায়, তখন রিকেটসিয়া রক্তের সাথে প্রাণির দেহে ঢুকে পড়ে এবং বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি করে। বাংলাদেশে রিকেটসিয়া দ্বারা সৃষ্ট কিছু সাধারণ রোগ হলো: স্কাব টাইফাস, মিউরিন টাইফাস, মার্সিলিজ ডিজিজ ইত্যাদি।

পরজীবী (Parasite)

পরজীবী হলো এমন এক জীব, যা আজীবন বা জীবনের কোনো নির্দিষ্ট সময় অন্য জীবের (আশ্রয়দাতা) দেহের ভিতরে বা বাইরে বাস করে এবং তার খাদ্য ও পুষ্টি গ্রহণ করে। এই আশ্রয়দাতার ক্ষতি করেই তারা বেঁচে থাকে। পরজীবীরা বিভিন্ন রকমের হতে পারে, যেমন— জিয়ার্ডিয়া (ডায়েরিয়া সৃষ্টিকারী), পিনবর্ম (আন্ত্রপরজীবী), উকুন, মশা (বহিঃপরজীবী)।

বন্যপ্রাণীদের রোগের প্রতিকারের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। এর মধ্যে কয়েকটি হল:

- টিকা: টিকা দেওয়ার মাধ্যমে অনেক রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব।
- রোগাক্রান্ত প্রাণীদের আলাদা করা: রোগাক্রান্ত প্রাণীদের সুস্থ প্রাণীদের থেকে আলাদা করে রাখা গুরুত্বপূর্ণ।
- পরিবেশের উন্নয়ন: বন্যপ্রাণীদের জন্য একটি স্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি করা গুরুত্বপূর্ণ।
- জনসচেতনতা বৃদ্ধি: বন্যপ্রাণীদের রোগ সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা গুরুত্বপূর্ণ। বন্যপ্রাণীদের রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সরকার, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, এবং জনগণের একসাথে কাজ করা গুরুত্বপূর্ণ।
- বন্যপ্রাণীদের রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য আমরা যা করতে পারি তা হলো:
- বন্যপ্রাণী না খাওয়া
- তাদের সংস্পর্শ না আসা
- বন্যপ্রাণীদের আবাসস্থল নষ্ট না করা
- বন্যপ্রাণীদের রোগ সম্পর্কে সচেতন থাকা এবং রোগাক্রান্ত প্রাণী চোখে পড়লে কর্তৃপক্ষকে জানানো।
- বন্যপ্রাণীদের রোগ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করার জন্য সরকার এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে সমর্থন ও সহায়তা করা।

বন্যপ্রাণীরা আমাদের পরিবেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাদের রোগ হলে তারা যেমন বিলুপ্তির ঝুঁকিতে পড়ে যেতে পারে, আবার তাদের থেকে মানুষের মধ্যেও বিভিন্ন রোগ মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং মানবজাতির অস্তিত্বও হুমকির মুখে পড়ে যেতে পারে। তাই বন্যপ্রাণীদের বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষা করা আমাদের সকলের দায়িত্ব।

3.4 বিশেষ টপিক

3.4.1 আগ্রাসী বিদেশী প্রজাতি

কোনো প্রজাতি নিজ অঞ্চল ছেড়ে অন্যকোনো অঞ্চলে গিয়ে অনিয়ন্ত্রিতভাবে বংশবিস্তার করলে এবং সে অঞ্চলের পরিবেশ এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের ক্ষতি করলে তাকে **আগ্রাসী প্রজাতি (Invasive species)** বলা হয়। যেমন- কচুরিপানা বাইরে থেকে সৌন্দর্যবর্ধনের জন্যে নিয়ে আসা হলেও বর্তমানে তা সংখ্যাবৃদ্ধি করে দেশের বেশিরভাগ জলাধারে ছড়িয়ে গিয়েছে এবং জলজ উদ্ভিদ এবং প্রাণীদের ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এছাড়াও, আফ্রিকান মাগুর আগ্রাসী প্রজাতির আরেকটি উদাহরণ। এর উপস্থিতির কারণে জলাশয়গুলোতে ছোট মাছগুলো টিকে থাকতে পারছে না।

3.4.2 পরিযায়ন

ঋতু পরিবর্তন, খাদ্য স্বল্পতা, প্রজনন কিংবা বংশানুক্রমিক ধারার ফলে কোনো প্রজাতি নিজ অঞ্চল থেকে দূরবর্তী কোনো অঞ্চলে গমন করাকে পরিযায়ন বলা হয়। সবচেয়ে পরিচিত পরিযায়নের উদাহরণ হলো পাখির

পরিযায়ন। শীতকালে আমরা অসংখ্য পরিযায়ী পাখি দেখি যারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ঋতু পরিবর্তন কিংবা খাদ্য স্বল্পতার জন্য বাংলাদেশে আসে।

3.4.3 বিবর্তন

প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে জীবের গাঠনিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের যে ক্রমপরিবর্তন ঘটে, তাকে বিবর্তন বলে। জিনের মিউটেশনের মাধ্যমে জীবের নির্দিষ্ট কোনো বংশধরে নতুন বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব হতে পারে বা পুরনো বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটতে পারে। তবে একটি প্রজন্মে জীবের বৈশিষ্ট্যের যে পরিবর্তন সাধিত হয়, তা খুবই সামান্য। কিন্তু দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলে, অনেকগুলো প্রজন্ম পরে জীবগোষ্ঠীতে সেই পরিবর্তন উল্লেখযোগ্য হয়ে দেখা দেয়। এমনকি এভাবে একসময় নতুন প্রজাতিও উদ্ভব হয়ে যেতে পারে।

বিবর্তনের ভিত্তি হচ্ছে বংশপরম্পরায় জিনের সঞ্চারণ। এই জিনগুলোর বিভিন্নতার কারণে একটি জীবগোষ্ঠীর বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে বংশগত বৈশিষ্ট্যে পার্থক্য বা প্রকরণ সৃষ্টি হয়। নতুন প্রকরণ উৎপন্ন হয় দুটি প্রধান উপায়ে : ১. জিনগত মিউটেশন বা পরিব্যক্তির মাধ্যমে এবং ২. বিভিন্ন জীবগোষ্ঠী বা প্রজাতির মধ্যে জিনের স্থানান্তরের মাধ্যমে।

দুটি প্রধান মেকানিজম নির্ধারণ করে কোনো প্রজাতির একটি নির্দিষ্ট প্রকরণের সংখ্যা বাড়বে কিনা। প্রথমত, প্রাকৃতিক নির্বাচন। প্রাকৃতিকভাবে একটি জীবগোষ্ঠীর অস্তিত্বের জন্য অনুকূল বৈশিষ্ট্যের অধিকারী সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি পায় ও কালক্রমে তা পুরো জীবগোষ্ঠীর সাধারণ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। আবার ক্ষতিকর বা কম সুবিধাদায়ক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সদস্যসংখ্যা হ্রাস পায়, ফলে সেই প্রকরণগুলো ধীরে ধীরে বিরল হয়ে যায়। একেই প্রাকৃতিক নির্বাচন বলে। চার্লস ডারউইন ও আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস পৃথকভাবে প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। তবে ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে বিবর্তনের জনক চার্লস ডারউইন রচিত ‘অন দ্য অরিজিন অব স্পিসিস’ বইটি প্রকাশিত হলে প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব বিজ্ঞানীমহলে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। বিবর্তনের আরেকটি মেকানিজম হচ্ছে জেনেটিক ড্রিফট।

3.4.4 জৈবিক উপায়ে বালাই দমন

পরিবেশকে দূষণমুক্ত রেখেও বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে ফসলের ক্ষতিকারক পোকা ও রোগ বালাইকে দমন করা যায়।

উপকারী পোকামাকড় ও প্রাণী সংরক্ষণ, বালাই সহনশীল জাত ও যান্ত্রিক দমন পদ্ধতি ব্যবহার করে তা করা হয়।

উপকারী পোকামাকড় ও প্রাণী সংরক্ষণ: ব্যাঙ, চিল, পেঁচা, গুঁইসাপ, মাকড়সা, গুবড়ে পোকা, বোলতা, ফড়িং প্রভৃতি উপকারী পোকামাকড় ও অন্যান্য প্রাণী ক্ষতিকারক পোকা দমনে যথেষ্ট সাহায্য করে। তাই উপকারী পোকামাকড়ের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া যায়, যেমন: ধান ক্ষেতের আইলে শিম ও শসা জাতীয় ফসল আবাদ করা, জমিতে পরিমিত পরিমাণ পানি রাখা, ফসল কাটার পর আইলে কিছু খরকুটা বিছিয়ে দেওয়া, জমিতে বাঁশের বুট্টার স্থাপনের মাধ্যমে বোলতা প্রতিপালন করা, বালাইনাশকের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার পরিহার করা ইত্যাদি।

বালাই সহনশীল জাতের চাষাবাদ: এর মাধ্যমে ক্ষতিকারক পোকামাকড় ও রোগের আক্রমণ অনেকাংশে রোধ করতে পারা যায়। যেমন -বি আর ২৬ জাতটি সাদা-পিঠ গাছ ফড়িং ও ব্লাস্ট রোগ প্রতিরোধশীল, ব্রি ধান ২৭ জাতটি সাদা পিঠ গাছ ফড়িং এর আক্রমণে প্রতিরোধশীল এবং ব্রি ধান ৩১ জাতটি বাদামি গাছ ফড়িং পোকাকার আক্রমণে প্রতিরোধশীল এবং পাতা পোড়া ও টুংরো রোগে মধ্যম প্রতিরোধশীল।

যান্ত্রিক দমন পদ্ধতি: এভাবেও বালাই দমন করা যায়, যেমন: হাত জালের সাহায্যে পোকা ধরে মারা, আলোর ফাঁদে পোকা ধরা, আক্রান্ত পাতার আগা কেটে দেওয়া, পাখি বসার জন্য ডাল পুঁতা ইত্যাদি।

উপরিষ্কারিত পদ্ধতিগুলোর সাহায্যেও যদি ক্ষতিকারক পোকা- মাকড় ও রোগের আক্রমণ দমিয়ে রাখা সম্ভব না হয় এবং অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়, কেবল তখনই বালাইনাশক সঠিকভাবে ব্যবহার করা উচিত। অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারে বিভিন্ন উপকারী প্রাণী ও বন্যপ্রাণির জীবন হুমকির মুখে পড়বে।

পরিবেশ রক্ষার্থে পরিবেশের উপাদান এবং এদের মাঝে পারস্পারিক সম্পর্ক বোঝা জরুরি। মানবসভ্যতার উন্নয়নের সাথে সাথে পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে নানানভাবে। এর মাঝে সবচেয়ে আশঙ্কাজনক হলো বন্যপ্রাণির বিলুপ্তি। বন্যপ্রাণি সংরক্ষণ করা বাস্তবতন্ত্র এবং পরিবেশের জন্য দরকারি। তাই বন্যপ্রাণির জীবনতত্ত্ব এবং বাস্তুতন্ত্রে এদের আস্তঃসম্পর্কগুলো সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে হবে। এদের সংরক্ষণের উদ্যোগ নিতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ দূষণ রোধ করে একটি সুস্থ পৃথিবী গড়ে তোলার জন্য সকলের নিজ নিজ অবস্থান থেকে সচেতন হতে হবে।

3.4.5 বন্যপ্রাণী উদ্ধার ও পরিবহনে সতর্কতা

অনেক সময়েই তোমার ঘরে কোনো বন্যপ্রাণী যেমন সাপ, বাদুড় ইত্যাদি ভুলবশত ঢুকে পড়তে পারে। যেহেতু সাপটি বিষাক্ত হতে পারে, এবং অন্যান্য বন্যপ্রাণির কামড়েও বিভিন্ন রোগে তুমি আক্রান্ত হয়ে পড়তে পারো, সেহেতু তোমার উচিত নয় ঐ বন্যপ্রাণিটি ধরতে যাওয়া। আবার একে পিটিয়ে মেরে ফেলাও উচিত নয়। কারণ সেতো কারোর ক্ষতি করেনি। সে শুধুমাত্র ভুল করে এখানে চলে এসেছে। তাই তাকে উদ্ধার করে তার আবাসস্থলে ছেড়ে দিয়ে আসাই সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত সমাধান। এসকল পরিস্থিতিতে বন্যপ্রাণী ধরে তাকে পরিবহন করে নিয়ে যেয়ে বন্য পরিবেশে ছেড়ে দেওয়ার জন্য উপযুক্ত মানুষ রয়েছে বনবিভাগে। এজন্য তোমাদের সকলের উচিত এরকম পরিস্থিতিতে স্থানীয় বনবিভাগকে খবর দেওয়া। তারা এসে বন্যপ্রাণিটিকে উদ্ধার করে বুন্দো পরিবেশে ছেড়ে দিয়ে আসবে। আবার অনেক সময় কোনো বন্যপ্রাণী আহত হয়ে পড়ে থাকতে পারে। অনেকসময় দেখা যায়, বানর বা বিভিন্ন পাখি বৈদ্যুতিক তারে শক খেয়ে আহত হয়ে পড়ে আছে। তাদেরকে তখন উদ্ধার নিকটস্থ পশু হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে এবং বনবিভাগকে খবর দিতে হবে। তারাই তার চিকিৎসা ও পুনর্বাসন এবং বন্য পরিবেশে মুক্তির ব্যবস্থা

করবে।

CHAPTER 4

বাংলাদেশের সামুদ্রিক অঞ্চল

বঙ্গোপসাগর

বঙ্গোপসাগর বাংলাদেশের একমাত্র সমুদ্র। বঙ্গোপসাগরের আয়তন ২১,৭২,০০০ বর্গ কি.মি.। একাধিক বড় নদী এই উপসাগরে এসে মিশেছে। এটি বাংলাদেশের দক্ষিণে অবস্থিত। সমুদ্র আইনবিষয়ক আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল (ইটলস) জানিয়েছে, বঙ্গোপসাগরে ২০০ নটিক্যাল মাইল (১ লাখ ১১ হাজার বর্গ কিলোমিটার) বাংলাদেশের অর্থনৈতিক এলাকা ও সার্বভৌম অধিকারের অঞ্চল হিসেবে বিবেচিত হবে।

মোহনা অঞ্চল

মোহনা সাধারণত সেখানে সৃষ্টি হয় যেখানে লবণাক্ত পানি এবং বিশুদ্ধ পানির উৎসের মধ্যে লবণাক্ততার একটি লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটে। এটি সাধারণত যেখানে নদী সমুদ্রের সাথে মিলিত হয় সেখানে পাওয়া যায়। সাধারণত সব মোহনাই প্রচলিত ব্র্যাকিশ মোহনার মতো বৈশিষ্ট্যযুক্ত। গ্রেট হুদ এর একটি প্রধান উদাহরণ, সেখানে নদীর জল হুদের জলের সাথে মিশে মিঠা পানির মোহনা তৈরি করে। মোহনাগুলো অত্যন্ত উৎপাদনশীল বাস্তুসংস্থান যার উপর অনেক মানষু এবং প্রাণিজ প্রজাতি বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের জন্য নির্ভরশীল।

অগভীর মহিসোপান

মহিসোপান বলতে বাংলাদেশের সেই ভূভাগ বোঝায় যা বঙ্গোপসাগরের পানিতে নিমজ্জিত অবস্থায় রয়েছে। এই মহিসোপান বাংলাদেশের সমুদ্র সীমার মধ্যে অবস্থিত। তবে আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা মহিসোপান বিস্তৃতি বা আয়তন নিরূপিত হয়ে থাকে। মহাদেশীয় ভূভাগের জলনিমজ্জিত নিকটবর্তী এলাকাকেও মহিসোপান বলা হয়ে থাকে। ভূগোলের ভাষায় সমুদ্র তীরবর্তী দেশের সাগরের দিকে পানির নিচে যে ভূখণ্ড ধীরে ধীরে ঢালু হয়ে নেমে যায় সেটাই মহিসোপান। মহিসোপানকে সংশ্লিষ্ট দেশের বর্ধিত অংশ বলে ধরা হয়ে থাকে। বাংলাদেশের উপকূলভাগের মহিসোপানের বিস্তার স্থানবিশেষে বিভিন্ন।

যেমন বাংলাদেশের দক্ষিণ উপকূলভাগে হিরণ পয়েন্ট ও সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ডের মধ্যে এর বিস্তার ১০০ কিলোমিটারের কম। অন্যদিকে কক্সবাজার উপকূলে মহিসোপানের বিস্তার ২৫০ কিলোমিটারের অধিক। কোনো দেশের ভূভাগ থেকে সাগরের প্রথম ১২ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত ঐ দেশের সার্বভৌম সামুদ্রিক অঞ্চল হিসেবে পরিগণিত। এর পরবর্তী ২০০ নটিক্যাল মাইল জুড়ে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল যার পরে ৩০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত হয় মহিসোপান। মহিসোপান এলাকার সামুদ্রিক সম্পদের মালিক সংশ্লিষ্ট দেশ। তবে এ এলাকায় যে কোনো দেশের জলযান চলাচল করতে পারে।

২০১৪ সালে আন্তর্জাতিক আদালত স্থায়ী সালিশ আদালত-এর সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে ভারত ও মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা নির্ধারিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ উপকূলবর্তী এক লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকির্গ লোমিটার সমুদ্র অঞ্চল, ২০০ নটিক্যাল মাইলের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং চট্টগ্রাম

উপকূল থেকে ৩৫৪ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত মহিসোপান। অবস্থিত সব ধরনের প্রাণিজ ও অপ্রাণিজ সম্পদের ওপর মালিকানা লাভ করে।

গভীর সমুদ্র

বঙ্গোপসাগর হল বিশ্বের বৃহত্তম উপসাগর। এটি ভারত মহাসাগরের উত্তর অংশে অবস্থিত একটি প্রায় ত্রিভুজাকৃতি উপসাগর। এই উপসাগরের পশ্চিম দিকে রয়েছে ভারত ও শ্রীলঙ্কা, উত্তর দিকে রয়েছে ভারত ও বাংলাদেশ এবং পূর্ব দিকে রয়েছে মিয়ানমার ও থাইল্যান্ড। বঙ্গোপসাগরের ঠিক মাঝখানে বিরাজ করছে ভারতের অধিভুক্ত আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। বঙ্গোপসাগরের গভীর সমুদ্রের কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল:

সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য:

বঙ্গোপসাগর একটি সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য অঞ্চল। এখানে বিভিন্ন প্রজাতির সামুদ্রিক প্রাণী বাস করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল:

সাগর সাপ: কেরিলিয়া জর্দোনি হল বঙ্গোপসাগরের একটি বিরল প্রজাতির সাগর সাপ। এটি বিষধর এবং মানুষের জন্য বিপজ্জনক।

সমুদ্র শৈল: গ্লোরি অফ বেঙ্গল শঙ্কু *Conus bengalensis* হল একটি বিষাক্ত সমুদ্র শৈল। এটি দেখতে সুন্দর হলেও এটি বিষধর।

সমুদ্র কচ্ছপ: জলপাই রাইডলি সমুদ্র কচ্ছপ একটি বিপন্ন প্রজাতি। এটি ভারতের ওড়িশার গহিরমাথা সমুদ্র সৈকতে বাসা বাঁধে।

মাছ: বঙ্গোপসাগরে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মার্লিন, ব্যারাকুডা, স্কিপজ্যাক টুনা, ইয়েলোফিন টুনা, ইন্দো-প্যাসিফিক হ্যাম্পব্যাকড ডলফিন এবং ব্রাইডের তিমি।

অন্যান্য প্রাণী: বঙ্গোপসাগরে অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে রয়েছে বঙ্গোপসাগর হোগফিশ, ডলফিন, টুনা, ইরাবাদি ডলফিন, লবণাক্ত জলের কুমির, দৈত্য চিংড়ি ইত্যাদি।

গ্রেট নিকোবর বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ: গ্রেট নিকোবর বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ একটি গুরুত্বপূর্ণ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা। এটি ভারতের অন্তর্গত একটি দ্বীপপুঞ্জ। এখানে বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী বাস করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল:

লবণাক্ত জলের কুমির: গ্রেট নিকোবর বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ লবণাক্ত জলের কুমিরের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রজনন কেন্দ্র।

দৈত্য চিংড়ি: গ্রেট নিকোবর বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ দৈত্য চিংড়ির জন্যও একটি গুরুত্বপূর্ণ আবাসস্থল।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্ব

অর্থনৈতিক গুরুত্ব:

বঙ্গোপসাগরের গভীর সমুদ্র অঞ্চলটি অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এখানে তেল, গ্যাস এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। এই সম্পদগুলির অনুসন্ধান ও উত্তোলন বর্তমানে চলছে। এছাড়াও, বঙ্গোপসাগরের গভীর সমুদ্রে বিভিন্ন খনিজ পদার্থ, যেমন- লোহা, অ্যালুমিনিয়াম, তামা, সোনা ইত্যাদি পাওয়া যায়। বঙ্গোপসাগরের গভীর সমুদ্র অঞ্চলটিতে সামুদ্রিক সম্পদেরও যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। এখানে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ, সামুদ্রিক প্রাণী, উদ্ভিদ এবং শৈবাল রয়েছে। এই সম্পদগুলির আহরণ ও ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব।

বঙ্গোপসাগরের গভীর সমুদ্রের পরিবেশগত গুরুত্ব:

বঙ্গোপসাগরের গভীর সমুদ্র অঞ্চলটি পরিবেশগতভাবেও গুরুত্বপূর্ণ। বঙ্গোপসাগরের গভীর সমুদ্র অঞ্চলটিতে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক পরিবেশ রয়েছে। এখানে তীব্র চাপ, নিম্ন তাপমাত্রা এবং অন্ধকারের মতো চ্যালেঞ্জিং পরিবেশ রয়েছে। এই পরিবেশ গুলোর ভারসাম্য রক্ষায় গভীরে থাকা বিভিন্ন প্রজাতির মাছ, সামুদ্রিক প্রাণী, উদ্ভিদ এবং শৈবাল সহ নানা জীববৈচিত্র্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই পরিবেশে বসবাসকারী প্রাণীগুলি অভিযোজন করে এই চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলা করে।

বঙ্গোপসাগরের গভীর সমুদ্রের ভবিষ্যতঃ বঙ্গোপসাগরের গভীর সমুদ্র অঞ্চলটি একটি সম্ভাবনাময় অঞ্চল। এখানে তেল, গ্যাস, খনিজ পদার্থ এবং সামুদ্রিক সম্পদের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। এই সম্পদগুলির আহরণ ও ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব।



সিলেট জেলাজুড়ে অবস্থিত বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ হাওরটি হলো হাকালুকি হাওর, যার আয়তন ১৮,১১৫ হেক্টর। এর মধ্যে কেবল বিলের আয়তনই ৪,৪০০ হেক্টর। এ হাওরের মূল প্রবাহ হলো জুরী ও পানাই নদী যা হাওরের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত কুশিয়ারা নদী দিয়ে প্রবাহিত হয়। হাকালুকি হাওর মূলত সোয়াম্প ফরেস্ট বা জলময় নিম্নভূমির বনাঞ্চল। এখানের জলাভূমিবেষ্টিত এলাকা পাখিদের বাসস্থান। হাকালুকি হাওরে ছোট-বড়-মাঝারি মিলিয়ে মোট ২৩৮ টি বিল আছে। এ জলাভূমিটি অতিথি পাখিদের জন্য শীতকালীন স্বর্গ হিসেবে বিবেচিত। বাংলাদেশের প্রধান ৪টি ‘মাদার ফিশারিজ’ এর মধ্যে হাকালুকি হাওর একটি।

জীববৈচিত্র্যের পটভূমি :

হাকালুকি হাওরে রয়েছে ১২০ প্রজাতির জলজ উদ্ভিদসহ হিজল, করচ, বরুণ, বনতুলসী, নলখাগড়া, পানিফল, হেলেঞ্চা, বল্লুয়া, চাল্লিয়া প্রভৃতি প্রজাতির বিরল উদ্ভিদ। এছাড়া ১৫০ প্রজাতির মিঠাপানির মাছ, ২০ প্রজাতির সরীসৃপ, ভোঁদড়, মেছোবাঘ, শিয়ালসহ কিছু প্রজাতির স্তন্যপায়ী, নানাধরণের কীটপতঙ্গ এবং জলজ ও স্থলজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুজীব।

বৈশ্বিক গুরুত্ব :

হাকালুকি হাওরে মূলত হাঁস প্রজাতির জলচর প্রাণীরাই পরিযায়ী পাখি হিসেবে আসে। এ হাওরে বিশ্বজুড়ে মহাবিপদাপন্ন হিসেবে চিহ্নিত বেয়ারের-ভূতিহাঁস, বিপদাপন্ন পালাসি-কুরাঈগল এবং সংকটাপন্ন পাতি-ভূতিহাঁস, প্রায়-হুমকিগ্রস্ত মরচেং-ভূতিহাঁস ও ফুলুরি-হাঁস ইত্যাদি অতিথি পাখির দেখা মিলে। মানুষের এই হাওরের প্রকৃতিক সম্পদ অতিরিক্ত ব্যবহারের জন্য ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশ সরকার হাকালুকি হাওরকে ‘Ecologically Critical Area’ (ECA) হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

হুমকিসমূহ :

সঠিক পরিকল্পনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এর অভাবে প্রায়ই এই হাওরের বনভূমির গাছপালা কেটে ফেলে এই স্থানের জীববৈচিত্র্য ধ্বংস করে ফেলা হচ্ছে। হাওরের পানিতে বেড়ে গেছে অ্যামোনিয়ার পরিমাণ, যার কারণে মারা যাচ্ছে অনেক মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী। অনেক অসাধু মানুষ শীতকালে এসে মাত্রারিতিক্ত পরিমাণের অতিথি পাখি শিকার করে যার জন্য এখন এখানে অতিথি পাখির বিচরণও কমে গেছে অনেক।

মহাবিপদাপন্ন প্রাণী : বেয়ারের-ভূতিহাঁস

বিপদাপন্ন প্রাণী : কালামাথা-কাস্তেচরা, পালাসি-কুরাঈগল



তোমরা নিশ্চই কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত কিংবা সাগরকন্যা কুয়াকাটায় ভ্রমণে গিয়েছো? কুয়াকাটা বা কক্সবাজার থেকে যে সমুদ্র আমরা দেখি, তার নাম বঙ্গোপসাগর। তবে শুধু কুয়াকাটা বা কক্সবাজার নয়, সাতক্ষীরা জেলার হরিণটানা নদীর মোহনা থেকে আরম্ভ করে পূর্বাংশের কক্সবাজার পর্যন্ত পুরোটাই আসলে শেষ হয়েছে বঙ্গোপসাগরে। এই বিস্তৃত তটরেখাই আসলে বাংলাদেশের উপকূল, যার ব্যাপ্তি প্রায় ৭১০ কিলোমিটার। সাধারণত স্থলভূমি এবং সাগরের সংযোগ এলাকাকে উপকূল শুরু হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এ অঞ্চলের রয়েছে ভোলা, বরিশাল, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, পটুয়াখালী, বরগুনা, সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার নিয়ে মোট ১৪ টি জেলা; এছাড়া রয়েছে প্রবাল প্রাচীরের দ্বীপ সেন্ট মার্টিন। হাজার বছরের নদীবাহিত পলিমাটি দিয়ে গড়ে উঠা আমাদের দেশের এই উপকূলীয় বনাঞ্চল ও বন্যপ্রাণী নিয়েই এ লেখা।

আমাদের সুন্দরবন

সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাট জেলার উপকূল জুড়ে প্রায় ৬ লক্ষ ১ হাজার ৭০০ হেক্টর অঞ্চলে রয়েছে প্রাকৃতিক বাদাবন বা সুন্দরবন। তোমরা অনেকেই জানো সুন্দরবনকে ম্যানগ্রোভ বন বলা হয়। আর ম্যানগ্রোভ শব্দটি পর্তুগিজ 'Mangue' যার অর্থ স্বতন্ত্র গাছ ও ইংরেজি 'grove' এর অর্থ ঘোপ বা ঝাড়- এই দুটি শব্দ থেকে এসেছে। পৃথিবীর একক বৃহত্তম প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন হচ্ছে আমাদের এই সুন্দরবন। ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কমিটি ১৯৯৭ সালের ৬ ডিসেম্বর সুন্দরবনকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট বা বিশ্ব সম্পদ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। যদি কখনো সুন্দরবনের হিরণ পয়েন্ট সংলগ্ন নীলকমলে যাও, তাহলে দেখতে পাবে বিশ্ব ঐতিহ্যের একটি ফলক সেখানে উন্মোচন করা হয়েছে।

সুন্দরবনে এ অঞ্চলের মাটিতে সালফার ও নাইট্রোজেনের পরিমাণ বেশি যা ম্যানগ্রোভ প্রজাতির জন্য বিশেষ সহায়ক। এখানকার মাটি লবণাক্ত বিধায় এর ভেতরে অক্সিজেনের অভাব থাকে তাই অনেক দিকের স্বাভাবিক মূল ছাড়াও মাটির উপরে অসংখ্য শ্বাসমূল তৈরি হয়, যা এই বনের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। অনেক বৃক্ষের ফল গাছে থাকতেই বীজের অঙ্কুরোদগম ঘটে। একে জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম বলে। বীজ যথেষ্ট বড় ও ভারী হলে হাটার সময় কাদামাটির মধ্যে খাড়াভাবে পড়ে গেছে যায়। সুন্দরী, গরান, কাকড়া প্রকৃতি গাছে এ ধরনের অঙ্কুরোদগম দেখা যায়। মাটি নরম বলে অনেক গাছের ঠেসমূল হয়, যেমন- কেয়া গাছ।

এ বনের উল্লেখযোগ্য বন্যপ্রাণী হচ্ছে রয়েল বেঙ্গল টাইগার, হরিণ, বানর, শূকর, কুমির, অজগর ইত্যাদি। তবে সুন্দরবনের তিন প্রজাতির উভচর, ১৪ প্রজাতির পাখি এবং ৫ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী প্রায় বিলুপ্ত হয়েছে। এ বনের বিলুপ্ত প্রাণীরা হলো- ছোট প্রজাতির এক শৃঙ্গি গন্ডার, বুনা মহিষ, মার্বেল বিড়াল, বড় মদনটাক, বেঙ্গল ফ্লোরিক্যান, রাজ শকুন, ময়ূর প্রভৃতি। রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিত্রল হরিণ, কুমির সুন্দরবনের ঐতিহ্য। মাছের মধ্যে রয়েছে ইলিশ, ভেটকি, টেংরা, পারসে, দাতিনা, মেদ, পাঙ্গাস, ভাঙান, চিত্রা ইত্যাদি। গলদা, বাগদা, চাকা, হরিণা প্রভৃতি এ এলাকার উল্লেখযোগ্য চিংড়ি। ১৯৫০

সালে সর্বপ্রথম সাতক্ষীরা জেলায় চিংড়ি চাষ শুরু হয়। ষাট এর দশক থেকে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে জোয়ারের পানি বাধ দিয়ে আটকে রেখে পানির সঙ্গে আসা চিংড়ি ও মাছের কণাকে তিন চার মাস লালন পালন করে তা আহরণ করা হয়। পরবর্তীকালে বিশ্ববাজারে চিংড়ির চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে দেশে চিংড়ি চাষের বিস্তৃতি ও বাধ দিয়ে অপরিকল্পিতভাবে চিংড়ি চাষ করা হচ্ছে। স্থানীয়ভাবে একে চিংড়ি ঘের বলা হয়। চিংড়ি উৎপাদনে ধানের চেয়ে প্রায় ১০ গুন বেশি আয় হয়। ফলে দিন দিন মাটিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধির কারণে ধানের জমি কমছে এবং যে সকল জমিতে ধান ও চিংড়ি দুটো উৎপাদন হওয়ার কথা সেখানে ধানের উৎপাদনের পরিমাণ ও মান কমছে।

উপকূলীয় বনাঞ্চল

বাংলাদেশে বিশ্ব সর্বপ্রথম উপকূলীয় চরাঞ্চলে সফল বনায়নকারী দেশ। বাংলাদেশের উপকূলীয় জেলাসমূহ – নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, ফেনী, ভোলা, পটুয়াখালী, বরগুনা, পিরোজপুর, চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার জেলায় জেগে উঠা চরাভূমিতে ১৯৬৫ সাল থেকে উপকূলীয় বন সৃজন করা হচ্ছে। এ বনকে প্যারাবনও বলা হয়। ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের তীব্রতা হতে উপকূলীয় এলাকার জন-মাল রক্ষা করে। এ বন জেগে ওঠা চরাভূমিকে স্থিতিশীল ও দৃঢ় করে কৃষিকাজ সহ অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজের জন্য উপযোগী করে তোলে। বাংলাদেশের উপকূলীয় চারটি এলাকার বর্ণনা এখানে দেয়া হলো:

সোনাদিয়া দ্বীপ

উপকূলীয় অঞ্চলে কক্সবাজারের মহেশখালী উপজেলার একটি অপূর্ব সুন্দর দ্বীপ সোনাদিয়া। বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্ব উপকূলীয় প্যারাবনের অবশিষ্টাংশ দেখা যায় সোনাদিয়া দ্বীপে। দ্বীপটির আয়তন ৭ বর্গ কিলোমিটার। দ্বীপটি কক্সবাজার জেলা সদর থেকে কিলোমিটার উত্তর পশ্চিমে এবং মহেশখালী দ্বীপের দক্ষিণে অবস্থিত। এর তিনদিকে রয়েছে সমুদ্র সৈকত। সাগর লতায় ঢাকা বালিয়াড়ি, কেয়া, নিশিন্দার বোপ, ছোট বড় খাল দিয়ে বিভক্ত প্যারাবন এবং বিচিত্র প্রজাতির জলচর পাখি দ্বীপটিকে করেছে অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। এই বিস্তীর্ণ প্যারাবনে রয়েছে সাদা বাইন, কালো বাইন, কেওড়া, হারগোজা নুনিয়াসহ প্রায় ২৭ প্রজাতির উদ্ভিদ। দ্বীপে ৭০ প্রজাতির জলজ ও উপকূলীয় অতিথি পাখির আগমন ঘটে। এখানে দেখা যায় পৃথিবীব্যাপী বিপন্ন তিন প্রজাতির পাখি- স্পুনবেল স্যান্ডপাইপার, এশিয়ান উইন্ডচার ও নরম্যানস গ্রীনশ্যানক। সোনাদিয়ার সৈকত এলাকা পৃথিবীব্যাপী বিপন্ন জলপাইরঙা কাছিমের ডিম পাড়ার আদর্শ স্থান। একসময় এ দ্বীপে সবুজ কাছিম এবং লগারহেড কাছিমেরও আনাগোনা ছিল।

সেন্ট মার্টিন'স দ্বীপ

বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণে অবস্থিত ভূমি সেন্ট মার্টিন দ্বীপ। টেকনাফ উপজেলার বদরমোকাম থেকে ১০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত টেকনাফ শহর থেকে জলপথে ৩৪ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত স্থানীয়ভাবে দ্বীপটি স্থানীয়ভাবে নারিকেল জিঞ্জিরা নামের পরিচিত। দ্বীপের প্রধান অংশ উত্তর পাড়া ও দক্ষিণপাড়া। এ দুয়ের মাঝখানে সংকীর্ণ অংশের নাম গলাচিপা। সর্ব দক্ষিণে ছেড়াদ্বীপ বা ছেড়াদিয়া নামের তিনটি ছোট ভূখন্ড রয়েছে। জোয়ারের সময় ছেড়া দ্বীপ মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। প্রচুর নারিকেল গাছের সারি, কেয়া-নিশিন্দার জঙ্গল, বালিয়াড়িতে সাগরলতার উপস্থিতি, আভ্যন্তরীণ জলাভূমি, বিস্তীর্ণ পাথর সমূহ, জোয়ার ভাটা অঞ্চল এবং স্বচ্ছ নীল জলরাশি দ্বীপের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

এখানকার পানি অধিক লবণাক্ত ও স্বচ্ছ হওয়ার কারণে বিচিত্র বর্ণের প্রবালের পাশাপাশি প্রবাল সংশ্লিষ্ট সামুদ্রিক শৈবাল মাছ ও অন্যান্য ও অমেরুদণ্ডী প্রাণীর আবাসস্থল এই সেন্ট মার্টিন দ্বীপ। ১৫০ প্রজাতির সামুদ্রিক শৈবাল, ১৫৭ প্রজাতির স্থলজ গুপ্তবীজ উদ্ভিদ, ৬৬ প্রজাতির পাখির প্রবাল, ১৮৭ প্রজাতির শামুক-ঝিনুক, ২১৮ প্রজাতির সামুদ্রিক মাছ, ৮৬ প্রজাতির প্রবাল, চার প্রজাতির উভচর, ১২০ প্রজাতির পাখি, উভচর ২৯ প্রজাতির সরীসৃপ এবং ১৯ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণীর তথ্য এই দ্বীপ থেকে রেকর্ড করা হয়েছে। বনাঞ্চল যেমন বন্যপ্রাণের আবাসস্থল প্রবালপ্রাচীর ও তেমনি সামুদ্রিক মাছের আশ্রয় ও খাবার যোগান দেয়।

পরিকল্পনার অভাবে হোটেল অবকাঠামো নির্মাণ এবং পর্যটকদের অনিয়ন্ত্রিত কার্যকলাপের ফলে বর্তমানে সেন্ট মার্টিন দ্বীপের প্রতিবেশ ব্যবস্থা মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। উপকূলীয় জীব বৈচিত্র্য তথা প্রাকৃতিক সম্পদকে রক্ষার জন্য ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশ সরকার প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সেন্ট মার্টিনকে 'প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা' হিসেবে ঘোষণা করে।

নিঝুম দ্বীপ

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে নোয়াখালী জেলার দক্ষিণ অংশে বঙ্গোপসাগরের মোহনায় গড়ে ওঠা কয়েকটি দ্বীপের সমষ্টি নিঝুম দ্বীপ। বাংলাদেশ বন বিভাগ নিঝুম দ্বীপে উপকূলীয় বনাঞ্চল গড়ে তুলেছে এবং ২০০১ সালে একে জাতীয় উদ্যান ঘোষণা করে। শীতকালে এ দ্বীপে লক্ষ লক্ষ জলচর ও পরিযায়ী পাখি দেখা যায়। এর মধ্যে রয়েছে নানান জাতের ছোট-বড় বুনোহাঁস, যেমন- উত্তরে ল্যাঙ্গা হাঁস, ইউরেশিয়া লালশির, দেশি মোট হাঁস, পিয়ং হাঁস, লাল ঝুটি গাংচিল, সিন্ধু ঈগল, মাছরাঙ্গা, বক ইত্যাদি। বৃক্ষরাজির মধ্যে সবচেয়ে বেশি রয়েছে কেওড়া। এই গাছ দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং এর সম্প্রসারিত মূল ভূমিক্ষয় রোধ করে। নিঝুম দ্বীপের অন্যতম আকর্ষণ হল হরিণের উপস্থিতি। এখানকার বন এলাকায় প্রায় ৫ হাজারের বেশি চিত্রা হরিণ রয়েছে।

কক্সবাজার

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে উপকূলীয় অঞ্চলে পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত- কক্সবাজার অবস্থিত। বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেঁষে কক্সবাজারের ঝিলংজা থেকে টেকনাফের বদরমোকাম পর্যন্ত প্রায় ১২০ কিলোমিটার বিস্তৃত বিলং এই সৈকত। এখানে প্রায় ২০০ প্রজাতির স্থানীয় পাখি এবং ৮১ এরও বেশি প্রজাতির পরিযায়ী পাখির বিচরণের তথ্য পাওয়া গিয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পৃথিবীব্যাপী হুমকির সম্মুখীন চার প্রজাতির পাখি- স্পুনবেল স্যান্ডপাইপার, এশিয়ান উইন্ডচার, নরডম্যানস গ্রীনশ্যানক ও লেজার অ্যাডজুটেন্ট। স্পুনবেল স্যান্ডপাইপার পৃথিবীর বিরলতম পাখির মধ্যে একটি। এই সৈকতে পাওয়া যায় বিচিত্র প্রজাতির শামুক ঝিনুক কাকড়া। কাকড়া তাছাড়াও এখানে বিপন্ন সবুজ কাছিম ও জলপাই রংয়ের কাছিম দেখা যায়। সৈকতসংলগ্ন পাহাড় ও বনাঞ্চলে ৯০ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী বসবাস

করে। এর মধ্যে হাতি, ভালুক, মেছো বাঘ, লামচিতা, বন্য কুকুর, শিয়াল, সোনালী বিড়াল উল্লেখযোগ্য। উপকূলবর্তী এলাকার জলসীমায় রয়েছে সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণী ডলফিন ও পরপইস। সৈকতে যেসব উদ্ভিদ সচরাচর পাওয়া যায় তার মধ্যে রয়েছে বাইন, ঝাউ, সাগরলতা, কাঠবাদাম, শেওড়া, ক্যাকটাস, নারিকেল, কেয়া, বেত ইত্যাদি। সৈকতের পাথর জোয়ার ভাটা অঞ্চলে দেখা যায় নানা ধরনের সামুদ্রিক শৈবাল।



ম্যানগ্রোভ বনের উদ্ভিদসমূহ

বাংলাদেশে ম্যানগ্রোভ বন রয়েছে, খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, পটুয়াখালী, চকোরিয়া সুন্দরবন এলাকায়। ম্যানগ্রোভ বনের উদ্ভিদ সাধারণত বৃক্ষ, বিরুৎ, গুল্ম প্রকৃতির হয়। এই গাছগুলো লোনাপানিতে বড় হয় এবং বেঁচে থাকতে পারে। তাই এদেরকে *Halophytes* বলা হয়। *Halophytes* এর বিশেষকিছু বৈশিষ্ট্যর জন্যে এরা উপকূলীয় লোনা পানিতে এবং স্বল্প অক্সিজেনসমৃদ্ধ মাটিতে বেড়ে উঠতে পারে। বিশেষ করে তাদের বিভিন্ন ধরনের অভিযোজিত মূল যেমন *Pneumatophores*, *Prop or stilt root*, *root buttresses* দেখা যায়।

বাংলাদেশের ম্যানগ্রোভ বনে ১০০টির ও বেশি উদ্ভিদ প্রজাতি দেখা যায়। এর মধ্যে ২৮টি সত্যিকারের ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ। ম্যানগ্রোভ বনে যেই উদ্ভিদপ্রজাতি দেখা যায় তার তালিকা:

- ১) সুন্দরী (*Heritiera fomes*)
- ২) কেওড়া (*Sonneratia sp.*)
- ৩) গেওয়া (*Excoecaria agallocha*)
- ৪) গোলপাতা (*Nypa fruticans*)
- ৫) কাকড়া (*Bruguiera sexangula*)
- ৬) ভোলা (*Hibiscus tiliaceus*)
- ৭) হাড়গোজা (*Acanthus ilicifolius*)
- ৮) হেতাল (*Phoenix paludosa*)
- ৯) গড়ান (*Ceriops decandra*)
- ১০) খলশী (*Aegiceras corniculatum*)
- ১১) পশুর (*Xylocarpus moluccensis*)
- ১২) বাইন (*Avicennia alba*)
- ১৩) গর্জন (*Rhizophora apiculata*)

ম্যানগ্রোভ বনের মাটির লবনাক্ততার উপর ভিত্তি করে তিনটি Zone এ ম্যানগ্রোভ বনকে ভাগ করা যায়। উক্ত Ecological zone সমূহের মাটির উপাদান সমূহ নিচে উল্লেখ করা হলো।

ম্যানগ্রোভ বনের মাটির লবনাক্ততার উপর ভিত্তি করে তিনটি Zone এ ম্যানগ্রোভ বনকে ভাগ করা যায়। উক্ত Ecological zone সমূহের মাটির উপাদান সমূহ নিচে উল্লেখ করা হলো।

| Ecological Zone | pH | Na (ug/L) |
|-----------------|-----|-----------|
| Oligohaline | 6.9 | 300-500 |
| Mesohaline | 7.0 | 575-800 |
| Polyhaline | 7.0 | 850-2000 |

উক্ত Ecological Zone এর মাটির লবনাক্ততার উপর ভিত্তি করে নানান উদ্ভিদ প্রজাতি ম্যানগ্রোভ বনে জন্মায়। যেমন:

| Oligohaline Zone | Mesohaline Zone | Polyhaline Zone |
|------------------|-----------------|-----------------|
| সুন্দরী | গেওয়া | গড়ান |
| গেওয়া | গোলপাতা | খলশী |
| ভোলা | কাঁকড়া | পশুর |
| বাইন | গর্জন | |
| কেওড়া | | |



বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার উত্তর-পশ্চিম ও মহেশখালী দ্বীপের দক্ষিণ থেকে ৭ কি.মি. দূরে নানাধরণের প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর সোনাদিয়া দ্বীপ অবস্থিত। এর আয়তন প্রায় ৪৯২৪ হেক্টর বা ৯ বর্গকিলোমিটার। প্রাকৃতিক ও রোপণকৃত প্যারাবনের এই দ্বীপটি সংরক্ষিত (ইকোলজিক্যালি ক্রিটিকাল এরিয়া)। এখানের প্যারাবন, কাঁদাচর ও জোয়ার-ভাটা বিধৌত এলাকায় পাখির আবাসস্থল।

জীববৈচিত্র্য :

সোনাদিয়া দ্বীপের উপকূলীয় প্যারাবন বা ম্যানগ্রোভ বনে রয়েছে বিরল প্রজাতির পুষ্পিত বাওনিয়া লতা, বহুবর্ষজীবী কাষ্ঠল লতা, কেওড়া, হারগোজা, উড়িঘাস, নারকেল, বাউ, নিসিন্দা, কেয়া ইত্যাদিসহ ১৫৮ প্রজাতির গাছপালা ও ১৩ প্রজাতির শ্বাসমূলের গাছ। এখানে দেখা যায় ১৯ প্রজাতির স্তন্যপায়ী, ৮ প্রজাতির সরীসৃপ, ৪ প্রজাতির উভচর, ৬১ প্রজাতির পাখি। এছাড়াও দ্বীপটির উপকূলে ১৯ প্রজাতির চিংড়ি, লবস্টার, লাল কাকড়া, ১৪ প্রজাতির শামুক, ঝিনুক, ডলফিন ও বিভিন্ন প্রজাতির কচ্ছপ দেখতে পাওয়া যায়।

বৈশ্বিক গুরুত্ব :

প্রতিবছর শীতকালের ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসে এই দ্বীপে তুন্ড্রা অঞ্চল থেকে প্রায় ২৫,০০০ পরিযায়ী পাখি আসে। এদের মধ্যে বিশ্বজুড়ে বিপন্নপ্রায় পাখি চামচুঁটো-বাটান অন্যতম। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও জীববৈচিত্র্যের সমারোহে ভরপুর এই দ্বীপকে সংরক্ষণ করার জন্য সরকার এই দ্বীপকে ১৯৯৯ সালে ইকোলজিক্যাল ক্রিটিকাল এরিয়া এবং ২০১১ সালে EAAFP Flyway Network Site হিসেবে ঘোষণা করে। এছাড়াও আন্তর্জাতিক পাখি সংরক্ষণ সংস্থা বার্ড লাইফ ইন্টারন্যাশনাল ২০১৩ সালে এই দ্বীপকে পাখির গুরুত্বপূর্ণ বিচরণক্ষেত্র Important Bird Area (IBA) হিসেবে ঘোষণা করে।

বর্তমান হুমকিসমূহ:

সোনাদিয়া দ্বীপে বসবাসকারী মানুষেরা শীতকালে অতিথি পাখি শিকার করে। যার ফলে, বিগত ৮ বছরে এই দ্বীপে অতিথি পাখির সংখ্যা কমেছে ব্যাপক হারে। এছাড়াও দ্বীপটি পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন স্থাপনা এবং চিংড়িঘর তৈরির জন্য মানুষ এখানের ম্যানগ্রোভ বনটি ধ্বংস করে ফেলছে। দ্বীপে হচ্ছে শব্দ দূষণ ও বায়ু দূষণ। এগুলোর ফলে দ্বীপের আসে-পাশের জলজপ্রাণীরা এবং জলজপাখিরা দ্বীপটি থেকে হারিয়ে যাচ্ছে।

মহাবিপন্ন প্রাণী : নডম্যান-সবুজপা, গুলিন্দা বাটান, পাতি-সবুজপা।

বিপদাপন্ন প্রাণী : বড়-নট, লাল-নট, এশীয় ডউচার, লাল-নুড়িবাটান, ইরাবতী ডলফিন।



নিঝুম দ্বীপ বাংলাদেশের একটি অন্যতম দ্বীপ যা নোয়াখালীর হাতিয়ায় গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা নদীর মোহনার মুখে অবস্থিত। এটি পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম নদী মোহনা। নিঝুম দ্বীপ বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন। এর আয়তন প্রায় ৩৬৯৭০.৪৫৪ হেক্টর, যার মধ্যে সংরক্ষিত এলাকার পরিমাণ ১৬৩৫২.২৩ হেক্টর। এখানকার কাঁদাচর ও জোয়ার-ভাটা বিধৌত এলাকায় পাখির আবাসস্থল।

জীববৈচিত্র্য :

নিঝুম দ্বীপ ১১টি চরের সমন্বয়ে গঠিত ম্যানগ্রোভ বন যার মধ্যে রয়েছে কেওড়া, গেওয়া, বাইনসহ আরও ২১ প্রজাতির বৃক্ষ ও ৪৩ প্রজাতির লতাগুল্ম। এখানে রয়েছে চিত্রা হরিণসহ ৭ প্রজাতির স্তন্যপায়ী এবং ১৬ প্রজাতির সরীসৃপ। স্থানীয়ভাবে বসবাস করা ৯৭ প্রজাতির পাখি ছাড়াও শীতকালে অনেক অতিথি পাখির বিচরণ দেখা যায় এই দ্বীপে। সমগ্র বাংলাদেশে অতিথি পাখির বিচরণের সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় ও সুন্দর দৃশ্য দেখা যায় এই দ্বীপে।

বৈশ্বিক গুরুত্ব :

নিঝুম দ্বীপকে সামুদ্রিক পাখির পরিযানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পথ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। প্রত্যেক বছর শীতকালে (ডিসেম্বর-ফেব্রুয়ারী) প্রায় ১০,০০০-২০,০০০ পাখি আসে যাদের মধ্যে কিছু বিরল ও বিপন্ন প্রজাতিও রয়েছে, পরিযানের জন্য এখানে আসে। পৃথিবী জুড়ে অতি বিপন্ন পাখি 'চামচুঁটো বাটান' এখানে পরিযানের জন্য আসে। সমগ্রবিশ্বে এই পাখির সংখ্যা মাত্র ২৪০-৪০০ টি। এই পাখিটির অন্যতম প্রজননক্ষেত্র এই দ্বীপ। এজন্য নিঝুম দ্বীপকে ২০১১ সালে EAAFP Flyway Network Site হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।
মহাবিপন্ন প্রাণী : নডম্যান – সবুজপা, দেশি-গাওঁচষা, গুলিন্দা-বাটান, পাতি-সবুজপা।

বাংলাদেশের সামুদ্রিক অঞ্চল

বঙ্গোপসাগর

বঙ্গোপসাগর বাংলাদেশের একমাত্র সমুদ্র। বঙ্গোপসাগরের আয়তন ২১,৭২,০০০ বর্গ কি.মি.। একাধিক বড় নদী এই উপসাগরে এসে মিশেছে। এটি বাংলাদেশের দক্ষিণে অবস্থিত। সমুদ্র আইনবিষয়ক আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল (ইটলস) জানিয়েছে, বঙ্গোপসাগরে ২০০ নটিক্যাল মাইল (১ লাখ ১১ হাজার বর্গ কিলোমিটার) বাংলাদেশের অর্থনৈতিক এলাকা ও সার্বভৌম অধিকারের অঞ্চল হিসেবে বিবেচিত হবে।

মোহনা অঞ্চল

মোহনা সাধারণত সেখানে সৃষ্টি হয় যেখানে লবণাক্ত পানি এবং বিশুদ্ধ পানির উৎসের মধ্যে লবণাক্ততার একটি লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটে। এটি সাধারণত যেখানে নদী সমুদ্রের সাথে মিলিত হয় সেখানে পাওয়া যায়। সাধারণত সব মোহনাই প্রচলিত ব্র্যাকিশ মোহনার মতো বৈশিষ্ট্যযুক্ত। গ্রেট হ্রদ এর একটি প্রধান উদাহরণ, সেখানে নদীর জল হ্রদের জলের সাথে মিশে মিঠা পানির মোহনা তৈরি করে। মোহনাগুলো অত্যন্ত উৎপাদনশীল বাস্তুসংস্থান যার উপর অনেক মানষু এবং প্রাণীজ প্রজাতি বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের জন্য নির্ভরশীল।

অগভীর মহিসোপান

মহিসোপান বলতে বাংলাদেশের সেই ভূভাগ বোঝায় যা বঙ্গোপসাগরের পানিতে নিমজ্জিত অবস্থায় রয়েছে। এই মহিসোপান বাংলাদেশের সমুদ্র সীমার মধ্যে অবস্থিত। তবে আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা মহিসোপান বিস্তৃতি বা আয়তন নিরূপিত হয়ে থাকে।

মহাদেশীয় ভূভাগের জলনিমজ্জিত নিকটবর্তী এলাকাকেও মহিসোপান বলা হয়ে থাকে। ভূগোলের ভাষায় সমুদ্র তীরবর্তী দেশের সাগরের দিকে পানির নিচে যে ভূখণ্ড ধীরে ধীরে ঢালু হয়ে নেমে যায় সেটাই মহিসোপান। মহিসোপানকে সংশ্লিষ্ট দেশের বর্ধিত অংশ বলে ধরা হয়ে থাকে। বাংলাদেশের উপকূলভাগের মহিসোপানের বিস্তার স্থানবিশেষে বিভিন্ন।

যেমন বাংলাদেশের দক্ষিণ উপকূলভাগে হিরণ পয়েন্ট ও সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ডের মধ্যে এর বিস্তার ১০০ কিলোমিটারের কম। অন্যদিকে কক্সবাজার উপকূলে মহিসোপানের বিস্তার ২৫০ কিলোমিটারের অধিক। কোনো দেশের ভূভাগ থেকে সাগরের প্রথম ১২ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত ঐ দেশের সার্বভৌম সামুদ্রিক অঞ্চল

হিসেবে পরিগণিত। এর পরবর্তী ২০০ নটিক্যাল মাইল জুড়ে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল যার পরে ৩০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত হয় মহিসোপান। মহিসোপান এলাকার সামুদ্রিক সম্পদের মালিক সংশ্লিষ্ট দেশ। তবে এ এলাকায় যে কোনো দেশের জলযান চলাচল করতে পারে।

২০১৪ সালে আন্তর্জাতিক আদালত স্থায়ী সালিশি আদালত-এর সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে ভারত ও মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা নির্ধারিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ উপকূলবর্তী এক লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকির্গ লোমিটার সমদ্র অঞ্চল, ২০০ নটিক্যাল মাইলের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং চট্টগ্রাম উপকূল থেকে ৩৫৪ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত মহিসোপান। অবস্থিত সব ধরনের প্রাণিজ ও অপ্রাণিজ সম্পদের ওপর মালিকানা লাভ করে।

গভীর সমুদ্র

বঙ্গোপসাগর হল বিশ্বের বৃহত্তম উপসাগর। এটি ভারত মহাসাগরের উত্তর অংশে অবস্থিত একটি প্রায় ত্রিভুজাকৃতি উপসাগর। এই উপসাগরের পশ্চিম দিকে রয়েছে ভারত ও শ্রীলঙ্কা, উত্তর দিকে রয়েছে ভারত ও বাংলাদেশ এবং পূর্ব দিকে রয়েছে মিয়ানমার ও থাইল্যান্ড। বঙ্গোপসাগরের ঠিক মাঝখানে বিরাজ করছে ভারতের অধিভুক্ত আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। বঙ্গোপসাগরের গভীর সমুদ্রের কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল:

সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য:

বঙ্গোপসাগর একটি সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য অঞ্চল। এখানে বিভিন্ন প্রজাতির সামুদ্রিক প্রাণী বাস করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল:

সাগর সাপ: কেরিলিয়া জর্দোনি হল বঙ্গোপসাগরের একটি বিরল প্রজাতির সাগর সাপ। এটি বিষধর এবং মানুষের জন্য বিপজ্জনক।

সমুদ্র শৈল: গ্লোরি অফ বেঙ্গল শঙ্কু *Conus bengalensis* হল একটি বিষাক্ত সমুদ্র শৈল। এটি দেখতে সুন্দর হলেও এটি বিষধর।

সমুদ্র কচ্ছপ: জলপাই রাইডলি সমুদ্র কচ্ছপ একটি বিপন্ন প্রজাতি। এটি ভারতের ওড়িশার গহিরমাথা সমুদ্র সৈকতে বাসা বাঁধে।

মাছ: বঙ্গোপসাগরে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মার্লিন, ব্যারাকুডা, স্কিপজ্যাক টুনা, ইয়েলোফিন টুনা, ইন্দো-প্যাসিফিক হ্যাম্পব্যাকড ডলফিন এবং ব্রাইডের তিমি।

অন্যান্য প্রাণী: বঙ্গোপসাগরে অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে রয়েছে বঙ্গোপসাগর হোগফিশ, ডলফিন, টুনা, ইরাবাদি ডলফিন, লবণাক্ত জলের কুমির, দৈত্য চিংড়ি ইত্যাদি।

গ্রেট নিকোবর বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ: গ্রেট নিকোবর বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ একটি গুরুত্বপূর্ণ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা। এটি ভারতের অন্তর্গত একটি দ্বীপপুঞ্জ। এখানে বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী বাস করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল:

লবণাক্ত জলের কুমির: গ্রেট নিকোবর বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ লবণাক্ত জলের কুমিরের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রজনন কেন্দ্র।

দৈত্য চিংড়ি: গ্রেট নিকোবর বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ দৈত্য চিংড়ির জন্যও একটি গুরুত্বপূর্ণ আবাসস্থল।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্ব

অর্থনৈতিক গুরুত্ব:

বঙ্গোপসাগরের গভীর সমুদ্র অঞ্চলটি অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এখানে তেল, গ্যাস এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। এই সম্পদগুলির অনুসন্ধান ও উত্তোলন বর্তমানে চলছে। এছাড়াও, বঙ্গোপসাগরের গভীর সমুদ্রে বিভিন্ন খনিজ পদার্থ, যেমন- লোহা, অ্যালুমিনিয়াম, তামা, সোনা ইত্যাদি পাওয়া যায়। বঙ্গোপসাগরের গভীর সমুদ্র অঞ্চলটিতে সামুদ্রিক সম্পদেরও যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। এখানে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ, সামুদ্রিক প্রাণী, উদ্ভিদ এবং শৈবাল রয়েছে। এই সম্পদগুলির আহরণ ও ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব।

বঙ্গোপসাগরের গভীর সমুদ্রের পরিবেশগত গুরুত্ব:

বঙ্গোপসাগরের গভীর সমুদ্র অঞ্চলটি পরিবেশগতভাবেও গুরুত্বপূর্ণ। বঙ্গোপসাগরের গভীর সমুদ্র অঞ্চলটিতে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক পরিবেশ রয়েছে। এখানে তীব্র চাপ, নিম্ন তাপমাত্রা এবং অন্ধকারের মতো চ্যালেঞ্জিং পরিবেশ রয়েছে। এই পরিবেশ গুলোর ভারসাম্য রক্ষায় গভীরে থাকা বিভিন্ন প্রজাতির মাছ, সামুদ্রিক প্রাণী, উদ্ভিদ এবং শৈবাল সহ নানা জীববৈচিত্র্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই পরিবেশে বসবাসকারী প্রাণীগুলি অভিযোজন করে এই চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলা করে।

বঙ্গোপসাগরের গভীর সমুদ্রের ভবিষ্যৎ: বঙ্গোপসাগরের গভীর সমুদ্র অঞ্চলটি একটি সম্ভাবনাময় অঞ্চল। এখানে তেল, গ্যাস, খনিজ পদার্থ এবং সামুদ্রিক সম্পদের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। এই সম্পদগুলির আহরণ ও ব্যবহারের

মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব।



বাংলাদেশের ভৌগলিক সীমারেখায় ২০.৩৪" থেকে ২৬.৩৮" উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮.০১" থেকে ৯২.৪১" পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে মোট প্রায় ১৪৩,৯৯৮ বর্গ কিলোমিটার জায়গা আছে। এর মধ্যে ৮৩০০ হেছে নদ-নদী ও মোহনাঞ্চল এবং আনুমানিক ২১,৯৫০ বর্গ কিলোমিটারে আছে নানা ধরনের বন।

বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান, ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুযায়ী এদেশটি বন্যপ্রাণীর জন্য একটি স্বর্গপুরীর মতো। বাংলাদেশের যেসব বনে বন্যপ্রাণী সর্বদাই বিচরণ করছে সেগুলো হচ্ছে-

1. পাতাঝরা বন বা শালবন
2. চির সবুজ ও মিশ্র চিরসবুজ বন
3. সুন্দরবন
4. চকোরিয়া সুন্দরবন
5. দ্বীপাঞ্চল ও ম্যানগ্রোভ বন
6. গ্রামীণ বন
7. জলাভূমির বন

পাতাঝরা বন

দেশের পাতাঝরা বনকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়-

1. আর্দ্র পাতাঝরা বন

বেশি বৃষ্টিপাতের এলাকার বনকে আর্দ্র পাতাঝরা বন বলে। ঢাকা, টাঙ্গাইল, জামালপুর এবং ময়মনসিংহ ইত্যাদি অঞ্চলের শালবন এই বনের অন্তর্ভুক্ত।

2. শুষ্ক পাতাবরা বন

রংপুর এবং দিনাজপুর জেলার বিলুপ্তপ্রায় শালবন এই বনের আওতাভুক্ত।

অবস্থানঃ

আমাদের শালবন সমুদ্র সমতল থেকে প্রায় ১৮ থেকে ২১ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। শালবনের উঁচু জায়গা এবং চড়াই-উৎরাইকে 'চালা' বলে অন্যদিকে সমান্তরাল এবং ঢালু জায়গাকে বাঈদ বলে। এক সময় বাঈদ এলাকায় ঘাস ও নলখাগড়া হতো। এখন সেখানে ব্যাপকহারে ধানের চাষ হয়। চালা প্রতিনিয়ত কেটে সমান করে বাঈদে পরিণত করা হচ্ছে। ধ্বংস হচ্ছে শালবন।

শালবনের গাছপালাঃ

শালবনের প্রধান প্রধান গাছগুলোর মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগ জায়গা জুড়ে রয়েছে শাল বা গজারী। এছাড়া রয়েছে কাইকা, শীল কড়াই, সাদা কড়াই, চাকুয়া কড়াই, কদম, কান্তা কড়াই, আজুলী, জারুল, বট, পাকুড় বা অশ্বথ, জাম, বহেরা, হরিতকী ইত্যাদি। এসব গাছের উচ্চতা ১৩ মিটারের বেশি। চন্দ্রতাপের নিচে রয়েছে ৬ থেকে ১২ মিটার উচ্চতার, দ্বিতীয় বা নিম্নস্তর। ছায়া সহ্যকারী এবং দূরে দূরে জন্মানো এই স্তরের গাছের মধ্যে আছে নিম, কাঞ্চন, সোনালু বা বান্দরলাঠি, মিনজিরি, কুস্তী, আম, আমরা, আমলকী, সিন্দুরী, অশোক, শেউড়া, গাব, ঘড়ানিম ইত্যাদি। নিম্নস্তর এবং লতানো ও লায়ানার অন্যতম হচ্ছে লতাসীম, গিলা, লতাবড়ই, কুমারিকা, গাছ আলু, বাবুল, রাইটিয়া, কুচি, আগাছা, ল্যানটানা, আসামলতা ইত্যাদি।

চিরসবুজ বন

অবস্থানঃ

দেশের পূর্বাঞ্চল, উত্তরে সিলেট থেকে দক্ষিণে চট্টগ্রাম জেলার টেকনাফ অবধি চিরসবুজ এবং মিশ্র চিরসবুজ বন বিস্তৃত। অবশ্য মধ্যবর্তী কুমিল্লা এবং নোয়াখালী জেলায় এসব বনের অস্তিত্ব বর্তমানে নেই। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে সিলেট, চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উত্তর বনবিভাগের আবহাওয়ার যথেষ্ট তারতম্য দেখা যায়। সিলেট জেলার পূর্বাংশের পাথারিয়া, হারারগাছ, রাজকান্দি, তারাপ, রঘুনন্দন, কালিঙ্গা এবং পশ্চিম ভানুগাছের টিলায় মিশ্র চিরসবুজ বন আছে। জেলার বহু বনভূমি চলে গেছে ১৩৭ টি চা বাগানের ৪৩,০০০ হেক্টর জমিতে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার উত্তর বন বিভাগের কাসালং রিজার্ভ এবং দক্ষিণ বন বিভাগের রাংকিয়ং এবং সাঙ্গু-মাতা মুহুরী রিজার্ভ সর্বাধিক সুন্দর এবং ভালো চিরসবুজ বন বিদ্যমান।

স্তরবিন্যাসঃ

- চিরসবুজ বনের স্তরবিন্যাস খুবই স্পষ্ট। বাংলাদেশের চিরসবুজ বনে প্রবেশের মুখে প্রথমে নজরে আসবে প্রায় ৫০ মিঃ উচ্চতার উপরিস্তর। এ স্তরের এক গাছের ডালপালা অন্য গাছের ডালপালার সাথে মিশে থাকে না এবং গাছগুলোর ঘনত্বও কম। দূর থেকে দেখলে প্রত্যেকটি গাছকে এক একটা ছাতার মত মনে হয়। উপরিস্তরের গাছের ঘনত্ব কম হওয়ায় এরা নির্দিষ্ট চন্দ্রতাপ সৃষ্টি করতে পারে না। ফলে নিচের স্তরে পর্যাপ্ত পরিমাণে আলো প্রবেশ করে। মাটি থেকে গাছের উচ্চতা ৩০-৫০ মিটার। আমাদের চিরসবুজ বনের উপরিস্তরের গাছগুলোর মধ্যে সর্বাধিক বিস্তৃত হচ্ছে বিভিন্ন প্রজাতির গর্জন, চাপালিস, বুদ্ধ নারিকেল, সিভিট, চান্দুল, তেলশুর, পীতরাজ, শিমুল, টুন, কড়াই প্রজাতিসমূহ, বান্দরহোল্লা ইত্যাদি। চিরসবুজ বনে যেরূপ কচু জাতীয় উদ্ভিদ, ফার্ণ ও ট্রি ফার্ণ, ঢেকিশাক, মস ও অরকিড এর ব্যাপক সমারোহ থাকা উচিত তা কেবল চট্টগ্রামের কিছু কিছু বনে বিদ্যমান।
- চিরসবুজ বনের দ্বিতীয় স্তরের গাছের প্রজাতির সংখ্যা অত্যাধিক। এই স্তর ১৫-৩০ মিটার অবধি বিস্তৃত। এই স্তরের নিচে সর্বদা ছায়াঘন পরিবেশ বিদ্যমান। ফলে এই স্তর একটি চন্দ্রতাপ সৃষ্টি করে। যার দরুণ খুব সামান্য সূর্যরশ্মি এই চন্দ্রতাপ ভেদ করে নিচের স্তরে পৌছাতে পারে। দ্বিতীয় বা নিম্ন স্তরের প্রধান প্রধান প্রজাতি হচ্ছে বাটনা ও জাম প্রজাতিসমূহ, রাটা, তালি, গুট গুটিয়া, উরিয়াম, কনক চাম্পা, বট, অশ্বথ, জগড়মুর, প্রভৃতি, জলপাই, রকতন। এছাড়া লাকুচ বা ডাইয়া, গামারী, গাব, পিটালী, উদাল, অর্জুন, বহেরা, হরিতকী, মিনজারী এবং অন্যান্য।
- তৃতীয় স্তরের গাছগুলোর মধ্যে উপরিস্তর এবং দ্বিতীয় স্তরমূহের গাছের চারা ব্যাপক হারে বিদ্যমান। এ স্তরের গাছ ছায়া সহ্যের ক্ষমতা রাখে। এই স্তরকে ট্রান্সগ্রেসিভ (Transgressive storey) স্তরও বলা হয়। সাধারণত মাটির এক মিটার উচ্চতা থেকে এই স্তরের শুরু এবং প্রায় ১০ মিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। কোনো দৈব কারণে উপরের স্তর দুটি নষ্ট হলে ট্রান্সগ্রেসিভ স্তরের গাছপালা অত্যাধিক আলোর প্রভাবে অনেক উঁচু হতে পারে। তৃতীয় স্তরের গাছের মধ্যে আশোক, সিন্দুরী, মেকরাঙা, খোকসা, গার্সিনিয়া, গ্লকিডিয়ন, জাম প্রজাতিসমূহ, কেসটানপসিস, গাম বা বাউলগোটা, আমলকি, ও হাড়জোড়া।

- তৃতীয় স্তরের নিচে এবং কোনো সময় এই স্তরের জায়গা দখলকারী অথবা মিশ্রভাবে অবস্থানকারী স্তরটি হলো নিম্নস্তর। এ স্তরে ব্যাপকহারে বাঁশ, বেত ও বহিরাগত (Exotic) সমস্যা সৃষ্টিকারী উদ্ভিদ দেখা যায়। সিলেট, চট্টগ্রাম, বান্দরবান ও পার্বত্য চট্টগ্রামের চিরসবুজ বন এবং এর সাথে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে কিছু গর্জনের সাথে মিলিতভাবে বাঁশবন আছে। বাঁশ এবং বেত ঝাড়ের যেসব প্রজাতি আছে তার মধ্যে মুলি, মিতিঙ্গা, পারুয়া, দারাল বাঁশ, ডলু, ডলুবাঁশ, কালি ও বড়বাঁশ, গল্লাবেত, হাইনাবেত, সুন্দীবেত, সাঁচীবেত ও বেত প্রধান। বাঁশ ও বেত বনে পাহাড়ি বর্গার ও ছড়ার ধারে এবং ছোটো ছোটো উপত্যকায় প্রচুর জংলী কলা জন্মায়। চিরসবুজ বনের আকর্ষণীয় লতাগুল্ম এবং লায়ানার মধ্যে ব্যাপক বিস্তৃত হচ্ছে টিনোসপোরা, ভিটিস প্রজাতিসমূহ, লতাসীম, গিলা, দেরিস, কাঞ্চন, বনকলমী, ঝুমকোলতা প্রজাতিসমূহ, মুসেন্ডা ও কুমারিকা প্রজাতিসমূহ। চট্টগ্রামের বিভিন্ন জেলার চিরসবুজ বন ধ্বংস করার ফলে সেসব পাহাড়ি ভূমিতে সাংকোষ বা শন গাছ এক দুর্ভেদ্য আবরণ তৈরী করে রেখেছে। কান্টাই কৃত্রিম হ্রদ সৃষ্টির কারণে চিরসবুজ বনের কয়েকশ বর্গ কিলোমিটারব্যাপী বিশাল বনাঞ্চল ডুবে গেছে। সরকার বন কেটে যেসব 'এক প্রজাতি বন' বা মনোকালচার সৃষ্টি করছেন তার মধ্যে সেগুন, চম্পা, ঢাকীজাম, রাবার, গামারী, তেলশূর, লোহাকাট, জারুল, চা এবং মালয় দেশীয় অয়েলপাম প্রধান।

সুন্দরবন

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ জুড়ে যে গ্রীষ্মমন্ডলীয় আর্দ্র এবং চিরসবুজ বন রয়েছে তাকে বলে সুন্দরবন বা ম্যানগ্রোভ বন। এ বনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো-

- এখানে সারা বছর বাতাসের সাথে প্রচুর জলীয় বাষ্প থাকে।
- বনের মাঝখানটা সবসময় স্যাঁতস্যাঁতে থাকে।
- জোয়ারের পানি বনের সবজায়গা বিধৌত করে।
- সারা দেশের পলিমাটি এখানে জমে তাই জমি কর্দমাক্ত।
- বনের বেশিরভাগ গাছ শ্বাস মূল ও ঠেস মূল যুক্ত।
- শ্বাস মূলগুলো মাটি ভেদ করে আকাশমুখী থাকে।
- মাটিতে অতিরিক্ত লবণ ও পাঁচ জৈব পদার্থ থাকে তাই গাছের অক্সিজেনের অভাব হয় এবং গাছ শ্বাস মূলের সাহায্যে বায়বীয় অক্সিজেন গ্রহণ করে।
- অনেক গাছের গোড়ায় আবার আলস্ব বা বাটস্ট্রেস থাকে।
- মাটি কাদাযুক্ত হওয়ার কারণে আলস্ব এবং ঠেস মূল গাছের ভারসাম্য রক্ষা করে।
- প্রধান প্রধান গাছের ফল হয় লম্বা।
- গাছে থাকা অবস্থাতেই ফলের অঙ্কুরোদগম হয়, বীজ হতে ভ্রূণমূলটি লম্বা হয়ে ঝুলতে থাকে। পরে অঙ্কুরটি ঝরে পড়ার সাথে সাথে মাটিতে গেথে যায়। পরে মূল এবং ভ্রূণ মূল বের হয়। লোনা মাটিতে অঙ্কুরোদগম সম্ভব নয় বলেই এই ব্যাবস্থা। এই পদ্ধতিকে জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম বলে।
- কিছু কিছু গাছের ফল নারকেলের মতো শক্ত খোলসে আবৃত থাকে। এরা জল বাহিত হয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে পারে।

সুন্দরবনের নদনদীঃ

হাজার হাজার খাল ও নদী জালের মতো ছেয়ে রেখেছে সুন্দরবনকে। এ বনের বাংলাদেশ অংশের প্রধান নদী হচ্ছে পশুর, শিবসা, আড়পাঙ্গাসশিয়া, মালঞ্চ, কুঙ্গা, ভদ্রা, ভোলা, শেলা এবং রায়মঙ্গল।

বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রাঃ

সুন্দরবনের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১৬৫১-১৭৭৮ মি.মি; জানুয়ারি মাসের সর্বোচ্চ গড় তাপমাত্রা ২৩.৯° সেলসিয়াস থেকে ৩৪.৪° সেলসিয়াস।

সুন্দরবনের গাছপালাঃ

সুন্দরবনের প্রধান গাছ হচ্ছে সুন্দরী, কৃপা, গেওয়া, ওরা, কেওরা, সাদা বাইন, বাইন, গোরিয়া, আমুর, পশুর, ধুন্দল, জির, খলসী, কাকড়া, মঠ গোরান, গোরান, গর্জন, বনজাম, করনজ, পরাস, সিংরা, ডাকর, গাব, হিজল, নুনাঝাউ, সুন্দরীলতা, বলা,

হাড়গোজা,হডো, হেতাল, গোলপাতা,কেওয়াকান্তা, ভাদল, টোরা, বনবকুল, বনলেবু, গিলা, ডেরিস, সারকোলোবাস,খাগড়া, উলু এবং হোগলা।

চকোরিয়া সুন্দরবন

চট্টগ্রাম জেলার চকোরিয়া থানাধীন মাতামুহুরী নদী যেখানে মহেশখালী খাড়ির সাথে মিশেছে সেখানে অবস্থিত চকোরিয়া ম্যানগ্রোভ ফরেস্টকে বন বিভাগে বলা হয় চকোরিয়া সুন্দরবন। চকোরিয়া সুন্দরবনের বহিঃকাঠামো আদি সুন্দরবনের মতো হলেও এর অভ্যন্তরে সুন্দরবনের চারিত্রিক গাছপালা অর্ধশতাধিক বছর আগেই শেষ হয়ে গেছে। প্রায় আশি বর্গকিলোমিটার জায়গা জুড়ে এই সুন্দরবনকে কেবল উপকূলীয় খণ্ডবন বলাই শ্রেয়। এখানে পাঁচ মিটার উচ্চতার কোনো গাছ নেই বললেই চলে। আশেপাশের লোকজন আদি বন কেটে ফেলেছে। এখন যে কাটায়ুক্ত দুর্ভেদ্য উদ্ভিদ জন্মাচ্ছে তার বেশিরভাগই নুনিয়া কান্তা এবং চুলিয়াকান্তা। মাঝে মাঝে গরান এবং কেওড়াও দেখা যায়। বন বিভাগ এই বনের বাইরে কেওড়ার চাষ করেছে। একসময় চকোরিয়া সুন্দরবনে বুনো মোষ, সাঘার হরিণ, চিত্রা হরিণ, শূকর, কাকড়াভুক বানর ও সাধারণ বানর, প্রচুর রামগাদি বা বড় গুইসাপ (Ring Lizard) এবং লোনা পানির কুমির ছিলো। বর্তমানে কেবল গুইসাপ, রামগাদি ছাড়া আর কোনো বন্য প্রাণী নেই। এ বনে অবশ্য উপকূলবর্তী সাপ ও প্রচুর আবাসিক পাখি আছে। শীতকালে অসংখ্য কদাখোচা, চাপাখি, ঘুঘলি, গুলিন্দা প্রভৃতি পাখি বনের কাদায়ুক্ত মেঝে এবং পলিময় কিনারায় বা নদী খালের পাড়ে ভীড় করে। চট্টগ্রাম জেলার উখিয়া থানা থেকে টেকনাফ পর্যন্ত মহা সড়ক এবং নাফ নদীর মধ্যবর্তী কর্দমাক্ত সমভূমি বা মাড ফ্লাটে চকোরিয়া সুন্দরবনের চেয়ে অনেক ভালো ম্যানগ্রোভ বা ডিয়া দ্বীপ বন রয়েছে।এখানে পাঁচ থেকে দশ মিটার উচ্চতার কেওড়া এবং বাইন আছে। ছোট ছোট হাড়গোজা গাছো আছে বেশকিছু। বর্তমানে এই অঞ্চলের উপর থেকে সরকারের নজর উঠে যাওয়ায় এখানকার অনেক জমি চিংড়ি চাষের প্রজেক্টে রূপান্তরিত হচ্ছে। কেবল নাফ নদী তীরের এ বনেই কাকড়াভুক বানর বা প্যারাইল্ল্যা পাওয়া যায়।

দ্বীপাঞ্চলের ম্যানগ্রোভ বন

সেন্ট মার্টিন্স:

বাংলাদেশ ভূসীমানার সবচেয়ে দক্ষিণে, চট্টগ্রাম জেলার টেকনাফ থানার সেন্টমার্টিনস আইল্যান্ড বা জিজিরা দ্বীপ। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা সাত-আট বর্গকিলোমিটারের, দুই মাথা মোটা এবং মাঝখান চিকন আকৃতির অর্থাৎ ডায়েল আকৃতির এই দ্বীপটি প্রবালের তৈরি। দ্বীপের চারপাশে রয়েছে প্রবালের কলোনি

সারা দ্বীপে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে আছে নিশিন্দা, লতানো আইপোমিয়া এবং কেওয়া-কান্তা।

এই দ্বীপে রয়েছে জল কবুতর, গাংচিল, শীতের পাখি, আবাসিক পাখি, সামুদ্রিক কাছিম ও ব্যাঙ, ডোরা, দারাজ ও গোখরা সাপ, রামগাদী, চামচিকা, বাদুড় এবং ইদুর। এখানে এক প্রকার মিঠা পানির কাছিমও আছে।

সেন্টমার্টিন্স দ্বীপ বাদে অন্যান্য সব দ্বীপ মূল ভূখন্ডের কাছাকাছি। এগুলোর মধ্যে নামকরা হচ্ছে মহেশখালী, সোনাদিয়া, কুতুবদিয়া, সন্দ্বীপ, হাতিয়া, চর ওসমান (নিঝুম দ্বীপ) ঢালচর, মৌলবীর চর, রামগতি, চর জব্বার,চর লক্ষী, মনপুরা, চর কুকরী মুকরী। এগুলোর মধ্যে কেবল মহেশখালী দ্বীপে পাহাড়ী এলাকা আছে। এসব পাহাড়ে এক সময় চিরসবুজ বন এবং প্রচুর বন্য প্রাণী ছিলো। বন উজাড় করার কারণে এখানে বন্যপ্রাণীও আর নেই।

সরকার ১৯৬৫-৬৬ থেকে উপকূলবর্তী দ্বীপাঞ্চলে উপকূলীয় বন সৃষ্টির চেষ্টা করছে। ইতিমধ্যে চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলার বনবিভাগের মাধ্যমে ব্যাপক আকারে বন সৃষ্টির কাজ চলছে। দ্বীপাঞ্চলে এবং উপকূলীয় বাঁধে মূলত কেওড়া, গেওয়া, কাকড়া, সুন্দরী, বাইন, পশুর, গড়ান, বাবুল এবং খয়ের গাছ লাগানো হচ্ছে।

উপকূলীয় এবং দূরবর্তী দ্বীপাঞ্চলের রাজ হাঁস সহ হাজার হাজার শীতের পাখির আনাগোনা হয় দ্বীপের কর্দমাক্ত ও অগ্রসরমান অংশ যাকে ইংরেজিতে বলা হয় মাড ফ্লাট এবং তীরবর্তী বালুকাবেলা বা স্যান্ডফ্লাট। মাডফ্লাটে জন্মায় উরীঘাস বা ধান। এই ঘাস গরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল ইত্যাদিকে যেমন আকর্ষণ করে তেমনি করে বুনো হাঁসকে।এখানে কাদাখোচা পাখির সমারোহ বেশি। মদনটাক, বক, পেলকিনও এখানে আসে।

গ্রামীণ বন

গ্রামীণ বন বলে দেশে সত্যিকার অর্থে কোনো বন নেই। তবে এক সময় গ্রামের প্রত্যেকটি পাড়া এবং বাড়ি ঘরের পিছনে বাঁশ ঝাড়, ভিটা বাড়ি বা জঙ্গলে এবং গ্রামের বিস্তীর্ণ জমিতে আম,কাঁঠাল, লিচু, দেবদারু, খেজুর, সুপারি ও নারিকেল বাগান ছিলো এবং তার যে ছায়াঘেরা পরিবেশ ছিলো তা যে কোনো মিশ্র শুল্ক এবং আর্দ্র পাতাঝরা বনের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। এসব বনে শতাধিক বছর আগে বাঘ পর্যন্ত বাস করত।

এখনো দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সকল জেলা, ঢাকার কিছু কিছু থানা, ময়মনসিংহের প্রত্যন্ত গ্রামে, ফরিদপুর এবং যশোর জেলাতে বেশ বড় বড় গাছ আছে। বহু প্রজাতির পাখি, সাপ, ইঁদুর বাদেও এগুলো শেয়াল,বাগডাসা, খাটাশ, বেজী, বনবিড়াল এবং শশকের আবাসভূমি।

গ্রাম গঞ্জের ঝোপ ঝাড় এবং বাগানের সেরা গাছ হচ্ছে আম, কাঁঠাল, জাম, বহরা বাঁশ, ঝাওয়া বাঁশ, খেজুর, সুপারি, নারিকেল, তাল, জিওল, পিটালি, বরুনা, হিজল, গাব, সাজিনা, কলা, সিরিষ, কড়ই, শিল কড়ই, রেস্তী কড়ই, মান্দার, সোনালা, মিনজিরি, চিকরাশি, শিমুল, ছাতিম, বাবুল, পেয়ারা, লিচু, আমড়া, চালতা, বন তেঁতুল, শিশু, দেবদারু, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, কামিনী, বকফুল,মেহগনি,কদম, বট, অশ্বথ, জগড়মুর, খোকসা, জিনাল, তেঁতুল, অর্জুন, আমলকী,কামরাসা, বাজনা, বকুল, কাঞ্চন এবং পলাশ।

জলাভূমির বন

জলাভূমি বলতে দেশের, বিল, বাঁওর, হাওর, মরা নদীর অংশ এবং বড় বড় দিঘিকে বোঝায়। ইংরেজিতে ওয়েটল্যান্ড (Wetland) বলে যে জলজ পরিবেশকে বোঝান হয় বাংলাদেশের জলাভূমিগুলো তার সমতুল্য। পূর্বে দেশের হাওর অঞ্চলে গাওর, বুনো মহিষ, শুকর, হরিণ, বাঘ এবং লক্ষ লক্ষ বুনো হাঁসের আবাসস্থল ছিলো। এখন এখানে স্তন্যপায়ী প্রাণী দেখা না যায় না তবে দেড়শ থেকে দুইশ প্রজাতির পাখি এবং প্রত্যেকটি প্রজাতির হাজার হাজার পাখি শীত মৌসুমে এই জলাভূমিগুলোতে নেমে আসে। এছাড়াও দেশীয় আবাসিক পাখিদের একটা বড় দল, উদবিড়াল বা ভোঁদর, বেজি ও মেছো বিড়াল বহুলাংশে জলাভূমির খাদ্য শৃঙ্খলের এবং পরিবেশ পদ্ধতির অংশ।

জলাভূমির গাছ গাছালির মধ্যে অপুষ্পক উদ্ভিদ ব্যাপকহারে বিরাজমান। তার সাথে সপুষ্পক উদ্ভিদও আছে। প্রধান প্রধান প্রজাতি গুলো হচ্ছে- *Chara*, *Nitella*, *Salvinia*, *Pistia*, *Potamogeton crispus*, *Panicum*, *Lemna*, *Nymphaea nouchali*, *Trapa bispinosa*, *Polygonum* ইত্যাদি আরো অনেক। এসব প্রজাতি হয় পানিতে ভাসে বা ডুবন্ত, অর্ধডুবন্ত অবস্থায় থাকে। কোনো কোনো প্রজাতি পানি ভেদ করে কিছুটা উপরে উঠে আসে, যেমন- পাটিবেত। জলার ধারের গাছ এবং ঝোপঝাড় সৃষ্টিকারী প্রজাতির অন্যতম হচ্ছে হিজল, পানিবাজ, বরুনা, পিটালী, ছিটকী, খাগড়া, হোগলা এবং নল ইত্যাদি।

গত দশক থেকে রাজসাহীর চলন বিল, ঢাকার আড়িয়াল বিলে এবং ময়মনসিংহ, সিলেট জেলার সকল হাওর অঞ্চলে ব্যাপক হারে ইরি ধান ও অন্যান্য ফসলের চাষ চলছে। ফলে এসব এলাকার জলজ জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে। যার ফলে হাওর ও বিলের বন্য প্রাণীদের ব্যাপক সমারোহ আর নজরে আসছে না। চাষাবাদ ছাড়াও বিক্ষিপ্ত মৎস আহরণ জলাভূমির বন্য প্রাণীদের উপর নতুন নতুন উপদ্রবের সৃষ্টি করছে। উপরন্তু আছে জাল পেতে অথবা গুলি করে পাখি শিকার। এদের বেশিরভাগই হচ্ছে গুপ্ত শিকারি বা পোচার।

সঠিক পদক্ষেপ এবং বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা হলে জলাভূমির বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, সীমিত শিকার এবং সেই সাথে পর্যাপ্ত পরিমাণে চাষাবাদ ও মৎস চাষ সম্ভব হবে।

বন ছাড়াও যেসব বন্যপ্রাণী রয়েছে

অনেক বন্য প্রাণী সারা দেশে বা বনের সীমানার বাইরে বাস করে। এদের অধিকাংশই তাদের বেঁচে থাকার জন্য সরাসরি মানুষের উপর নির্ভরশীল নয়। অনেকে মানব বসতি থেকে দূরে স্বাধীনভাবে বসবাস করে। তাদের আবাসস্থল কোন নির্দিষ্ট প্রকারে অন্তর্ভুক্ত নয়। উন্মুক্ত দেশ বা গ্রামাঞ্চল, বিভিন্ন বাগান, রেলওয়ে ট্র্যাক এবং হাইওয়ের পাশে পতিত জমি, ঐতিহাসিক অতীতের ধ্বংসাবশেষ, খাদ, পুকুর এবং দীঘি, পরিত্যক্ত বা ভুতুড়ে বাড়ি এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। গ্রামাঞ্চলে বিশেষ করে বন্যপ্রাণীর বিচরণ লক্ষ্য করা যায়। মানুষের বসতিগুলো কিছু নতুন সুবিধা প্রদান করে বলে, কিছু প্রাণী প্রজাতি তাদের কিছু প্রয়োজনীয়তার জন্য মানুষের উপর নির্ভর করতে শুরু করে।

তাই আমরা আমাদের আঙিনার কাছে নির্দিষ্ট প্রজাতির বাদুড়, ইঁদুর, চড়ই, কাক, ময়না এবং তাদের সহযোগী, টিকটিকি এবং সাপ, টোড এবং ব্যাঙ দেখতে পাই। অন্য প্রাণী যেমনঃ শিয়াল, বন বিড়াল, বেজি, প্যাঁচা, ঈগল, লার্ক, পিপিট, টিকটিকি, সাপ এবং বেশিরভাগ ব্যাঙ, কচ্ছপ, কাছিম গ্রামাঞ্চলে বা খোলা স্থানে বাস করে দেশে। যার মধ্যে চাষ করা ক্ষেতও রয়েছে। যেমন: ধান, গম, আখ এবং ঘাসের ক্ষেত।



অবস্থান: চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, কক্সবাজার, সিলেট, মৌলভীবাজার এবং হবিগঞ্জের পাহাড়ী এলাকা।

পরিমাণ: প্রায় ১৩,৭৭,০০০ হেক্টর যা দেশের আয়তনের ৯.৩৩%। বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত পাহাড়ী বনভূমির পরিমাণ ৬,৭০,০০০ হেক্টর যা বন বিভাগ নিয়ন্ত্রিত বনভূমির ৪৪%।

উদ্ভিদ প্রজাতি: গর্জন, চাপালিশ, তেলসুর, উড়িআম, ঢাকিজাম, সিভিট, সেগুন, গামার, চম্পা, জারুল, বৈলাম প্রভৃতি গাছ এ বনে পাওয়া যায়। এছাড়া এ বনাঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে বাঁশ ও বেত পাওয়া যায়।
বন্যপ্রাণী: এ বনের উল্লেখযোগ্য বন্যপ্রাণী হচ্ছে হাতি, চিতাবাঘ, বন্যশুকর, হরিণ, বানর, উল্লুক, অজগর ইত্যাদি।

বনের পাখি: উদয়ী পাকরা ধনেশ, বড় র্যাকেট ফিঙ্গে, পাতি-ময়না, গলাফোলা ছাতারে ইত্যাদি।



পরিবেশগতভাবে বাংলাদেশের বনগুলোকে নানানভাবে ভাগ করা হয়েছে। এর মাঝে রয়েছে – ক্রান্তীয় আর্দ্র চিরহরিৎ বন, ক্রান্তীয় প্রায়-চিরহরিৎ বন, ক্রান্তীয় আর্দ্র পর্ণমোচী বন, মিঠাপানির জলাভূমি বন, প্যারাবন বা ম্যানগ্রোভ বন ও সৃজিত বন। এর মধ্যে পার্বত্য বন হলো ক্রান্তীয় আর্দ্র চিরহরিৎ বন এবং ক্রান্তীয় প্রায়-চিরহরিৎ বন।

[বিশ্বাস, এস. আর, চৌধুরী, জে.কে (২০০৯), “Forests and forest management practices in Bangladesh: the question of sustainability,” *International Forestry Review*, ভলিউম ৯(২)]

ক্রান্তীয় আর্দ্র চিরহরিৎ বন

এসব বন সাধারণত সিলেট, চট্টগ্রাম এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী এলাকায় পাওয়া যায়। এছাড়াও দক্ষিণ-পূর্বে কক্সবাজার ও উত্তর-পূর্বে মৌলভীবাজারেও এদের অস্তিত্ব রয়েছে।

সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য নিয়ে চিরহরিৎ উদ্ভিদ এখানে কর্তৃত্ব করে। এসব বৃক্ষ ছাড়াও প্রায়-পর্ণমোচী ও পর্ণমোচী প্রজাতির দেখা মিললেও বনের চিরহরিৎ বৈশিষ্ট্য অটুট থাকে।

সর্বোচ্চ চাঁদোয়ার বৃক্ষরা ৪৫ থেকে ৬২ মিটার পর্যন্ত উচ্চতায় বেড়ে উঠতে পারে। আর্দ্রতার কারণে ছায়াযুক্ত আর্দ্র স্থানে পরাশ্রয়ী অর্কিড, ফার্ণ ও ফার্নসহযোগী, আরোহী লতা, স্থলজ ফার্ণ, মস, অ্যারোয়েড এবং বেত পাওয়া যায়। গুল্ম, বিরুং আর ঘাসের পরিমাণ অপ্রতুল।

এধরনের বনে এখন পর্যন্ত প্রায় ৭০০ প্রজাতির সপুষ্পক উদ্ভিদ পাওয়া গেছে। তার মধ্যে সবচাইতে উপরের চাঁদোয়া প্রধানত কালিগর্জন, ঢালিগর্জন, সিভিট, ধূপ, কামদেব, রক্তন, বুদ্ধ নারকেল, টালি, চুন্দুল, ঢাকিজাম দখল করে রাখে। প্রায়-পর্ণমোচী ও পর্ণমোচী বৃক্ষের মধ্যে রয়েছে চম্পা, বনশিমুল, চাপালিশ, মান্দার। এছাড়া চাঁদোয়ার দ্বিতীয় স্তরে অন্যান্যের মধ্যে পাওয়া যায় পিতরাজ, চালমুগরা, ডেফল, নাগেশ্বর, কাণ্ড, জাম, গদা, ডুমুর, কড়ই, ধারমারা, তেজভাল, গামার, মদনমাস্তা, আসার, মুজ, ছাতিম, টুন, বুয়া, অশোক, বরমালা, ডাকরুম। মাঝে মাঝে ব্যাক্তবীজীর মধ্যে Gnetum ও Podocarpus উদ্ভিদ প্রজাতির দেখা মেলে। বাঁশের প্রজাতির মধ্যে রয়েছে মুলি, ডলু, যতি বা মিত্তিঙ্গা, Dendrocalamus longispathus, Oxytenanthera nigrosiliata, Drepanostachyum griffithii.

ক্রান্তীয় প্রায়-চিরহরিৎ বন

সিলেট, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী এলাকায় এ ধরনের বন দেখতে পাওয়া যায়। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দিনাজপুরেও এ ধরনের কিছু বন এলাকা রয়েছে। সাধারণত চিরহরিৎ হলেও পর্ণমোচী বৃক্ষরাও এখানে রাজত্ব করে। বেশিরভাগ বনেই জুমচাষ প্রচলিত।

এখন পর্যন্ত এসব বনে প্রায় ৮০০ প্রজাতির সপুষ্পক উদ্ভিদের উপস্থিতি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। চিরহরিৎ বনের তুলনায় এসব বনে লতাগুল্মের ঝোপঝাড়ের পরিমাণ বেশি। সবচাইতে উপরে চাঁদোয়ার উচ্চতা ২৫ থেকে ৫৭ মিটার। উপত্যকা ও আর্দ্র ঢালের সবচেয়ে উপরের স্তরের উদ্ভিদের মধ্যে রয়েছে চাপালিশ, তেলসুর, চুন্দুল, এবং বুদ্ধনারকেল। মধ্যম স্তরের উদ্ভিদের মধ্যে গুটগুটিয়া, গুটগুইট্রা টুন, পিতরাজ, নাগেশ্বর, উরিআম, নালিজাম, গদাজাম, পিতজাম, ঢাকিজাম উল্লেখযোগ্য। এছাড়া সবচাইতে নিচের স্তরটিতে দেখা যায় ডেফল ও কেচুয়ান। অন্যদিকে, অপেক্ষাকৃত গরম ও শুষ্ক ঢাল এবং শৈলশিরার উপরের স্তরের উদ্ভিদগুলোর মধ্যে পাওয়া যায় গর্জন, বনশিমুল, শিমুল, শিল কড়ই, চুন্দুল, গুজা বাটনা, কামদেব, বুরা গামারি, বহেড়া, এবং মুজ। মধ্যম স্তরের মধ্যে রয়েছে গাব, উদাল, এবং শিভাদি আর নিম্নস্তরে দেখা যায় আদালিয়া, বরমালা, গোদা, অশোক, জলপাই এবং ডারুম। সচরাচর যেসব পর্ণমোচী উদ্ভিদ দেখা যায় সেগুলোর মধ্যে আছে গর্জন, শিমুল, বনশিমুল, বাটনা, চাপালিশ, টুন, কড়ই, এবং জলপাই।

[চিরহরিৎ: যেসব উদ্ভিদ সব ঋতুতেই সবুজ থাকে। পর্ণমোচী বৃক্ষ: ঋতুভেদে যেসব উদ্ভিদের পাতা ঝড়ে যায়। চাঁদোয়া: পল্লববিতান। উদ্ভিদ সম্প্রদায়ের মাটির উপরের অংশ যা উদ্ভিদ মুকুট দ্বারা গঠিত।]

ক্রান্তীয় আর্দ্র চিরহরিৎ বন এবং ক্রান্তীয় প্রায়-চিরহরিৎ বন একসাথে মিলে ৬,৭০,০০০ হেক্টর জমি দখল করে আছে যা দেশের মোট ভূমির ৪.৫৪ শতাংশ এবং মোট জাতীয় বনভূমির ৪৪ শতাংশ। এছাড়াও, দুধরনের বনেই রয়েছে বিচিত্র প্রাণীপ্রজাতির আবাস। স্তন্যপায়ীদের মধ্যে হাতি, বানর, বন্য শূকর, চিত্রা হরিণ, সম্বর হরিণ, এবং ইন্ডিয়ান চিতা উল্লেখযোগ্য। সরিসৃপ হিসেবে এসব বনে বিচরণ রয়েছে শঙ্খচূড়, মনিটর লিজার্ড, এবং বেঙ্গল মনিটর লিজার্ডের।

শত বছর আগে পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চলে পাহাড়িরা থাকত। তারা বন রক্ষা করে জীবিকা ও জীবন নির্বাহ করতো। পাহাড়িরা ঐতিহ্যগত এবং উত্তরাধিকার সূত্রে পাহাড়, বন ও গাছ সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন। বিশ্বে যে পরিমাণ বনভূমি আছে, তার ৬০ শতাংশে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী আছে। আমাদের দেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি, মধুপুরে গারো, সীতাকুণ্ডে ত্রিপুরা জাতিগোষ্ঠী দেখা যায়। এসব জনগোষ্ঠীর জীবনে বন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এদের জীবিকা বন নির্ভর হয়। বনকে ঘিরেই এদের পূজা, উৎসব, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি। পার্বত্য বনাঞ্চলে চিতা বাঘ, এশীয় কালো ভল্লুক, সবচেয়ে ছোট প্রজাতির ভল্লুক সান বিয়ার, মেঘলা চিতা, মর্মর বিড়াল বা মারবলড ক্যাট, সম্বর, সোনাবাঘ বা সোনালি বিড়ালের মতো বিপন্ন প্রাণীর দেখা মিলেছে। তাছাড়াও ঢোল, সেরাও এবং চিতা বিড়ালও দেখা গিয়েছে। ২০১৬ সালের দিকে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের পায়ের ছাপও মিলেছে একদল অনুসন্ধানীর চোখে।



গ্রামীণ জঙ্গল

বনবিহীন অঞ্চলের মধ্যে আনুমানিক ৮৫,৬৫০টি গ্রাম, অনেক শহর ও বিস্তীর্ণ ফসলের ক্ষেত রয়েছে। আক্ষরিক অর্থে বাংলাদেশের গ্রামে কোনো বন নেই। প্রায় তিন দশক আগে দেশের মধ্য উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অনেক জেলায় আর প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে বট, ডুমুর, আম, রেশম তুলা, জামুন, কাঁঠাল, তেঁতুল, শিরীষসহ এক ধরনের বনভূমি ছিল। গাছের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ছাতিম, রেইন্ড্রি, রিচার্ডস কড়ই, দেবদারু, গাব, তাল, নারিকেল, বিলাতি গাব, হিজল, তমাল, সুপারি, তাল, নারিকেল ইত্যাদি। স্থানীয়ভাবে পোড়াবাড়ি নামে পরিচিত পরিত্যক্ত বাড়িগুলোর অধিকাংশই গাছ ও গুল্ম দিয়ে ঢাকা থাকত। গ্রামবাসীরা সেগুলিকে ভূতুড়ে বাড়ি হিসাবে বিবেচনা করতো এবং এড়িয়ে চলত। এছাড়া বাঁশের থোকায় থোকায় পতিত জমির বিস্তীর্ণ এলাকায় শোলা, নল-খাগড়া, পাতিবেত, হোগলা, বিন্না, কচু, মানকচু ইত্যাদি জন্মাত। এছাড়াও বাড়ির উঠানের খাদে গাছপালার কোনো অভাব ছিল না। পুকুর ও খাল, গ্রামের কবরস্থান এবং হিন্দু শ্মশানে প্রচুর গাছপালা ছিল এবং গ্রামবাসীরা এগুলো খুব কম ব্যবহার করত। বেশিরভাগ বাজার এবং কুঁড়েঘরে বিশাল বট বা ডুমুর গাছের প্রাকৃতিক আবরণ ছিল। তখনকার দিনে গ্রামাঞ্চলে পাকা রাস্তা ছিল না, তবে অধিকাংশ পথের পাশে দেবদারু, গাব, ছাতিম ও শিমুল গাছ ছিল। এই সমস্ত গাছপালা মেছো বিড়াল, অজগর এবং কখনও কখনও গোখরা সাপ ইত্যাদি বন্য প্রাণীদের বাসস্থান ছিল।

অতীতে প্রতিটি বসতবাড়ির উঠানে বাঁশের বাগান থাকত। জ্বালানি কাঠ, বাড়িঘর নির্মাণ, কৃষি উপকরণ তৈরিতে, নৌকা, শহরের ভবন, আসবাবপত্র শিল্পের জন্য এবং স্থানীয় মানুষের দৈনন্দিন চাহিদা মেটাতে অনেক গাছ কেটে ফেলা হত। বট, ডুমুর, ছাতিম, শিমুল, পিটালি, বরুণা, মান্দার এবং জিওল গাছের মতো অবাস্তিত গাছ তামাক পাতার আর্দ্রতা হ্রাস করার জন্য আগুন জ্বালানো, ইট পোড়ানো এবং মহাসড়ক তৈরির জন্য আলকাতরা গলানোর কাজে কেটে ব্যবহার করা হত। এছাড়াও, পতিত জমি এবং জলাভূমি অঞ্চল থেকে চাষাবাদ ও বাড়ি নির্মাণের উদ্দেশ্যে গাছপালা কেটে সাফ করা হত।

বর্তমানে শহর এবং বাজারের কিছু জায়গায় কয়েকটি রেইন্ড্রি এবং রিচার্ডস কড়ই ব্যতীত পাঁচ মিটারের উপরে কার্যত কোনো গাছ নেই। সুন্দরবনের উপকণ্ঠে চালনা বন্দর থেকে শুরু করে বৃহত্তর সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগের পাদদেশে তাল, নারিকেল, খেজুর ও সুপারির মতো গাছ সবচেয়ে উঁচু গাছে পরিণত হয়েছে। অবাক করা ব্যাপার হলো, এসব বন হারিয়ে যাওয়ায় শকুন মাঝে মাঝে নারিকেল গাছে অবতরণ করার চেষ্টা করে এবং তালপাতার ঝাঁক নষ্ট করে। এখন পর্যন্ত গ্রামবাসী তাদের গাছগুলোর এমন ধ্বংসকর্ম সহ্য করেছে। বন্য প্রাণীদের হাতে নারিকেল বা সুপারির মতো মূল্যবান গাছ নষ্টের বিষয়টি গ্রামবাসী কতদিনে উপলব্ধি করতে পারবে তা সময়ই বলে দেবে। লম্বা গাছ এবং ঝোপ হারিয়ে যাওয়ায় গ্রাম থেকে বেশিরভাগ মাঝারি আকারের স্তন্যপায়ী প্রাণী, বড় পাখি এবং সরীসৃপ হারিয়ে গেছে। যাইহোক, আজ অবধি কিছু প্রত্যন্ত গ্রামে কিছু বাগান, ঝোপ এবং ঝোপঝাড় অবশিষ্ট রয়েছে যা অনেক প্রজাতির বন্য প্রাণীর শেষ আবাসস্থল।

বাংলাদেশের কতিপয় জলাভূমির প্রাণী

বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বের হাওর অববাহিকা থেকে শুরু করে দক্ষিণের ম্যানগ্রোভ, পার্বত্য অঞ্চলের জলাভূমি, অশ্বখুরাকৃতি হ্রদ (Oxbow lake), মধ্য ও পশ্চিম অঞ্চলে অসংখ্য জলাভূমি রয়েছে। নিম্নে কিছু জলাভূমির প্রাণী সম্পর্কে বলা হলো:

1. মেছো বিড়াল (Fishing Cat)

বৈজ্ঞানিক নাম: *Prionailurus viverrinus*

পরিবার: Felidae

মেছো বিড়াল প্রায় সব জলাভূমিতেই বাস করে। এদের ওজন গড়ে প্রায় ১৫ কেজির মত। এরা নিশাচর প্রাণী। মাছ ধরার জন্যে পায়ের আঙ্গুলগুলোর মাঝের ফাঁকা জায়গায় চামড়ার পর্দা বা জালিকা (Webbing) থাকে। জলাভূমির দ্রুত ধ্বংস হওয়া এবং মানুষের সাথে সংঘাতের কারণে এরা প্রায় বিলুপ্তির পথে। এই বিড়ালগুলো জলাভূমির খাদ্যশৃঙ্খলের শীর্ষে বাস করে। তাই তাদের সংরক্ষণ করলে জলাভূমিগুলো বাঁচবে।

2. রাণী মাছ (Queen Loach)

বৈজ্ঞানিক নাম: *Botia dario*

পরিবার: Botiidae

রাণী মাছ বাংলা রাণী বা গাঙ্গ রাণী নামে পরিচিত। নিঃসন্দেহে এটি জলাভূমির সবচেয়ে সুন্দর মাছগুলোর মধ্যে একটি। দেহ লম্বা ও চ্যাপ্টা। এদের গায়ে কালো-হলুদ ডোরাকাটা দাগ আছে। এই মাছ চলন বিল এবং দেশের অন্যান্য হাওরে পাওয়া যায়। বর্ষা ছাড়া অন্য মৌসুমে কম ধরা পড়ে। রাণী মাছকে পরিবেশগত সূচক বলা হয়। অর্থাৎ যেখানে এই মাছ আছে সেই জায়গাটাকে আরো অন্যান্য প্রাণীর বসবাসের জন্যে স্বাস্থ্যকর বলে মনে করা হয়।

3. কুড়া (Pallas's fish eagle)

বৈজ্ঞানিক নাম: *Haliaeetus leucoryphus*

পরিবার: Accipitridae

বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের হাওর অববাহিকা কুড়া ঈগলের প্রজননক্ষেত্র। এরা কুড়া, কুড়ল, কুড়োল ইত্যাদি নামে পরিচিত। দৈর্ঘ্য প্রায় ৮০ সেন্টিমিটার। ডানা গাঢ় বাদামী রঙের সাদাটে মাথা, ঘাড় ও গলা যা বুকোর দিকে যেতে যেতে গাঢ় বাদামী থেকে ফিকে বাদামী হতে থাকে। এরা উচ্চস্বরে কো-কক-কক-কক শব্দ করে ডাকে। এরা দিবাচর, বৃক্ষচারী এবং খেচর। প্রজননকাল

ডিসেম্বর থেকে মার্চ মাস। সাধারণত পুরান বাসা ব্যবহার করে। পৃথিবীতে প্রায় ২,৫০০ এর মত কুড়া রয়েছে। অরিল্পে গত বছর প্রকাশিত একটি গবেষণায় হাওরে ৫৩ টি প্রজননক্ষম ঈগল গণনা করা হয়েছে। কুড়া ঈগল হতে পারে আমাদের হাওর সংরক্ষণ প্রকল্পের ব্যানার।

4. ভোঁদর (Small-clawed otter)

বৈজ্ঞানিক নামঃ *Amblonyx cinereus*

পরিবারঃ *Mustelidae*

এরা এশীয় উদভোঁদর, ভোঁদর বা উদ নামে পরিচিত। মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ এবং পার্বত্য অঞ্চলের প্রায় প্রতিটি জলপ্রবাহের বনাঞ্চলে এরা বাস করে। দৈর্ঘ্য প্রায় ৪১ সেন্টিমিটার এবং লেজের দৈর্ঘ্য ২৯ সেন্টিমিটার। দেহের রঙ বাদামী এবং হলুদাভ বাদামী। গলা এবং ঠোঁট সাদা। মুখে এবং লেজে কোনো লোম নেই। ভালো সাঁতার কাটতে এবং ডুব দিতে পারে। এরা কাঁকড়া, শামুক, মাছ ইত্যাদি শিকার করে। প্রজননের জন্যে নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই, সারা বছর জুড়েই প্রজনন মৌসুম। এই ভোঁদরগুলো Riparian ইকোসিস্টেম রক্ষা করার জন্যে আদর্শ।

5. দেশী চিতল (Featherback)

বৈজ্ঞানিক নামঃ *Chitala chitala*

পরিবারঃ *Notopteridae*

The humped featherback বা চিতল মাছ একটি দেশীয় শিকারী মাছ। এটি বিশাল আকার অর্জন করতে পারে, পানির উপরিভাগের খাদ্যজালের একটি প্রাণী এবং বাণিজ্যিকভাবে চাষ করা হয়। এর অবস্থার দ্রুত অবনতি হচ্ছে। এখন এর অস্তিত্ব প্রায় হুমকির মুখে। চলন বিল এটির অন্যতম আশ্রয়স্থল, যার আকার মানুষের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের কারণে গত ৩০ বছরে ৯৮% কমে এসেছে। এই প্রজাটিকে অগ্রাধিকার দিয়ে জলাভূমিতে একটি টেকসই মাছ ধরার অনুশীলন পদ্ধতি চালুর মাধ্যমে এর পুনরুদ্ধার হতে পারে।

6. কালোমুখ প্যারাপাখি (Masked Finfoot)

বৈজ্ঞানিক নামঃ *Heliopais personatus*

পরিবারঃ *Heliornithidae*

সুন্দরবনের খাঁড়িগুলো (creeks) বিশ্বের অন্যতম কালোমুখ প্যারাপাখির আবাসস্থল। লবণাক্ততা বৃদ্ধি, অত্যাধিক মাছ ধরা, বিষ দিয়ে মাছ ধরা, চোরাচালান ইত্যাদি কারণে এদের সংখ্যা দিন দিন কমে আসছে। ২০২০ সালে Forktail এ প্রকাশিত একটি সমীক্ষায় বলা হয় 'কালোমুখ প্যারাপাখি এশিয়ার পরবর্তী বিলুপ্ত পাখি হতে চলেছে।'

7. Bristled grassbird

বৈজ্ঞানিক নামঃ *Schoenicola striatus*

পরিবারঃ *Locustellidae*

এই পাখিকে গানের শিক্ষক বলা হয়। এরা ঘন এবং লম্বা তৃণভূমিতে বিচরণ করে। এটি খুব কম পরিচিত একটি পাখি। হাওর অববাহিকার তৃণভূমি এবং গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র নদের মৌসুমী প্লাবিত তৃণভূমি থেকে মাত্র কয়েকটি দৃশ্যমান রেকর্ড করা হয়েছে। এরা দৈর্ঘ্যে ২০ সেন্টিমিটারের মতো হয়। গায়ের রঙ খয়েরী-বাদামী। দিবাচর, স্থলজ, বৃক্ষবাসী এবং খেচর। প্রজননকাল এপ্রিল থেকে জুলাই। এই পাখিটি বিশ্বব্যাপী অরক্ষিত। এটি মৌসুমী তৃণভূমি রক্ষার জন্যে একটি আদর্শ প্রার্থী।

8. ধুম তরুণাঙ্ঘি কাছিম (Peacock softshell turtle) বৈজ্ঞানিক নামঃ *Nilssonia hurum*

পরিবারঃ *Trionychidae*

হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীতে বলা হয় যে, আমাদের পৃথিবী একটি বিশালাকায় কচ্ছপের পিঠে। ঠিক এভাবেই আমাদের জলাভূমির ভাগ্য ধুম তরুণাঙ্ঘি কচ্ছপের পিঠে। পিঠে ময়ূরের মতো চারটি চোখের দাগ রয়েছে তাই এর এরকম নামকরণ করা হয়েছে। এরা সাধারণত ধুম কাছিম নামে পরিচিত। জলপাই রঙের খোলসের উপর হলুদ রঙের বৃত্তাকার ছাপ থাকে। খোলস ডিম্বাকার এবং নিচু। এরা কোনো শব্দ করে না। ধুম কাছিম জলজ এবং নিশাচর। স্ত্রী-কচ্ছপ আগস্ট থেকে ডিসেম্বর মাসে ডিম পাড়ে। এই কচ্ছপ

বাস্তুতন্ত্রের সূচক। তবে এরা বেশিরভাগই অসুরক্ষিত জলাভূমিতে বাস করে।



বিলুপ্ত উদ্ভিদ বলতে বুঝায়, যে সকল প্রজাতির শেষ উদ্ভিদটি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এবং জীবিত কোনো নমুনা প্রাকৃতিক পরিবেশে ও সংরক্ষণাগারে পাওয়া যায়না।

বাংলাদেশের নানান বাস্তুসংস্থানে বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ (নগ্নবীজী, আবৃতবীজী, ব্রায়োফাইটা ও টেরিডোফাইটা) বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কোনো প্রজাতির উদ্ভিদ বিগত ১০০ বৎসর যাবত আর কোথাও পাওয়া না গেলে বন অধিদপ্তর উক্ত প্রজাতিকে বিলুপ্ত হিসেবে বিবেচনা করে।

বাংলাদেশের কিছু বিলুপ্ত উদ্ভিদের নাম নিচে দেওয়া হলো:-

বাংলাদেশের বিলুপ্ত উদ্ভিদ এর তালিকা:

১) জিরিঙ্গা

বৈজ্ঞানিক নাম: *Archidendron jiringa*

গোত্র: Fabaceae

২) চিরহরিৎ

বৈজ্ঞানিক নাম: *Drypetes venusta*

গোত্র: Putranjivaceae

৩) গোলা অঞ্জন

বৈজ্ঞানিক নাম: *Memecylon ovatum*

গোত্র: Melastomataceae

৪) থার্মা জাম

বৈজ্ঞানিক নাম: *Syzygium thumri*

গোত্র: Myrtaceae

৫) কাঠফল

বৈজ্ঞানিক নাম: *Myrica nagi*

গোত্র: Myricaceae

৬) ফিতাচাঁপা

বৈজ্ঞানিক নাম: *Magnolia griffithi*

গোত্র: Magnoliaceae

৭) আঞ্জির

বৈজ্ঞানিক নাম: *Syzygium venustum*

গোত্র: Myrtaceae



বাংলাদেশের বিলুপ্ত প্রাণী

| ক্রমিক নং | বাংলা নাম | ইংরেজি নাম | বৈজ্ঞানিক নাম |
|-----------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| ০১. | এক শিং-বিশিষ্ট বৃহৎ গণ্ডার | Great One-horned Rhinoceros | <i>Rhinoceros unicornis</i> |
| ০২. | ক্ষুদ্র এক শিং-বিশিষ্ট গণ্ডার | Lesser One-horned Rhinoceros | <i>Rhinoceros sondaicus</i> |
| ০৩. | এশীয় দুশিং-বিশিষ্ট গণ্ডার | Asian Two-horned Rhinoceros | <i>Didemnoceros sumatransis</i> |
| ০৪. | নীলগাই | Blue Bull or Nilgai | <i>Boselaphus tragocamelus</i> |
| ০৫. | বুনো মহিষ | Wild Buffalo | <i>Bubalus bubalis/Bubalus earni</i> |
| ০৬. | গাউর | Gaur | <i>Bos gaurus</i> |
| ০৭. | বেন্টিং | Banteng | <i>Bos javanicus</i> |
| ০৮. | বারোশিঙ্গা | Swamp Deer | <i>Cervus duvauceli</i> |
| ০৯. | নাত্রিনি হরিণ | Hog Deer | <i>Axis poreinus</i> |
| ১০. | নেকড়ে | Wolf | <i>Canis lupus</i> |
| ১১. | সোনালী বিড়াল | Golden Cat | <i>Felis temmincki</i> |
| ১২. | মারবেল বিড়াল | Marbled Cat | <i>Felis marmorata</i> |

গত শতাব্দীর ষাটের দশক থেকে শুরু হওয়া বিভিন্ন গবেষণায় পাওয়া যায়, বাংলাদেশের ১৮ টি বন্যপ্রাণীর প্রজাতি একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। এগুলোর মধ্যে কেবলমাত্র একটি (গোলাপি হাঁস) ছাড়া আর বাকি ১৭ টি প্রজাতি এখনো প্রতিবেশী অঞ্চলগুলোতে পাওয়া যায়। এই আলোচনায় বন্যপ্রাণী বলতে মৎস্য ছাড়া অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীকে বোঝানো হয়েছে যেমনঃ স্তন্যপায়ী, পাখি, সরীসৃপ ও উভচর। এই বিলুপ্ত প্রজাতিগুলোর মধ্যে ১২ টি স্তন্যপায়ী, ৫ টি পাখি ও ১টি সরীসৃপ রয়েছে।

পাখি

| ক্রমিক নং | বাংলা নাম | ইংরেজি নাম | বৈজ্ঞানিক নাম |
|-----------|-----------------------|--------------------|----------------------------------|
| ০১. | গোলাপি হাঁস | Pinkheaded Duck | <i>Rhodonessa caryophyllacea</i> |
| ০২. | বর্মী বা নীলময়ূর | Burmese Peafowl | <i>Pavo muticus</i> |
| ০৩. | বৃহৎ হাড়গিলা | Greater Adjutant | <i>Leptoptilos dubius</i> |
| ০৪. | রাজা শকুন | King/Black Vulture | <i>Sarcogyps calvus</i> |
| ০৫. | ডাহর/বেঙ্গল ফ্লোরিকেন | Bengal Florican | <i>Euphodatis bengalensis</i> |

সরীসৃপ

| ক্রমিক নং | বাংলা নাম | ইংরেজি নাম | বৈজ্ঞানিক নাম |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| ০১. | মিঠাপানির কুমির | Marsh Crocodile | <i>Crocodilus palustris</i> |

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

০১. এক শিং-বিশিষ্ট বৃহৎ গণ্ডার

এক সময় পুরো ভারতবর্ষে এক শিং-বিশিষ্ট বৃহৎ গণ্ডার পাওয়া গেলেও বর্তমানে কেবল আসামের কাজিরাস্ট্রা ন্যাশনাল পার্কে সংরক্ষিত অবস্থায় পাওয়া যায়, যা একজন ব্রিটিশ চা-কোম্পানির মালিক ১৯৩০ সালে গড়ে তুলেছিলেন। আসাম অঞ্চলে এদের সর্বপ্রথম দেখতে পাওয়া যায় ১৭৫৮ সালে এবং প্রকৃতিতে সর্বশেষ দেখতে পাওয়া যায় ১৮৬৭ সালে। বাংলাদেশের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে এদেরকে একসময় অনেক দেখা যেত। কিন্তু বাংলাদেশ থেকে কবে এরা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে তা জানা যায়নি।

০২. ক্ষুদ্র এক শিং-বিশিষ্ট গণ্ডার

প্রথম ১৮২২ সালে জাভা দ্বীপে রেকর্ড করা হয় আকারে ছোট ক্ষুদ্র এক শিং-বিশিষ্ট গণ্ডার। এক সময় বার্মা, ইন্দোচীন, মালয়েশিয়া, সুমাত্রা, জাভায় পাওয়া গেলেও বর্তমানে কেবল জাভা দ্বীপের 'উদজার বুলন' অভয়ারণ্যে কিছু সংখ্যক পাওয়া যায়। বাংলাদেশের ঢাকা-ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও সুন্দরবন এলাকায় একসময়

দেখা পাওয়া যেত কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশের সাথে ভারত এবং বার্মা থেকেও বিলুপ্ত। ১৮৪০ সালে সুন্দরবন ও ১৯৩০ এর দশকে কুমিল্লায় রেকর্ড করা হয়েছিলো। বাংলাদেশে বিলুপ্তির সময় রেকর্ড করা যায়নি।

০৩. এশীয় দু'শিং-বিশিষ্ট গণ্ডার

বার্মা, মালয়েশিয়া, ইন্দোচীন, সুমাত্রা হয়ে বোর্নিও পর্যন্ত এশীয় দু'শিং-বিশিষ্ট গণ্ডার বিস্তৃত ছিল, এমনকি অনেকে ধারণা করেন আসামেও এটি পাওয়া যেত। বাংলাদেশে এটি পাওয়া যাওয়ার রেকর্ড না থাকলেও চট্টগ্রামে যে বিচরণ ভূমি ছিল তা নিশ্চিত। ১৮৭২ সালে চট্টগ্রাম থেকে একটি জীবিত এশীয় দু'শিং-বিশিষ্ট গণ্ডার ধরা হয় যা লন্ডন চিড়িয়াখানায় বিক্রি করে দেয়া হয়। ধারণা করা হয়, 'বেগম' নামের এই গণ্ডারটি এই অঞ্চলের সর্বশেষ এশীয় দু'শিং-বিশিষ্ট গণ্ডার ছিলো, সেটিরও ১৮৯৯ সালে মৃত্যু হয়। বাংলাদেশ এবং ভারত থেকে এরা পুরোপুরিই বিলুপ্ত; তবে অনুমান করা হয় বার্মার আরাকান বনাঞ্চলে এখনো ২০-৩০ টি থাকতে পারে।

গণ্ডার নিয়ে কিছু কথা বলা যাক। পৃথিবীতে গণ্ডারের মাত্র পাঁচটি প্রজাতি পাওয়া যেত। দুটো প্রজাতি আফ্রিকা মহাদেশে ও বাকি তিনটি প্রজাতি দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। আফ্রিকা মহাদেশের দুটো প্রজাতি নাকের উপর দুই শিং বিশিষ্ট। এশিয়ার প্রজাতি গুলোর মধ্যে দুটি প্রজাতি এক শিং বিশিষ্ট এবং অন্য প্রজাতিটি দুই শিং বিশিষ্ট। বর্তমান বাংলাদেশে কোন গণ্ডারের প্রজাতি না থাকলেও ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের তিন প্রজাতির গণ্ডারই পাওয়া যেত। রংপুর, দিনাজপুর অঞ্চলে বৃহৎ গণ্ডার; ঢাকা-ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও সুন্দরবনে ক্ষুদ্র গণ্ডার ও পার্বত্য চট্টগ্রামের দু'শিং বিশিষ্ট গণ্ডারের দেখা মিলত।

গণ্ডারের শিং গরু-মহিষ, ছাগল-ভেড়ার শিং, হরিণ-এ্যান্টিলোপের শিং থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। গরু ছাগলের মাথার পাশের শিং এর উপরের অংশের ভেতরে ফাঁকা। সে ছিদ্রে মাথার হাড়ের সরু অংশ প্রবেশ করে আছে। হরিণের শিং পুরোটাই হাঁড়ে তৈরি, যা প্রতিবছর গোড়া থেকে খসে যায়। শিং চামড়ায় আবৃত থেকেই বড় হতে থাকে এবং এক সময় চামড়া শুকিয়ে ঝরে পড়ে হাড়ের শিং স্পষ্ট হয়ে উঠে। অন্যদিকে, গণ্ডারের শিং কোনো হাড়ের সমন্বয়ে তৈরি নয় বরং নাকের উপরের কেশ একত্রিত হয়ে শিং তৈরি করে।

০৪. নীলগাই

বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তর অঞ্চলে এক সময় নীলগাই দেখতে পাওয়া যেতো। ১৯৫০ এর পূর্ব পর্যন্ত দিনাজপুর এলাকায় নীলগাই দেখা গেলেও বর্তমানে তা বিলুপ্ত। তবে ভারতে এখনো নীলগাই পাওয়া যায়।

০৫. বুনো মহিষ

বাংলাদেশের উপকূলীয় চরাঞ্চল ও হাওর এলাকায় একসময় বুনো মহিষ পাওয়া যেতো। বর্তমানে উপকূলীয় চরে দেখা গেলেও সেগুলো পোষ মানানো, বন্য নয়। এদের বিলুপ্তির সময়ের কোনো রেকর্ড পাওয়া যায়নি। ১৭৯২ সালে বেঙ্গল থেকে সত্যিকার বুনো মহিষ রেকর্ড করা হয়েছিল।

০৬. গাউর

প্রাকৃতিক বন ধ্বংস ও সেখানে দেশি-বিদেশি বৃক্ষের মনোকালচার বন সৃষ্টি এবং মানুষের বন দখল এর কারনে গাউর নিজস্ব খাদ্যাভাবের সম্মুখীন হয়েছিলো। চল্লিশের দশকে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাওয়া গেলেও বর্তমানে তা বাংলাদেশ থেকে বিলুপ্ত।

০৭. বেন্টিং

এটি দেখতে প্রায় গাউর মতো তবে কিছুটা ছোট এবং একই পরিবেশে বসবাস করতো। বার্মা, মালয়েশিয়া, শ্যাম, বোর্নিও ও জাভায় পাওয়া যায়, কিন্তু আমাদের দেশে বিলুপ্ত।

০৮. বারোশিঙ্গা

এদের বর্তমানে বিলুপ্ত বলে গণ্য করা হলেও এরা একসময় সুন্দরবনে বসবাস করতো। এদেরকে কেবল ভারতীয় উপমহাদেশেই পাওয়া যায়। সর্বপ্রথম উত্তর ভারতে ১৮২৩ সালে রেকর্ড করা হয়েছিল।

০৯. নাত্রিনি হরিণ

নাত্রিনি হরিণ সাধারণত সিন্ধু থেকে পাঞ্জাব, আসাম বার্মা হয়ে দক্ষিণে টেনাসেরিম পর্যন্ত পাওয়া যায়। আশ্চর্যজনকভাবে, দক্ষিণ ভারতে দেখা না গেলেও শ্রীলঙ্কায় দেখা যায়। ধারণা করা হয় পর্তুগিজরা এদের শ্রীলঙ্কায় নিয়ে গিয়েছিল। বাংলাদেশ একসময় সুন্দরবনে এদের দেখতে পাওয়া গেলেও বর্তমানে বিলুপ্ত হয়েছে বলে মনে করা হয়।

১০. নেকড়ে

নেকড়ে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের বন্যপ্রাণী। তাই এদের ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, উত্তর, মধ্যম ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় দেখতে পাওয়া যায়। ভারতীয় উপমহাদেশের লাডাখ, তিব্বত ও কাশ্মীর অঞ্চলেও এদের দেখা

যায়। নেকড়ে সাধারণত তৃণভূমি, মরুভূমি ও খোলা জায়গা পছন্দ করে। এস. এন. মিত্র নামের এক ভদ্রলোক ১৯৫৭ সালে “বাংলার শিকার প্রাণী” শীর্ষক বইতে লিখেছেন পঞ্চাশের দশকে নোয়াখালি থেকে শেষ নেকড়ে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। যদিও দক্ষিণাঞ্চলে নোয়াখালির পরিবেশে নেকড়ে বাস করার কথা নয় এবং এটিই আমাদের দেশে একমাত্র নেকড়ে দেখতে পাওয়ার রেকর্ড। কুকুরের পূর্বপুরুষ হিসেবে নেকড়ে মনে করেন বিজ্ঞানীরা। এলসেশিয়ান কুকুর সরাসরি নেকড়ের উত্তরসূরী। আমাদের বনাঞ্চলে ‘ঢোল’ নামক এক বন্য কুকুর আছে। উক্ত লেখক ভুলবশত এলসেশিয়ান কুকুর বা ঢোলকেও নেকড়ে ভাবে পারেন।

১১. সোনালী বিড়াল

চট্টগ্রাম অঞ্চলে সোনালী বিড়ালের উপস্থিতি থাকলেও গত কয়েক দশকে এদের অনুপস্থিতি বিলুপ্তির কথা বলে। নেপাল, সিকিম, আসাম, বার্মা, দক্ষিণ চীন থেকে দক্ষিণে মালয়েশিয়া হয়ে সুমাত্রা পর্যন্ত এদের বিচরণের প্রমাণ মেলে। প্রথমবারের মতো ১৮৩৭ সালে এটি সুমাত্রা থেকে প্রথম রেকর্ড করা হয়।

১২. মারবেল বিড়াল

এদেরও প্রথম রেকর্ড করা হয় ১৮৩৭ সালে সুমাত্রা থেকে। পাওয়া যায় নেপাল, সিকিম, আসাম, বার্মা, ইন্দোচীন হয়ে দক্ষিণে মালয়েশিয়া, সুমাত্রা ও পোর্নিও পর্যন্ত। একসময় চট্টগ্রামে পাওয়া গেলেও এখন বিলুপ্ত।

১৩. গোলাপি হাঁস

শুধু বাংলাদেশ না পুরো পৃথিবী থেকেই হাঁসটি বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। ১৯৩৮ সালের পর এই হাঁসটিকে আর দেখা যায়নি। ভারতীয় উপমহাদেশের অযোধ্যা থেকে নেপাল, পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ হয়ে আসাম ও মণিপুরের বনাঞ্চলের আবাসিক ছিল এই হাঁসটি।

১৪. বর্মী বা নীলময়ূর

আসাম, বার্মা ও বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে বর্মী বা নীলময়ূর দেখতে পাওয়া যেত। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশে এর অনুপস্থিতি বিলুপ্তির জানান দেয়। ১৮০৪ সালে সর্বপ্রথম ভারত থেকে এটি রেকর্ড করা হয়।

১৫. বৃহৎ হাড়গিলা

বৃহৎ হাড়গিলা পাখি ভারতীয় উপমহাদেশ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পাওয়া যায়। বাংলাদেশে বর্তমানে বিলুপ্ত হয়ে গেলেও প্রতিবেশী দেশে এরা এখনো টিকে আছে। ১৭৮৯ সালে সর্বপ্রথম এদের রেকর্ড করা হয় ভারতে।

১৬. রাজা শকুন

দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এদের বিস্তৃতি। গত শতাব্দীর ত্রিশ-চল্লিশের দশকেও সাদা পিঠ শকুনের দলের সাথে এদের দেখতে পাওয়া যেত। বর্তমানে বাংলাদেশ থেকে বিলুপ্ত হলেও অল্প সংখ্যক ভারতে পাওয়া যায়। সর্বপ্রথম ভারতের পশ্চিমে এদের রেকর্ড করা হয় ১৭৮৬ সালে।

১৭. ডাহর/বেঙ্গল ফ্লোরিকেন

আমাদের দেশের সিলেট ও চট্টগ্রামের সমতল ভূমির ঘাসের আড়ালে এদের বসবাসের রেকর্ড পাওয়া যায়। তবে ভারতীয় উপমহাদেশ হতে পূর্বে কক্সোডিয়া পর্যন্ত বিস্তৃতি। ধারণা করা হয়, আমাদের দেশে এখন এটি বিলুপ্ত। সর্বপ্রথম এদের বেঙ্গল থেকে ১৭৮৯ সালে রেকর্ড করা হয়।

১৮. মিঠাপানির কুমির

সারা বিশ্বে মিঠা পানিতে মিঠাপানির কুমির পাওয়া গেলেও বর্তমানে বাংলাদেশে কেবল বিশেষ কিছু জলাশয় এবং চিড়িয়াখানায় এরা সংরক্ষিত আছে। তাছাড়া সুন্দরবনে লোনা পানির কুমির এবং রাজশাহীতে কিছু ঘড়িয়াল এখনো দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু মিঠাপানির কুমির বাংলাদেশের প্রাকৃতিক অবস্থা থেকে বিলুপ্ত।

বাংলাদেশে অবস্থিত জাতীয় উদ্যানসমূহ

| নং | জাতীয় উদ্যানসমূহ | অবস্থান | আয়তন (হেক্টর) | ঘোষণার তারিখ |
|-----|-------------------------------|--------------------|----------------|--------------|
| ১. | ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান | গাজীপুর | ৫০২২.২৯ | ১১-০৫-১৯৮২ |
| ২. | মধুপুর জাতীয় উদ্যান | টাঙ্গাইল, মধুপুর | ৮৪৩৬.১৩ | ২৪-০২-১৯৮২ |
| ৩. | রামসাগর জাতীয় উদ্যান | দিনাজপুর | ২৭.৭৫ | ৩০-০৪-২০০১ |
| ৪. | হিমছড়ি জাতীয় উদ্যান | কক্সবাজার | ১৭২৯.০০ | ১৫-০২-১৯৮০ |
| ৫. | লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান | মৌলভীবাজার | ১২৫০.০০ | ০৭-০৭-১৯৯৬ |
| ৬. | কাপ্তাই জাতীয় উদ্যান | পার্বত্য চট্টগ্রাম | ৫৪৬৪.৭৮ | ০৯-০৯-১৯৯৯ |
| ৭. | নিরুম দ্বীপ জাতীয় উদ্যান | নোয়াখালী | ১৬৩৫২.২৩ | ০৮-০৪-২০০১ |
| ৮. | মেধা কচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যান | কক্সবাজার | ৩৯৫.৯২ | ০৮-০৮-২০০৮ |
| ৯. | সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান | হবিগঞ্জ | ২৪২.৯১ | ১০-১০-২০০৫ |
| ১০. | খাদিমনগর জাতীয় উদ্যান | সিলেট | ৬৭৮.৮০ | ১৩-০৪-২০০৬ |
| ১১. | বাউয়াঢালা জাতীয় উদ্যান | চট্টগ্রাম | ২৯৩৩.৬১ | ০৬-০৪-২০১০ |
| ১২. | কাদিগড় জাতীয় উদ্যান | ময়মনসিংহ | ৩৪৪.১৩ | ২৪-১০-২০১০ |
| ১৩. | সিংড়া জাতীয় উদ্যান | দিনাজপুর | ৩০৫.৬৯ | ২৪-১০-২০১০ |
| ১৪. | নবাবগঞ্জ জাতীয় উদ্যান | দিনাজপুর | ৫১৭. ৬১ | ২৪-১০-২০১০ |
| ১৫. | কুয়াকাটা জাতীয় উদ্যান | পটুয়াখালী | ১৬১৩.০০ | ২৪-১০-২০১০ |
| ১৬. | আলতাদীঘি জাতীয় উদ্যান | নওগাঁ | ২৬৪.১২ | ২৪-১২-২০১১ |
| ১৭. | বীরগঞ্জ জাতীয় উদ্যান | দিনাজপুর | ১৬৮.৫৬ | ২৪-১২-২০১১ |
| ১৮. | শেখ জামাল ইনানী জাতীয় উদ্যান | কক্সবাজার | ৭০৮২.১৪ | ১৫-০৪-২০১৯ |
| ১৯. | ধর্মপুর জাতীয় উদ্যান | দিনাজপুর | ৭০৪.৭০ | ২৪-১১-২০২১ |
| মোট | | | ৫৩৭০১.৪৯ | |

হরিণ ও হাতি লালন-পালন বিধিমালা ২০১৭

খামার

যদি কোনো স্থানে ১০ টির বেশি হরিণ বা ১ টি হাতি লালন-পালন করা হয়, তবে তাকে খামার বলা হবে।

লাইসেন্স

হরিণ ও হাতি লালন-পালন করার জন্য লাইসেন্সের প্রয়োজন, এই ক্ষেত্রে যে লালন-পালন করবে তাকে প্রধান ওয়ার্ডেন বা এই পর্যায়ে কোন কর্মকর্তার কাছ থেকে লাইসেন্স করিয়ে নিতে হবে। লাইসেন্স করার জন্য খামারি কে তফসিলে উল্লিখিত প্রসেস ফি সরকারি নির্দিষ্ট খাত বাংলাদেশ ব্যাংক বা যেকোনো সরকারি ট্রেজারিতে জমা দিয়ে তার চালান কপি সংযুক্ত করে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করতে হবে। আবেদনের পর ৩০ দিনের মধ্যে লাইসেন্স কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা আবেদনে উল্লিখিত তথ্যগুলোর সঠিকতা যাচাই এবং হরিণ বা হাতির সংখ্যা অনুযায়ী স্থান, বিয়ারিং শেড, জলাধার ও উপযুক্ত পরিবেশ আছে তা তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিল করিবেন। লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ এক বছর মেয়াদে লাইসেন্স ইস্যু করার আগে আবেদনকারীকে সাত দিনের মধ্যে লাইসেন্স ফি সরকারি নির্দিষ্ট খাত বাংলাদেশ ব্যাংক বা যে কোন সরকারি ট্রেজারিতে জমা দিতে হবে।

পজেশন সার্টিফিকেট

লাইসেন্স প্রাপ্তির পর কোনো খামারি পজেশন সার্টিফিকেট ব্যতীত হরিণ বা হাতি নিজ মালিকানায় বা দখল করতে পারবেনা। পজেশন সার্টিফিকেট এর জন্য প্রত্যেক হাতি ও হরিণের জন্য তফসিলে উল্লিখিত ফি বাৎসরিক ভিত্তিতে সরকারি নির্দিষ্ট খাত বাংলাদেশ ব্যাংক বা যে কোন সরকারি ট্রেজারিতে জমা দিয়ে তার চালান কপি সংযুক্ত করে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করতে হবে। আবেদনের পর ৩০ দিনের মধ্যে ১ বছর মেয়াদের জন্য পজেশন সার্টিফিকেট ইস্যু হবে।

চারণ সার্টিফিকেট

কোনো খামারি যদি সরকারি কোন বনাঞ্চলে হাতি চারণ করতে চায়, তবে তার জন্য চারণ সার্টিফিকেট প্রয়োজন হবে। চারণ সার্টিফিকেট ব্যতীত সরকারি কোনো বনাঞ্চলে হাতি চারণ করতে পারবে না। এই সার্টিফিকেটের জন্য তফসিলে উল্লিখিত ফি বাৎসরিক ভিত্তিতে সরকারি নির্দিষ্ট খাত বাংলাদেশ ব্যাংক বা যে কোন সরকারি ট্রেজারিতে জমা দিয়ে তার চালান কপি সংযুক্ত করে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করতে হবে। আবেদনের পর ১৫ দিনের মধ্যে ১ বছর মেয়াদের জন্য চারণ সার্টিফিকেট ইস্যু করা হবে।

হরিণ লালন-পালন এর শর্তাবলি

হরিণ লালন-পালন এর জন্যে নিজস্ব মালিকানা, ভাড়া বা সরকারের নিকট হতে দীর্ঘমেয়াদী প্রাপ্ত ভূমির দখল থাকতে হবে। প্রত্যেক হরিণের বিশ্রামের জন্য ন্যূনতম সেডের পরিমাপ হবে ১০০ বর্গফুট এবং উচ্চতা ন্যূনতম ১০ ফুট। সেডের মধ্যে দানাদার খাবার, খনিজ লবণ ও সুপেয় পানি সরবরাহের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পাত্রের ব্যবস্থা থাকতে হবে। সেডের আয়তন ছাড়াও প্রত্যেক হরিণের বিচরণ এর জন্য ক্ষেত্রের পরিমাপ হবে ন্যূনতম ৫০০ বর্গফুট পরিমাণ উন্মুক্ত ভূমি। যে সকল প্রাকৃতিক বনে হরিণ পাওয়া যায় উহার সীমানা হতে ন্যূনতম ৩০ কিলোমিটার দূরত্বে হরিণ লালন-পালনের স্থান বা খামার স্থাপন করতে হবে।

হাতি লালন-পালনের শর্তাবলি

হাতি লালন -পালন এর জন্যে নিজস্ব মালিকানা, ভাড়া বা সরকারের নিকট হতে দীর্ঘমেয়াদী প্রাপ্ত ভূমির দখল থাকতে হবে। লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের নিকট হতে চারণ সার্টিফিকেট গ্রহণ ব্যতীত সরকারি বনাঞ্চলে হাতি চারণ (Grazing) করা যাবে না। লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের নিকট হতে নির্ধারিত মূল্যে ট্যাগ (Tag) ক্রয় করে প্রত্যেক হাতির কানে ট্যাগ দ্বারা চিহ্নিত করতে হবে।

বিবিধ

দণ্ডঃ কোনো ব্যক্তি নিম্নবর্ণিত কোনো কাজ করলে উক্ত কাজের জন্যে দণ্ডিত হবেঃ

- (ক) লাইসেন্স গ্রহণ ব্যতীত হরিণ বা হাতি লালন-পালন বা খামার স্থাপন ও পরিচালন করলে,
- (খ) লাইসেন্স নবায়ন ব্যতীত হরিণ ও হাতি লালন-পালন বা খামার পরিচালনা অব্যাহত রাখলে।

কুমির লালন-পালন বিধিমালা ২০১৯

খামার

যেখানে এই বিধিমালার বিধান অনুযায়ী পূর্ণবয়স্ক কুমির হতে ছানা বা ডিম সংগ্রহ করে বানিজ্যিক উদ্দেশ্যে লালন-পালন করা হয়।

লাইসেন্স

কুমির লালন-পালন এবং খামার স্থাপন বা পরিচালনার জন্য প্রধান ওয়ার্ডেন বা সমপর্যায়ের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তার কাছ থেকে লাইসেন্স করে নিতে হবে। কোনো খামারী লাইসেন্স গ্রহণ ব্যতীত কুমির লালন-পালন, খামার স্থাপন বা আমদানি-রপ্তানি পরিচালনা করতে পারবে না। লাইসেন্স করবার জন্য খামারীকে তফসিলে উল্লিখিত প্রসেস ফি সরকারি নির্দিষ্ট খাত বাংলাদেশ ব্যাংক বা যেকোনো সরকারি ট্রেজারিতে জমা দিয়ে তার চালান কপি সংযুক্ত করে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করতে হবে। আবেদনের পর ৩০ দিনের মধ্যে লাইসেন্স কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা আবেদনে উল্লিখিত তথ্যগুলোর সঠিকতা যাচাই এবং কুমিরের সংখ্যা অনুযায়ী উপযুক্ত পরিবেশ আছে কিনা তা তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিল করবেন। লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ এক বছর মেয়াদে লাইসেন্স ইস্যু করার আগে আবেদনকারীকে সাত দিনের মধ্যে লাইসেন্স ফি সরকারি নির্দিষ্ট খাত বাংলাদেশ ব্যাংক বা যেকোনো সরকারি ট্রেজারিতে জমা দিতে হবে।

পজেশন সার্টিফিকেট

লাইসেন্স প্রাপ্তির পর কোনো খামারী পজেশন সার্টিফিকেট ব্যতীত কুমির নিজ মালিকানায় বা দখল করতে পারবে না। পজেশন সার্টিফিকেট এর জন্য প্রত্যেক কুমিরের জন্য তফসিলে উল্লিখিত ফি বাৎসরিক ভিত্তিতে সরকারি নির্দিষ্ট খাত বাংলাদেশ ব্যাংক বা যেকোনো সরকারি ট্রেজারিতে জমা দিয়ে তার চালান কপি সংযুক্ত করে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করতে হবে। আবেদনের পর ৩০ দিনের মধ্যে ১ বছর মেয়াদের জন্য পজেশন সার্টিফিকেট ইস্যু হবে।

কুমির লালন-পালনের শর্তাবলি

একটি খামারের জন্য অন্ত্যন ০৫(পাঁচ) একর সম্পূর্ণভাবে বন্যামুক্ত ভূমি থাকবে যার দূরত্ব হতে হবে সুন্দরবন হতে ন্যূনতম ১০০ কিঃমিঃ। খামারের উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক সকল নিয়ম মেনে কুমির আমদানি করা যাবে এবং কোনো অবস্থাতেই প্রকৃতি হতে কুমির সংগ্রহ করা যাবে না। খামারীকে কেবল সাইটিস (CITES) রেজিস্ট্রিকৃত খামার হতে কুমির সংগ্রহ করতে হবে। খামারের জন্যে ন্যূনতম ২(দুই) জন কুমিরের খামার পরিচালনার উপর প্রশিক্ষিত বিশেষজ্ঞ থাকতে হবে, যারা প্রাণীবিদ্যা, গ্র্যানিম্যাল হাসবেল্ডারি, ফিশারিজ, কনজারভেশন বায়োলজি বা ওয়াইল্ড লাইফ ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রিধারী হবেন।

বিবিধ

দণ্ডঃ কোনো ব্যক্তি নিম্নবর্ণিত কোনো কাজ করলে উক্ত কাজের জন্যে দণ্ডিত হবেঃ

- (ক) লাইসেন্স গ্রহণ ব্যতীত খামার স্থাপন ও পরিচালনা করা।
- (খ) লাইসেন্স নবায়ন ব্যতীত খামার পরিচালনা অব্যাহত রাখা।
- (গ) রেজিস্টার সংরক্ষণ বা উহা পরিদর্শনকারী কোনো কর্মকর্তাকে প্রদর্শন না করা।



পরিচিতি:

জলবায়ু পরিবর্তন হল একটি বড় সমস্যা যা আমাদের গ্রহকে প্রভাবিত করছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবগুলি আমাদের বাসস্থানগুলিতেও দেখা যাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন বাসস্থানগুলিকে প্রভাবিত করে কারণ এটি তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত এবং অন্যান্য আবহাওয়ার ধরণগুলিকে পরিবর্তন করে। এই পরিবর্তনগুলি উদ্ভিদ এবং প্রাণীগুলির জন্য তাদের বাসস্থানগুলিতে বেঁচে থাকা কঠিন করে তুলতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যদি তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়, তাহলে কিছু উদ্ভিদ এবং প্রাণী তাদের বাসস্থান থেকে বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। আবার, যদি বৃষ্টিপাতের পরিমাণ হ্রাস পায়, তাহলে কিছু উদ্ভিদ এবং প্রাণী তাদের বাসস্থান থেকে স্থানান্তরিত হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বাসস্থানগুলিকে প্রভাবিত করে, যার ফলে প্রজাতির বিলুপ্তি, পরিবেশগত বিপর্যয় এবং অন্যান্য সমস্যাগুলি দেখা দিতে পারে। তাই জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে সচেতনতা বাড়ানো এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি।

অধ্যায় ১: জলবায়ুর পরিবর্তন

১.১ জলবায়ু পরিবর্তন কী ?

জলবায়ু পরিবর্তন এমন একটি প্রক্রিয়া যা পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা এবং আবহাওয়ার ধরণকে দীর্ঘমেয়াদে পরিবর্তন করে। এই পরিবর্তনগুলি প্রাকৃতিক এবং মানবসৃষ্ট উভয় কারণেই ঘটতে পারে। প্রাকৃতিক কারণগুলির মধ্যে রয়েছে সূর্যের ক্রিয়াকলাপের পরিবর্তন এবং বৃহৎ আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত। তবে, ১৮০০-এর দশক থেকে, মানব ক্রিয়াকলাপগুলি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান চালক হয়ে উঠেছে। মূলত কয়লা, তেল এবং গ্যাসের মতো জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানোর কারণে জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী প্রধান গ্রিনহাউস গ্যাসগুলি হল কার্বন ডাই অক্সাইড এবং মিথেন, যা নির্গত হয় মূলত জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানো থেকে। গ্রিনহাউস গ্যাসগুলি হল সেই গ্যাসগুলি যা পৃথিবীর চারপাশে একটি কন্ডলের মতো কাজ করে, সূর্যের তাপকে আটকে রাখে এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে। যখন এই গ্যাসগুলির ঘনত্ব বায়ুমণ্ডলে বৃদ্ধি পায়, তখন তারা আরও বেশি তাপ আটকে রাখে, যার ফলে গ্রহটি আরও উষ্ণ হয়। মিথেন নির্গমন প্রাথমিকভাবে কৃষি, তেল এবং গ্যাস অপারেশনের কার্যকলাপ থেকে আসে। গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনে অবদান রাখা প্রধান খাতগুলি হল শক্তি, শিল্প, পরিবহন, ভবন, কৃষি এবং ভূমি ব্যবহার।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ইতিমধ্যেই বিশ্বজুড়ে অনুভূত হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে এগুলি আরও গুরুতর হয়ে উঠবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই প্রভাবগুলির মধ্যে রয়েছে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, আরও চরম আবহাওয়ার ঘটনা, কৃষি ফলনের পরিবর্তন এবং জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি।

Source – <https://www.un.org/en/climatechange/what-is-climate-change>

১.২ বন এবং বন্যপ্রাণীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক

বন্যপ্রাণী এবং বনের মধ্যে জটিল বন্ধন আমাদের গ্রহের পরিবেশগত ভারসাম্যের ভিত্তি তৈরি করে। বন্যপ্রাণী এবং বন একটি পারস্পরিক নির্ভরশীল সম্পর্ক তৈরি করে যা জীবনকে টিকিয়ে রাখে।

অরণ্য, বিচিত্র উদ্ভিদে ভরপুর, অগণিত প্রাণী প্রজাতির জন্য প্রাকৃতিক আশ্রয়স্থল। এই আবাসস্থলগুলি অসংখ্য প্রাণীর বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি, আশ্রয় এবং প্রজননস্থল সরবরাহ করে। বিনিময়ে, বন্যপ্রাণী পরাগায়ন, বীজ বিচ্ছুরণ এবং কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণের মতো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বনের স্বাস্থ্য ও প্রাণশক্তিতে অবদান রাখে। এই মিথোজীবীতা উদ্ভিদ জীবনের বৃদ্ধি এবং পুনর্জন্মে সহায়তা করে, বন সম্প্রসারণের ক্রমাগত চক্র নিশ্চিত করে।

অধিকন্তু, জলবায়ু নিয়ন্ত্রণে, কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণে এবং জীবন-ধারণকারী অক্সিজেন মুক্ত করার ক্ষেত্রে বন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই ভারসাম্য বিভিন্ন প্রাণী প্রজাতির বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য, যখন প্রাণীরা বনের বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে পুষ্টির পুনর্ব্যবহারে অবদান রাখে।

যাইহোক, এই সূক্ষ্ম সম্পর্কটি বন উজাড়, আবাসস্থল ধ্বংস এবং বন্যপ্রাণীর অত্যধিক শোষণসহ মানব ক্রিয়াকলাপের হুমকির সম্মুখীন। বনের প্রতিবন্ধকতা সরাসরি বন্যপ্রাণীর জনসংখ্যাকে প্রভাবিত করে, যার ফলে সমগ্র বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হয়।

জীববৈচিত্র্য এবং পরিবেশগত স্থিতিশীলতা সংরক্ষণের জন্য এই সংযোগটি বোঝা এবং সংরক্ষণ করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বন সংরক্ষণের প্রচেষ্টা বন্যপ্রাণী রক্ষা, সমগ্র বাস্তুতন্ত্র রক্ষা এবং প্রাকৃতিক বিশ্ব এবং মানবজাতি উভয়ের জন্য একটি টেকসই ভবিষ্যত সুরক্ষিত করার সাথে হাতে-কলমে চলে। আগামী প্রজন্মের সুবিধার জন্য বন্যপ্রাণী এবং বনের মধ্যে এই জটিল সম্পর্ককে সম্মান ও রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব।

Source – Our planet-Forest, Netflix

অধ্যায় ২: বন ও বন্যপ্রাণী বাসস্থানের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব:

২.১ বন্য উদ্ভিদের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব:

আমাদের গ্রহে জীবনের জটিল নৃত্য সবসময় পরিবর্তনশীল স্বাভাবিক সূক্ষ্ম সংকেত এবং প্রকৃতির নির্ভরযোগ্য হৃদয় দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। আমরা যে দ্রুত এবং অভূতপূর্ব জলবায়ু পরিবর্তনের সম্মুখীন হচ্ছি, তা এই সুপ্রতিষ্ঠিত নিদর্শনগুলিকে ব্যাহত করছে, বিশেষ করে উদ্ভিদ জীবনের ক্ষেত্রে।

উদ্ভিদ সময়রেখার উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব গভীর এবং সুদূরপ্রসারী। তাপমাত্রা বাড়ার সাথে সাথে বৃষ্টিপাতের ধরণ পরিবর্তন হয়, গাছপালা তাদের অভ্যস্ত সময়সূচী বজায় রাখতে সংগ্রাম করছে।

অঙ্কুরোদগম, ফুল ও ফলের সময় সবই বিশৃঙ্খলায় নিষ্ক্ষিপ্ত হচ্ছে। একসময় নির্ভুলতার সাথে অঙ্কুরিত বীজগুলি এখন দ্বিধাগ্রস্ত, পৃথিবী থেকে বের হওয়ার সঠিক মুহূর্ত সম্পর্কে অনিশ্চিত।

এই পরিবর্তনের পরিণতি উদ্ভিদ রাজ্যের বাইরেও প্রসারিত হয়। আন্তঃনির্ভরতার সূক্ষ্ম জাল যা গাছপালা, পরাগায়নকারী এবং অন্যান্য জীবকে সংযুক্ত করে তা চাপা হয়ে যাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, বসন্তের প্রথম আগমনের ফলে মৌমাছি এবং প্রজাপতির মতো পরাগায়নকারীরা আবির্ভূত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হওয়ার আগে ফুল ফোটাতে পারে। এটি পরাগায়নের জটিল প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করতে পারে, যা শুধুমাত্র গাছপালাকেই নয় বরং জীবিকা নির্বাহের জন্য তাদের উপর নির্ভরশীল প্রাণীদেরও প্রভাবিত করে।

একইভাবে, অমিল সময়ের ঘটনাটি বীজের বিচ্ছুরণকেও প্রভাবিত করতে পারে। যদি উদ্ভিদগুলি প্রাণীদের আগে বীজ উৎপাদন করে যা সাধারণত তাদের ছড়িয়ে দিতে সহায়তা করে তবে এটি উদ্ভিদ প্রজাতির প্রাকৃতিক বিতরণকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে।

তদুপরি, নির্দিষ্ট তাপমাত্রার পরিসরে অভ্যস্ত গাছপালা অসময়ে উষ্ণ বা ঠাণ্ডা পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে চাপে পড়তে পারে বা এমনকি ধ্বংস হতে পারে। এটি খাদ্য শৃঙ্খলে ক্যাসকেডিং প্রভাব ফেলে, কারণ যে প্রাণীরা খাদ্য বা আশ্রয়ের জন্য এই উদ্ভিদের উপর নির্ভর করে তারাও এর প্রতিক্রিয়া অনুভব করে।

কৃষিতে পরিবর্তিত উদ্ভিদ সময়রেখা ফসলের জন্য বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে, যার ফলে ফলন কমে যায় এবং অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়। কৃষকরা পরিবর্তিত জলবায়ুর সাথে তাদের রোপণ এবং ফসল কাটার সময়সূচীকে খাপ খাওয়ানোর চ্যালেঞ্জের সাথে লড়াই করছে।

যেহেতু আমরা এই প্রভাবগুলি প্রত্যক্ষ করি, এটি পরিষ্কার হয়ে যায় যে উদ্ভিদ জীবনের সুস্থতা আমাদের বাস্তুতন্ত্রের স্বাস্থ্যের সাথে জটিলভাবে যুক্ত। উদ্ভিদের টাইমলাইনের ব্যাঘাত একটি শৃঙ্খল প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারে যা সমগ্র বাস্তুতন্ত্রের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়, যা প্রাণী, জল চক্র এবং পুষ্টির প্রবাহকে প্রভাবিত করে। সংরক্ষণের প্রচেষ্টাগুলিকে শুধুমাত্র জলবায়ু পরিবর্তনের তাৎক্ষণিক প্রভাবগুলিই নয় বরং সময়ের মধ্যে সূক্ষ্ম পরিবর্তনগুলিকেও সমাধান করতে হবে যা দীর্ঘস্থায়ী এবং গভীর প্রভাব ফেলতে পারে। আমরা জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমিত করার জন্য কাজ করার সাথে সাথে আমাদের অবশ্যই উদ্ভিদ জীবনের সূক্ষ্ম নৃত্য এবং আমাদের গ্রহের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য এর জটিল ভূমিকা রক্ষা করার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

২.২ বন্যপ্রাণীর আবাসস্থলের উপর জলবায়ু পরিবর্তন এর প্রভাব:

বন্যপ্রাণীর আবাসস্থলের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব পৃথিবীর সমস্ত প্রাণের আন্তঃসংযোগের একটি গভীর অনুস্মারক। গ্রহের উষ্ণতা এবং আবহাওয়ার ধরণ পরিবর্তনের সাথে সাথে অগণিত প্রজাতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ আবাসস্থল হ্রাস এবং প্রায়শই অপরিবর্তনীয় রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এই পরিবর্তনগুলি বন্যপ্রাণীকে মানিয়ে নিতে, স্থানান্তরিত করতে বা বেঁচে থাকার চ্যালেঞ্জগুলির কঠোর বাস্তবতার মুখোমুখি হতে বাধ্য করছে।

পোলার আবাসস্থল বন্যপ্রাণী আবাসস্থলের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের একটি আকর্ষণীয় উদাহরণ প্রদান করে। আর্কটিক, মেরু ভালুক, সীল এবং ওয়ালরাসের আবাসস্থল, উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে নাটকীয়ভাবে বরফের ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। সমুদ্রের বরফ কমে যাওয়ায়, এই প্রজাতিগুলি খাদ্য এবং উপযুক্ত প্রজনন স্থল খুঁজতে আরও বেশি দূরত্ব ভ্রমণ করতে বাধ্য হয়। এটি শুধুমাত্র মূল্যবান শক্তি ব্যয় করে না বরং তাদের বর্ধিত ঝুঁকি, যেমন শিকার এবং ক্লান্তির সম্মুখীন করে।

একইভাবে, **প্রবাল প্রাচীর** – সমুদ্রের তলদেশের প্রাণবন্ত বাস্তুতন্ত্র – ক্রমবর্ধমান সমুদ্রের তাপমাত্রার কারণে বিধ্বংসী প্রভাবের সম্মুখীন হয়। উচ্চ তাপমাত্রার চাপে প্রবালগুলি ধোলাইয়ের মধ্য দিয়ে যায়, যার ফলে তারা মিথোজীবী শ্যাওলাগুলিকে বের করে দেয় যা তাদের পুষ্টি এবং রঙ সরবরাহ করে। এটি প্রবালগুলিকে দুর্বল করে দেয় এবং তাদের উপর নির্ভরশীল সমগ্র বাস্তুতন্ত্রকে বিপদে ফেলে ব্যাপকভাবে মারা যায়। মাছ থেকে সামুদ্রিক কচ্ছপ পর্যন্ত, অনেক প্রজাতি আশ্রয়, খাদ্য এবং প্রজননের জন্য প্রবাল প্রাচীরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে আবদ্ধ।

পাহাড়ের আবাসস্থলও জলবায়ু পরিবর্তনের তাপ অনুভব করছে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে শীতল পরিবেশে অভিযোজিত প্রজাতিগুলি উপযুক্ত অবস্থার সন্ধানে বেশি উচ্চতায় উঠতে বাধ্য হয়। উদাহরণস্বরূপ, আমেরিকান পিকা, একটি ছোট আল্পাইন স্তন্যপায়ী, উষ্ণ তাপমাত্রার সাথে লড়াই করার কারণে ক্ষয়িষ্ণু বাসস্থানের মুখোমুখি হয়। এটি পাহাড়ের উপরে উঠার সাথে সাথে এটি শেষ পর্যন্ত বাসযোগ্য স্থান ফুরিয়ে যেতে পারে।

উপকূলীয় আবাসস্থল সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং ঝড়ের বৃদ্ধির জন্য বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ। সামুদ্রিক কচ্ছপ, তীরের পাখি এবং ম্যানগ্রোভ বন সহ অনেক উপকূলীয় প্রজাতি ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে কারণ তাদের বাসা এবং প্রজনন স্থল সমুদ্রের জল দখলের কারণে হুমকির মুখে পড়েছে। নেস্টিং সাইট প্লাবিত হতে পারে, এবং আবাসস্থল ক্ষয়প্রাপ্ত বা সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে যেতে পারে।



সুন্দরবনের বাঘের সংখ্যা নির্ণয়ের জন্য মূলত বাঘ শুমারি করা হয়ে থাকে। বাঘ শুমারি মূলত দুইটি পদ্ধতিতে করা হয়। যথাঃ ১) **বাঘের পায়ের ছাপ ও ২) ক্যামেরা ট্র্যাপিং**।

অতীতে বাঘের পায়ের ছাপ গণনার মাধ্যমে বাঘ শুমারি করা হতো, তবে এই পদ্ধতিতে অনেক ভুলভ্রান্তি ধরা পড়ে। সর্বশেষ ২০০৪ সালে এই পদ্ধতিতে সুন্দরবনের বাংলাদেশের অংশে বাঘ শুমারি করে বাঘের সংখ্যা পাওয়া যায় ৪৩০ টি।

বর্তমানে আরও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে ক্যামেরা ট্র্যাপিং এর মাধ্যমে বাঘ শুমারি করা হয়। এই পদ্ধতিতে বাঘের ছবি তুলে তা বিশ্লেষণ করে বাঘের সংখ্যা নির্ণয় করা হয়। একটা বাঘের ডোরাকাটা দাগ অন্য বাঘের ডোরাকাটা দাগের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়ে থাকে। তাই ক্যামেরায় তোলা ছবিগুলো সংগ্রহ করে সফটওয়্যারের সাহায্যে তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ করে বাঘের সংখ্যা বের করা হয়। প্রায় ১২ ফুটের বৃত্তাকার জায়গায় গাছপালা কেটে বাঘকে সেই জায়গায় আসার জন্য একটি ফাঁদ তৈরি করা হয়। এখানে আসলেই বাঘের নড়াচড়া লক্ষ্য করলেই ক্যামেরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাঘের ছবি তুলে ফেলে। রাতের বেলায় ক্যামেরা ব্ল্যাক ফ্ল্যাশ ব্যবহার করে যার আলো খালি চোখে দেখা যায় না। ছবিগুলো একটি মেমোরি কার্ডে সংরক্ষিত হয়, যা বনকর্মীরা ৫ দিন পর পর গিয়ে সংগ্রহ করেন। ২০১৫ সালে এই পদ্ধতিতে সুন্দরবনের বাংলাদেশ অংশে বাঘ পাওয়া যায় ১০৬ টি। সর্বশেষ, ২০১৮ সালে ১১৪ টি বাঘ পাওয়া হয় এই পদ্ধতি ব্যবহার করে। বর্তমানে বাংলাদেশে বাঘ শুমারি চলমান রয়েছে যা ২০২৪ সালের মার্চে শেষ হবে।

রেফারেন্স :

১। bit.ly/495MmT0

২। <https://www.bbc.com/bengali/news-43054226>



বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী হ্রাসের প্রধান কারণ অতিরিক্ত জনসংখ্যা এবং ব্যাপক হারে বন উজাড় করা। মূলত মানুষ দিন দিন নিজের বাসস্থান, খাদ্য বা অন্যান্য চাহিদা মেটাতে একদিকে যেমন গাছপালা কাটছে অন্যদিকে অধিক হারে বন্যপ্রাণী শিকার করছে।

জলবায়ু এবং ভৌগলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ। অসংখ্য পশুপাখি, পোকামাকড়, মাছ এবং অন্যান্য প্রাণী দিয়ে ভরপুর আমাদের দেশ। কিন্তু বর্তমান সময়ে ক্রমশ এদের সংখ্যা কমে আসছে। **IUCN Red list of Bangladesh (2015)** এর তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের ১৬১৯ প্রজাতির মধ্যে ৩১ টি প্রজাতি (২%) আঞ্চলিকভাবে বিলুপ্ত হয়ে গেছে, ৫৬ টি প্রজাতি (৩.৪৫%) বিপন্ন প্রায়, ১৮১ টি প্রজাতি (১১.১৮%) বিপন্ন, ১৫৩ টি প্রজাতি (৯.৪৫%) সুরক্ষিত নয়, ৯০ টি প্রজাতি (৬%) হুমকির কাছাকাছি এবং ৮০২ টি প্রজাতি ঝুঁকিমুক্ত অবস্থায় আছে। **IUCN Red list of Bangladesh** এর মতে, সমগ্র দেশজুড়ে ৩৮ টি স্তন্যপায়ী প্রজাতি, ৩৯ টি পাখির প্রজাতি, ৩৮ টি সরীসৃপ প্রজাতি, ১০ টি উভচর প্রজাতি, ৬৪ প্রজাতির মিঠা পানির মাছ এবং ১৮৮ টি প্রজাপতির প্রজাতি হুমকির মধ্যে আছে। যথাযথ পদক্ষেপ সময়মতো না নিলে খুব শীঘ্রই বাংলাদেশে বন্যপ্রাণী প্রায় বিলীন হয়ে যাবে।

বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্যতার অন্যতম প্রধান কারণ হ'লো এদেশের বনাঞ্চল। চট্টগ্রামের পাহাড়ি বনাঞ্চল এবং উপকূলীয় বনাঞ্চল সুন্দরবন ছাড়াও এদেশে একসময় ছিল অনেক শালবন। এ সকল শালবনগুলোতে বিচরণ ছিল বাঘসহ অন্যান্য বন্যপ্রাণীর। এ সকল শালবনগুলো বেশিরভাগই ব্যক্তিগত মালিকানাধীন হয়ে যায়। তাই এই বনাঞ্চলগুলোর পরিপূর্ণ তথ্য সরকারের কাছে নেই। ফলে, মানুষ যে পরিমাণ গাছ কাটছে তার সঠিক তথ্য সরকারের কাছে আসে না। একদিকে যেমন তারা বন উজাড় করছে, অন্যদিকে বন্যপ্রাণীদেরকে হত্যা করছে। এর কারণে শালবনের সংখ্যা কমেছে, বিলুপ্ত হচ্ছে সেখানের বন্যপ্রাণীরা।

বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার সামাজিক বনায়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন ঘটাচ্ছে। এতে করে কৃত্রিমভাবে বন তৈরি হচ্ছে। কিন্তু সকল বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল নিশ্চিত করা হচ্ছে না। কারণ অনেক বন্যপ্রাণীই মানবজাতি থেকে লুকিয়ে বনের গভীরে বসবাস করে। তারা এই কৃত্রিম বনের পরিবেশে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে। এছাড়াও প্রাকৃতিক বনগুলোতে বিভিন্ন উচ্চতার গাছ থাকে। এ সকল গাছগুলোতে অনেক পাখি তাদের বাসা বানাতো। কৃত্রিম বনের গাছগুলো তাদের বসবাসের উপযোগী না হওয়ায় তারাও বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। অনেক প্রজাতির প্রাণী এই কৃত্রিম বনে খাদ্য সংকটে পড়ে মারা যাচ্ছে। ফলে এই প্রজাতির উপর খাদ্যের জন্য নির্ভর যেসকল প্রাণী আছে তাদেরও খাদ্যাভাব দেখা দিচ্ছে। এভাবেই কমে যাচ্ছে বন্যপ্রাণীর সংখ্যা।

গত কয়েক বছরের অনাবৃষ্টি, তাপপ্রবাহ ও নদীর প্রবাহ কমে যাওয়ায় সমুদ্রের পানি উজান থেকে নদীর মিঠা পানিতে মিশে পানিকে লবণাক্ত করে ফেলছে। এ কারণে সে সকল অঞ্চলের মিঠা পানির মাছ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। নদীর প্রবাহ কমে যাওয়া ও নদী শুকিয়ে যাওয়ায় বিভিন্ন জলজ প্রাণী যেমন: কুমির, ঘড়িয়াল, শুশুক ইত্যাদি হারিয়ে যাচ্ছে।



প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো এখানে আমরা বন্যপ্রাণীর সাথে বন উজাড়ের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করব। প্রতিটি প্রাণীর বসবাস এর জন্য প্রয়োজন নির্দিষ্ট অনুকূল আবহাওয়া এবং পরিবেশ। তুমি দেখে থাকবে পরিবেশ, দেশ এবং বনের অবস্থা ভেদে প্রাণীদের ভিন্নতা হয়ে থাকে। যখন বন উজাড় হতে থাকে, তখন সেই এলাকায় বসবাসকৃত বন্যপ্রাণীরা তাদের বাসস্থান হারাতে থাকে।

এখন একটা প্রশ্ন হতে পারে **বন উজাড় কেন হচ্ছে বা বন উজাড় কি?**

বন উজাড় বা বনভূমি উজাড় বলতে বোঝানো হয় যে প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো গাছ পালা কে নিজস্বার্থে কেটে ফেলা বা পুড়িয়ে ফেলা। বিভিন্ন কারণে বন উজাড় করা হয়। যেমন:- কাঠের লোভে। আমরা জানি, কাঠ অনেক কাজে ব্যবহৃত হয় আসবাব পত্র তৈরি থেকে শুরু করে ঘরবাড়ি তৈরি এবং তা ব্যবহার করে আগুন জ্বালানো হয় বা কাঠ কয়লা হিসেবে ব্যবহার হয়। বর্তমানে জনসংখ্যা বাড়ায় গাছপালা কেটে বাসস্থান করা হচ্ছে, অনেক জায়গায় বনাঞ্চল কেটে পশু চরানোর ভূমি এবং চাষাবাদের জন্য জমি তৈরি করা হচ্ছে। বন উজাড়ের একটি অন্যতম কারণ হচ্ছে নগরায়ন।

বন বিভাগ অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট ২ লাখ ৮৭ হাজার ৪৫৩ একর বনভূমি রয়েছে। যার মধ্যে ১ লাখ ৩৮ হাজার একর জমি সংরক্ষিত বনভূমি। (সূত্র: দ্য ডেইলি স্টার বাংলা)

বাংলাদেশে বন উজাড়ের উল্লেখযোগ্য কারণগুলো হলো:

- জনসংখ্যা বৃদ্ধি
- নগরায়ন
- বনের গুরুত্ব সম্পর্কে অজ্ঞতা
- উপযুক্ত আইনের অভাব
- ব্যক্তি পর্যায়ে সচেতনতার অভাব
- বনের জমিতে অপরিকল্পিত কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করা যেমন: কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ, শিল্প কারখানা নির্মাণ
- বিশ্বায়ন
- সরকারি প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতি

- চিংড়ি চাষ
- জলোচ্ছ্বাস ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ
- রাসায়নিক দূষণ
- জুম চাষ

বাংলাদেশের বন উজাড়ের অন্যতম কারণ হচ্ছে অতিরিক্ত জনগোষ্ঠী। বাংলাদেশের অতিরিক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে বন উজাড়ের সম্পর্ক অনেক গভীরভাবে সম্পর্কিত। দিনে দিনে মানুষ বাড়ার ফলে প্রয়োজন হচ্ছে বাড়তি খাদ্য এবং বাসস্থানের। সেই বাড়তি খাদ্য এবং বাসস্থানের যোগান দেওয়ার জন্য কাটা হচ্ছে বন। বন উজাড় করে বাসস্থান তৈরির জন্য জায়গা করা হচ্ছে। খাদ্যের জন্য, চাষাবাদ করার জন্য কৃষি জমি তৈরি করা হচ্ছে বন কেটে। একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশে অনেক বেশি নগরায়ন হচ্ছে। নগরায়ন তৈরির জন্য কাটা হচ্ছে গাছ এবং তৈরি করা হচ্ছে বিল্ডিং।

বন উজাড়ে পরিবেশের কি কি ক্ষতি এবং পরিবর্তন হচ্ছে:

বনভূমি উজাড়ের ফলে পরিবেশের উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, কারণ কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিবেশের অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যাচ্ছে এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ দিন দিন বেড়েই চলছে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটছে। ফলে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিচ্ছে। ভূমি ধ্বংস হচ্ছে এবং বনভূমির উর্বরতা কমছে। প্রস্বেদন কমে যাওয়ায় জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কমে যায় ফলে বৃষ্টিপাত কম হচ্ছে।

জমিতে লবণাক্ততা বাড়ছে কারণ, সুন্দরবনের ঐদিকে মানুষ নিজে চিংড়ি চাষের জন্য লবণাক্ত পানি তৈরি করছে যা ওই অঞ্চলের চাষাবাদের জমি থেকে শুরু করে সকল প্রাণীর ওপর প্রভাব ফেলছে।

বন উজাড় বিলুপ্তি ও বন্যপ্রাণীর সংখ্যা হ্রাসের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। বন উজাড়ের বা বন সংকীর্ণ হওয়ার ফলে বন্যপ্রাণীর জনসংখ্যা কমে যাচ্ছে।

বন উজাড়ের ফলে পরিবেশের জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে যার প্রভাব পড়ছে বন্যপ্রাণীদের ওপর। বন উজাড়ের ফলে প্রাণীদের খাদ্যের অভাব হচ্ছে, বসস্থানের অভাব হচ্ছে। তাদের বাসস্থানের আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে যার প্রভাবে বাংলাদেশের অনেকাংশে বন্যপ্রাণী বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং অনেকাংশে বন্যপ্রাণী বিলুপ্ত হওয়ার পথে।

পার্বত্য অঞ্চলের পাহাড়ের বনাঞ্চল কেটে রাস্তা তৈরি, বাড়ির ঘর তৈরি করা হচ্ছে এবং জুম চাষের জন্য পাহাড়ে গাছ কেটে সমান জায়গা তৈরি করা হচ্ছে এর ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিভিন্ন রকমের বন্যপ্রাণী। যেমন :- হাতি, বানর, শিয়াল এমনকি একসময় বাঘও ছিল পার্বত্য অঞ্চলে। বিভিন্ন রকমের পাখি, যেমন- শালিক, টিয়া, বুলবুলি ইত্যাদির আবির্ভাব কমে গেছে বলা যায় কারণ এখন আর এদের তেমন একটা দেখা যায় না।

গাছপালা কমে যাওয়ায় প্রাণীরা অতি সহজে শিকার হচ্ছে এর মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য হল হরিণ।

বন উজাড়ের সাথে ফল গাছও কমে যাচ্ছে। যেমন:- গ্রামের বাড়িতে ফল গাছ কেটে তৈরি করা হচ্ছে নতুন ঘর নতুন সদস্যদের জন্য। কারণ জনসংখ্যার প্রতিনিয়তই বৃদ্ধি আছে এরকম ভাবে প্রতিটি গ্রামের অধিকাংশ ফল গাছ কেটে ঘর বাড়ি তৈরি হচ্ছে যার ফলে পাখিদের খাদ্যের অভাব হচ্ছে এবং অনেক প্রজাতির পাখি ইতিমধ্যে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

রেফারেন্স:

প্রথম আলো

দ্যা ডেইলি স্টার বাংলা

বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী ও পরিবেশ (প্রফেসর কাজী জাকির হোসেন)

বাংলাদেশের বন ও বনানী (তপন চক্রবর্তী)



সুন্দরবন হচ্ছে হাজার হাজার প্রাণীর বাসস্থান। কিন্তু প্রতিনিয়ত সুন্দরবনের আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তন হচ্ছে, যা ওই অঞ্চলের প্রাণের জন্য হুমকি স্বরূপ।

বর্তমানে সুন্দরবনে কত প্রাণ রয়েছে তা সঠিক বলা যায় না। কারণ অনেকদিন যাবৎ অধিকাংশ প্রাণীর শুমারি করা হয়নি।

উল্লেখযোগ্য একটি শুমারি হচ্ছে ১৯৯৭ সালে। ১৯৯৭ সালের শুমারি অনুসারে সুন্দরবনে এক থেকে এক দশমিক পাঁচ মিলিয়ন হরিণ, প্রায় ৫০ হাজার বানর, প্রায় ২৫ হাজার শূকর, প্রায় ২৫ হাজার বন্য বিড়াল ছিল এবং প্রায় ২০০ টি কুমির ছিল।

বিভিন্ন কারণে সুন্দরবনের বন্য প্রাণের প্রাণ হুমকির মুখে। এর মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য কারণ হচ্ছে –

১। প্রাণী শিকার ও পাচার

২। জাহাজের বজ্র দিয়ে নদী দূষণ এবং পানিকে লবণাক্ত করে তোলা যা ওই অঞ্চলে প্রাণীদের জন্য হুমকিস্বরূপ। যেমন:- প্রতি বছর অনেক বাঘ লবণাক্ত পানি পান করে মারা যায়।

৩। বিষ দিয়ে মাছ ধরা

৪। অতিরিক্ত মাছ ধরা বা মাছ ধরার সময় ছোট ছোট কুমিরের বাচ্চা ধরা পড়ে এবং মারা যায়।

৫। মৌমাছি চাষীদের পারাপারে অনেক প্রাণী ডিম হারাচ্ছে, যার ফলে প্রজনন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

৬। অনেক সময় জেলেদের জালে এবং নৌকার চাকায় আটকা পড়ে ছোট ডলফিনের বাচ্চা মারা যাচ্ছে।

এছাড়াও, বন উজার একটি অন্যতম কারণ হতে পারে সুন্দরবনের প্রাণ বৈচিত্র্যের হুমকির।

সুন্দরবন নাম শুনে আমাদের মাথায় প্রথমত বাঘ এবং হরিণের কথা আসে।

সর্বশেষ বাঘ শুমারি হয় ২০১৮ সালে তখন দেখা যায় ১১৪ টি বাঘ ছিল সুন্দরবনে। অন্যান্য প্রাণী যেমন:- হরিণ, বানর ইত্যাদি। এদের সর্বশেষ শুমারি ১৯৯৭ সালে হয়েছে এরপরে আর কোনো শুমারি হয়নি।

সুতরাং, সুন্দরবনের প্রাণ বৈচিত্র্যকে রক্ষা করতে হলে আমাদের সকলের সচেতনতা, সরকারি কর্মীদের ব্যবস্থাপনা জোরদার করতে হবে এবং কিছু বিধি নিষেধ তৈরী করে মানতে হবে।

তথ্যসূত্র

bit.ly/49d7VBc



চকোরিয়া সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ ফরেস্টের একটি মানবসৃষ্ট ভাংশ, সম্ভবত দেশের কদমাক্ত উপকূলীয় সমতল অঞ্চলে মানুষের চলাচল বা বসবাস না থাকলে এগুলো প্রাকৃতিকভাবে ক্রমবর্ধমান ম্যানগ্রোভ প্রজাতি দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে যেত, সম্ভবত আরেকটি সুন্দরবন তৈরি করত! এমনটি হলে চকোরিয়া উপজেলাকে চকোরিয়া সুন্দরবন বলা হতো। তবে আক্ষরিক অর্থে উপকূলীয় অঞ্চলে কাঁদা-সমতল এলাকায় লক্ষ লক্ষ জনবসতি রয়েছে। ম্যানগ্রোভ প্রজাতির মনোকালচার তৈরী করা এবং কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বন অধিদপ্তর উপকূলীয় বনায়ন বিভাগ তৈরী করেছে।

১৯৭০ এর দশকের শেষদিকে উপকূলীয় বিভাগ দক্ষিণ মধ্য বরগুনা জেলা থেকে টেকনাফ উপদ্বীপের নাফ নদীর তীর পর্যন্ত কেওড়া (*Sonneratia apetala*) এবং বাইন (*Avicennia sp.*) রোপণ শুরু করে। বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার অধীনে অনেক জনমানবহীন দ্বীপেও এগুলো রোপণ করা হয়েছিল। অনেক গাছের উচ্চতা ১৫ বছরের মধ্যে ৫ মিটার পর্যন্ত বেড়েছিল। রোপণ করা জাতগুলোর সাথে আরও বেশ কয়েকটি ম্যানগ্রোভ প্রজাতি সুন্দরবন থেকে এই মানবসৃষ্ট বনে জলের স্রোতের মাধ্যমে চলে এসেছিল, যার ফলে বন্যপ্রাণীর বিস্তৃতি আরও বর্ধিত হয়েছিলো এবং এর কার্যকারিতা বৃদ্ধি পেয়েছিলো।

সরকারী এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলোর দ্বারা কাঠ, জ্বালানী-কাঠের বিক্রি ও জনসাধারণের দ্বারা পাইকারি কাঠ চোরাচালান এবং বনাঞ্চল দখলের কারণে দেশের বনভূমির ক্ষতি হচ্ছে। এর ওপরে, মিয়ানমারের আরাকান রাজ্য থেকে আগত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের কক্সবাজার বিভাগের বনাঞ্চলে বসতি স্থাপনের জন্যে উথিয়া থানা থেকে টেকনাফ টাউনশিপ পর্যন্ত বন কেটে উজার করা হয়েছে।

দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে 'চিংড়ি চাষের খামারে' চাষ করা চিংড়ি ও চিংড়ি রপ্তানি বাণিজ্যের ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধি উপকূলীয় বনের উপর ভয়াবহ বিরূপ প্রভাব ফেলছে বলে মনে করা হচ্ছে। এগুলো উপকূলীয় বনগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে যেখানে বাইন (*Avicennia sp.*) এবং কেওড়া (*Sonneratia sp.*) প্রজাতির আধিপত্য ছিল। এ কারণে এক ডজনেরও বেশি প্রজাতির ম্যানগ্রোভ গাছপালা এবং এর সাথে সমস্ত বন্য প্রাণী হারিয়ে গেছে। এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো :- প্যারাইল্লা বানর, কাঁকড়া খাওয়া ম্যাকাব। এরা উত্তরে হেয়াকো থেকে শুরু করে দক্ষিণে নাফ নদীর সীমান্ত বরাবর টেকনাফ টাউনশিপের বিপরীতে জালিয়ার দ্বীপ পর্যন্ত পাওয়া যেত, যা বর্তমানে দেখা যায়না।

একটি প্রতিবেদনে (খান এবং ওয়াহাব, ১৯৮৩) দেখা যায়, হোয়াইক্যং এবং জালিয়া বন্দরের একটি গবেষণার উপর ভিত্তি করে, হোয়াইক্যং এবং জালিয়ার ঠিক পূর্বে অবস্থিত কয়েকটি দ্বীপকে বন্যপ্রাণী সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা করার পরামর্শ দেওয়া হয়। যা চিংড়ি চাষের জন্য এলাকা দখলে বাধা দিত। পরবর্তীতে তা আর বাস্তবায়িত হয়নি।

সরকারি বন বিভাগ চকোরিয়া সুন্দরবন নামে প্রায় ৮০ বর্গকিলোমিটার উপকূলীয় বনের একটি অংশ হারিয়েছে বেসরকারি চিংড়ি চাষের খামারের জন্য। এলাকাটি কিছুটা সুন্দরবনের মতো ম্যানগ্রোভ বনে আচ্ছাদিত ছিল। তাই এটির নাম ছিল চকোরিয়া সুন্দরবন। শতাব্দী ধরে এই বনে বসবাসকারী সমস্ত বন্যপ্রাণী অদৃশ্য হয়ে গেছে এই বেসরকারি চিংড়ি চাষের খামারের জন্য।



উক্ত উদ্ভিদপ্রজাতিকে সংকটাপন্ন, বিপন্ন, মহাবিপন্ন তিনটি ভাগে ভাগ করে তালিকা করা হলো। (তফসিল-৪ হতে)
বাংলাদেশের বিপন্ন কিছু উদ্ভিদের তালিকাঃ

1. *Wallichia caryotoides*(বিপন্ন)
2. *Vanilla aphylla* (মহাবিপন্ন)
3. *Uncaria cordata*(সংকটাপন্ন)
4. *Terminalia myriocarpa*(বিপন্ন)
5. *Terminalia citrina*(সংকটাপন্ন)
6. *Syzygium reticulatum*(বিপন্ন)
7. *Salacia fruticosa*(সংকটাপন্ন)
8. *Sabia limoniacea*(বিপন্ন)
9. *Sabia lanceolata*(সংকটাপন্ন)
10. *Pinus kesiya*(বিপন্ন)
11. *Aglaomorpha coronans*(মহাবিপন্ন)
12. *Alphonsea lutea*(বিপন্ন)
13. *Alphonsea ventricosa* (বিপন্ন)
14. *Amischotolype hookeri* (বিপন্ন)
15. *Amomum aromaticum*(বিপন্ন)
16. *Amomum costatum* (nu)
17. *Andrographis paniculata* (সংকটাপন্ন)
18. *Anisoptera scapula* (বিপন্ন)

19. *Benkar fasciculata* (সংকটাপন্ন)
20. *Bhesa robusta* (সংকটাপন্ন)
21. *Bulbophyllum oblongum* (মহাবিপন্ন)
22. *Bulbophyllum roxburghii* (মহাবিপন্ন)
23. *Podocarpus neriifolius* (মহাবিপন্ন)
24. *Hydnocarpus kurzii* (মহাবিপন্ন)
25. *Phoenix acaulis* (মহাবিপন্ন)
26. *Andrographis sylhetensis* (মহাবিপন্ন)
27. *Ariopsis peltata* (মহাবিপন্ন)
28. *Cymbopogon osmastoni* (বিপন্ন)
29. *Cyperus thomsonii* (মহাবিপন্ন)
30. *Phyllanthus roxburghii* (বিপন্ন)



- **অভয়ারণ্য :** অভয়ারণ্য হচ্ছে সে সকল এলাকা যেখানে বন্যপ্রাণীরা নিরাপদে বংশবিস্তার করতে পারবে এবং যেখানে বন্যপ্রাণীদের মারা, গুলি ছোড়া, তাদের ধরা এবং তাদের শিকারের জন্য ফাঁদ পাতা নিষেধ।
- **অসম্পূর্ণ ট্রফি:** যখন কোন মৃত বন্যপ্রাণীর অংশবিশেষ পরিশোধন বা প্রক্রিয়াজাত করা হয় না এবং সেই অংশবিশেষ বিলীন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।
- **আবদ্ধ প্রাণী:** বন্দী বন্যপ্রাণী যারা বন্দী অবস্থায় বাচ্চা জন্ম দেয়।
- **ইকোপার্ক:** ইকোপার্ক হচ্ছে এমন একটি অঞ্চল যা বন্যপ্রাণীদের প্রাকৃতিক বসবাস এর পরিবেশের সাথে মিল স্বরূপ এবং পর্যটন সুবিধা রয়েছে সাধারণ জনগণের।
- **কনভেনশন অন বায়োলজিক্যাল ডাইভারসিটি :** কনভেনশন অব বায়োলজিক্যাল ডাইভারসিটি হচ্ছে একটি চুক্তি যেটা নিশ্চিত করে পৃথিবীর উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীব বৈচিত্র্য ও প্রাণী এবং উদ্ভিদ হতে প্রাপ্ত সম্পদের সুষ্ঠুব্যবহার ও সংরক্ষণ।

- **করিডোর:** এমন একটি সংরক্ষিত এলাকা যার প্রাপ্ত সীমানার চলাচল পথ দিয়ে সেখানকার বন্যপ্রাণীরা এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে বা এক বনাঞ্চল থেকে অন্য বনাঞ্চলে নির্দিধায় চলাচল করতে পারে।
- **কুঞ্জবন :** কুঞ্জবন হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট এলাকা যেখানে বিভিন্ন প্রজাতির এবং বৈচিত্রময় উদ্ভিদ দেখা যায় যেমন বৃক্ষরাজি এবং লতাগুল্ম যা ওই এলাকার স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ওপর সাংস্কৃতিক সামাজিক প্রথাগত প্রভাব রাখে।
- **কোর জোন:** জীব বৈচিত্র্য সমৃদ্ধ একটি এলাকাকে সংরক্ষণে আওতায় আনা হচ্ছে কোর জোন। যেখানে বন্যপ্রাণীরা নির্দিধায় বংশবৃদ্ধি করতে পারবে এবং পর্যটক প্রবেশ নিষিদ্ধ বা সীমিত এবং সেখানকার বনজ দ্রব্য ব্যবহার করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।
- **জলাভূমি:** সর্বোচ্চ ৬ মিটার গভীরতা সম্পূর্ণ স্রোতবিহীন মিঠা পানি অথবা নোনা পানি সমৃদ্ধ জলের স্তপকে জলাভূমি বলা হয় সাধারণত নিচু এবং স্যাতস্যাতে হয়ে থাকে।
- **জাতীয় উদ্যান :** জাতীয় উদ্যান হচ্ছে এমন একটি উদ্যান যেখানে প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে মিল রেখে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে তুলে ধরে একটি বড় এলাকাকে জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়। এটি জনসাধারণকে বন্য প্রকৃতির অভিজ্ঞতা দেয়, এবং একইসাথে শিক্ষা,বিনোদন, গবেষণার কাজ করা হয়ে থাকে।
- **জীববৈচিত্র্য:** জীব বৈচিত্র্য হচ্ছে পৃথিবীতে বাসকারী জলজ, স্থলজ ও সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রে বসবাসকারীর সকল প্রাণীর বিভিন্ন প্রজাতির প্রজাতিগত ভিন্নতা ।
- **ট্রফি:** ট্রফি বলতে বোঝায় যখন কোন মৃত প্রাণীর কোন অংশ বা সম্পূর্ণ অংশকে কে প্রক্রিয়াজাত করে সংরক্ষণ করা হয়।
- **পরিযায়ী প্রজাতি:** পরিযায়ী প্রজাতি বলতে সে সকল বন্যপ্রাণীকে বোঝানো হয় যারা নির্দিষ্ট সময়ে এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাতায়াত করে।
- **বাফার জোন:** বাফার জোন হচ্ছে এমন একটি এলাকা যা রক্ষিত এলাকার আওতায় পরেনা বরং এমন এক প্রান্তীয় সীমানায় অবস্থিত যেখানকার স্থানীয় জনগণ ওই এলাকা থেকে নিজ প্রয়োজনে বনজ দ্রব্য ব্যবহার করতে পারে এবং স্বল্প মেয়াদী বনায়নের সুযোগ রয়েছে এবং যার মধ্যে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষিত হবে।
- **বিপদাপন্ন প্রজাতি :** যে সকল বন্যপ্রাণীর বিলুপ্ত হওয়ার হুমকি রয়েছে বা বিরল হিসেবে বিবেচিত এদেরকে বিপদাপন্ন প্রজাতি বলে।
- **বিপন্ন প্রজাতি :** যে সকল প্রাণীরা বর্তমানে ঝুঁকিতে না থাকলেও ভবিষ্যতে বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
- **ভারমিন:** যে সকল প্রাণী কৃষি ফসলের ক্ষতিসাধন করে।
- **মহা বিপদাপন্ন:** যে সকল বন্য প্রাণী বা উদ্ভিদ প্রকৃতিতে ঝুঁকিতে রয়েছে এবং মারাত্মকভাবে বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
- **ল্যান্ডস্কেপ জোন:** ল্যান্ডস্কেপ জোন হচ্ছে জাতীয় উদ্যান ইকোপার্ক এর বাইরে কোন নির্দিষ্ট এলাকা সরকারি অথবা বেসরকারি যেখানে জীববৈচিত্র্য নিয়ন্ত্রণে রাখা হয় এবং প্রাকৃতিক দৃশ্যের সাথে মিল রেখার ব্যবস্থা করা হয় এবং বন্যপ্রাণীরা নিরাপদে চলাচল করতে পারে।
- **রক্ষিত এলাকা :** বিভিন্ন আইনের ধারা অনুযায়ী সরকার ঘোষিত জাতীয় উদ্যান ,কমিউনিটি কনজারভেশন এলাকা ,সাফারি পার্ক, সকল ইকো পার্ক ,সকল অভয়ারণ্য ,উদ্ভিদ উদ্যান এবং কুঞ্জবন কে রক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষিত করা হয়েছে।

মৌমাছি (Bee)

বৈজ্ঞানিক নাম: *Apis indica*

গোত্র: Apidae

মৌমাছি বা মধুমক্ষিকা বা মধুকর, বোলতা এবং পিঁপড়ের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত মধু সংগ্রহকারী পতঙ্গবিশেষ।

এই মৌমাছি আমাদের সুন্দরবনের বনভূমির এক বিচিত্র বস্তুপুঞ্জ। যা দলবদ্ধভাবে উপনিবেশ তৈরি করে বসবাস করে। মৌমাছি একটি অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী পতঙ্গ। সুন্দরবনের মৌমাছি ওখানকার দরিদ্র মানুষকে বেঁচে থাকার রসদ জোগায়। বেঁচে থাকার প্রতিশ্রুতি মানুষকে টেনে নিয়ে যায় নিবিড় অরণ্যনীর গহিনে অবস্থিত মৌমাছির উপনিবেশে—যা ভরপুর থাকে মধুময় খাদ্যে, মানুষেরও আকর্ষণ ওই মধুতে। প্রতি বছরের এপ্রিল মাসে মৌমাছি সুন্দর বনে এসে ভরে যায়, কারণ এ সময়েই সুন্দরবন অরণ্য পুষ্পশোভিত হয়, অঢেল পুষ্পরস সংগ্রহ করা সম্ভব তাই ওই মৌমাছি প্রজাতির হাজার হাজার মৌমাছি সুন্দরবনে প্রবেশ করে ছড়িয়ে পড়ে। তাই এপ্রিল মাসের মধ্যেই শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ মধু সংগৃহীত হয়ে থাকে।

সুন্দরবনে অসংখ্য গাছের সমাহার। মৌচাক তৈরির জন্য মৌমাছি সব প্রজাতির গাছকে একইভাবে ব্যবহার করে না। গেওয়া গাছে ৩৯%, বাইন গাছে ১৬%, গর্জন গাছে ১১%, সুন্দরী গাছে ১%, গরান গাছে ৯.১%, কেওড়া গাছে ৫.৩% ও অন্যান্য গাছে ৩.৪% মৌচাক পাওয়া গেছে। অর্থাৎ গেওয়া গাছ মৌমাছির বেশি আকর্ষণ করে।

পাখির খাদ্যে মোমঃ

হানিগাইড নামে একটি প্রজাতির পাখির প্রধান খাদ্য মোম। হানিগাইড মৌচাক ভেঙে অথবা মাটিতে পড়ে থাকা ভাঙা মৌচাক সংগ্রহ করে খেয়ে থাকে। ওই পাখির খাদ্যনালীতে এক ধরনের ছোট ছোট উদ্ভিদ (Microflora) ও এক ধরনের yeast থাকে। ওই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদ ও yeast হানিগাইডের খাদ্যনালীতে মোমকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ভেঙে হানিগাইডের প্রয়োজনীয় খাদ্য তৈরি করে। অন্য কোনও প্রাণী মোমকে তার খাদ্যতালিকায় রেখেছে কি না তা অজানা।

প্রজাপতি নিয়ে কিছু কথা

“প্রজাপতি প্রজাপতি
কোথায় পেলে ভাই এমন রঙ্গীন পাখা”

প্রজাপতির মতো এত সুন্দর পতঙ্গ পৃথিবীতে পাওয়া দুষ্কর। কল্পনায় যত রঙ ভাবা যায়, তার সবগুলো রঙেরই প্রজাপতি (Butterfly) থাকা সম্ভব। বাহারি কারুকাজযুক্ত নিরীহ পতঙ্গগুলোকে পৃথিবীর সব জায়গাতেই কমবেশি দেখা যায়। সূত্রমতে, পৃথিবীতে প্রায় ২৩,৫০০ প্রজাতির প্রজাপতি রয়েছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, বাংলাদেশে ৫০০- ৫৫০টি প্রজাতি থাকতে পারে, যার মধ্যে ইতোমধ্যে চারশ’ থেকে কিছু কম প্রজাতি শনাক্ত করা গেছে। এ দেশে বর্তমানে তিনটি প্রজাপতি পার্ক রয়েছে চট্টগ্রামের পতেঙ্গায়, গাজীপুরের ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানে ও গাজীপুরের বাঘের বাজারে অবস্থিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাফারি পার্কের ভেতর।

প্রজাপতি মথের (Moth) মতোই লেপিডপ্টেরা (Lepidoptera) বর্গের (Order) সদস্য। তাই মথ প্রজাপতির নিকটাত্মীয়। হাতির যেমন শঁড় (Proboscis) আছে, প্রজাপতিরও তেমনি শঁড় রয়েছে; যা দিয়ে এরা ফুলের ভিতর থেকে নির্যাস বা রস (Nectar) বের করে আনে। রানী আলেকজান্দ্রার পাখির ডানা’ (Queen Alexandra’s Birdwing) পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্রজাপতি। এই প্রজাপতির ডানা দুটির এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত প্রায় ২৫ সেন্টিমিটার (সে.মি) বা ২৫০ মিলিমিটার (মি.মি.) লম্বা। আর সবচেয়ে ছোট প্রজাতিটির নাম ‘পশ্চিমা বামন নীল’ (Western Pygmy Blue) লম্বায় যা মাত্র এক সে.মি. বা ১০ মি.মি. হয়ে থাকে। বাংলাদেশের প্রজাপতির মধ্যে যেগুলো বহুল ও সচরাচর দৃশ্যমান তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সপ্তপদ্মরাগ, সাত ডোরা, উদয়াবল্লী, ডোরাকাটা বাঘ, নীল ডোরা, ঝালর, হলদে চিতা, হলুদ ময়ূরী, সেনাপতি, বনবেদে, মেঘকুমারী, কৃষ্ণ তরঙ্গ, হলুদ, হরতনি, তিলাইয়া ইত্যাদি। এছাড়াও দুর্লভ ও বিরল প্রজাতির মধ্যে রয়েছে বেগুবিহন, স্বর্ণবিহণ, কৃষ্ণ যুবা, অঙ্গুরী, শিখা বউল, রূপসী, লোপামুদ্রা, কৃষ্ণমণি, বিনতি, মণিমালা, মোহনা, সাজুন্তি ইত্যাদি।

পূর্ণাঙ্গ প্রজাপতি দিনের বেলা ফুলে ফুলে উড়ে বেড়ায় ও রস পান করে। ফুলের পরাগায়ণে অর্থাৎ গাছের বংশবিস্তারে এরা সাহায্য করে।

প্রকৃতির সুন্দর সৃষ্টিগুলোর মধ্যে ফুল, পাখি ও প্রজাপতি অন্যতম। সুন্দর এই প্রজাপতিগুলো দেখে আমরা মুগ্ধ হই। কিন্তু এদের প্রতি আমরা মোটেও সচেতন নই। আমাদের দেশের শিশু-কিশোর এমনকি বড়রাও সঠিকভাবে প্রজাপতি চেনে না। এদের উপকারিতা সম্পর্কেও বিশেষ কিছু জানে না। প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় উদ্ভিদ ও প্রাণী-পাখির মতো প্রজাপতিরও যে ভূমিকা রয়েছে তা অনেকের কাছেই অজানা। এ দেশে কত প্রজাতির প্রজাপতি আছে তার যেমন সঠিক হিসাব নেই, তেমনি কয়টি প্রজাতি বিলুপ্তির দোরগোড়ায় ও কয়টি

ইতোমধ্যেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে তার ও সঠিক হিসাব নেই। কাজেই এ বিষয়ে জ্ঞানার্জন করা প্রয়োজন। কারণ সঠিকভাবে বিভিন্ন প্রজাতির প্রজাপতি চিনতে না পারলে এদেরকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হবে না। নিচে কিছু প্রজাতির প্রজাপতি নিয়ে বর্ণনা প্রদান করা হল।

বেগুবিহন



- বাংলা নামঃ বেগুবিহন/ সোনাল
- ইংরেজি নামঃ Common Birdwing
- বৈজ্ঞানিক নামঃ *Trades helenia* (ট্রায়োসে হেলেনা)
- পরিবারঃ Papilionidae (প্যাপিলিওনিডি)
- অবস্থাঃ বিরল

বেগুবিহন বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় প্রজাপতি। সামনের ডানার ওপর ও নিচ পুরোপুরি কালো, শিরায় হালকা ধূসর আভা থাকতে পারে। পিছনের ডানা হলুদ ও শিরা কালো এবং ডানার প্রান্ত কালো ও ঢেউ খেলানো।

বেগুবিহন সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগের মিশ্র চিরসবুজ বনের ঘন জঙ্গল ও বনের কিনারার খোলা প্রান্তরে বাস করে। সকাল ও বিকেলে ফুলে ফুলে উড়ে রস পান করে।

বাংলাদেশ ছাড়াও ভারত ও নেপালসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশ, যেমন- থাইল্যান্ড, চীন, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং পাপুয়া নিউগিনি, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড পর্যন্ত এরা বিস্তৃত।

লাঠিয়াল



- বাংলা নামঃ লাঠিয়াল / হলদে খঞ্জর
- ইংরেজি নামঃ Five-bar Swordtail
- বৈজ্ঞানিক নামঃ *Graphium antiphates* (ফিয়াম অ্যান্টিফেইটস)
- পরিবারঃ Papilionidae (প্যাপিলিএনিডি)
- অবস্থাঃ বিরল

বাংলাদেশের সুন্দর প্রজাপতিগুলোর মধ্যে লাঠিয়াল অন্যতম। ছেলে ও মেয়ে প্রজাপতির চেহারা একই রকম। সামনের ডানার উপরের ভিত্তি রঙ সাদা ও তার উপর পাঁচটি কালো ডোরা। ডানার নিচটা দেখতে উপরের মতোই। তবে কালো ডোরার মাঝখানে সাদার উপর সবুজের আভা রয়েছে। পিছনের ডানার নিচের ভিত্তিমূল সবুজ ও তাতে কমলা-হলদে পার্শ্বদাগ দেখা যায়। ডানার মতো দেহ এবং পায়েও একই ধরনের রঙ ও কারুকাজ। তলোয়ারের মতো কালচে-বাদামি রঙের লম্বা লেজটি সাদা রঙে মোড়ানো থাকে। শৃঙ্গ ও চোখ গাঢ় কালো।

লাঠিয়াল সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগের পাহাড়ি ও আর্দ্র চিরসবুজ বনের বাসিন্দা। একাকী, জোড়ায় বা দলেবলে দেখা মেলে এদের। বেশ দ্রুতগতিতে এবং বাহারি ঢঙে ওড়ে। সচরাচর গাছের উপরের দিকে চক্রাকারে উড়তে থাকে।

সুদর্শন এই প্রজাপতি বাংলাদেশ ছাড়াও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল, শ্রীলঙ্কা, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন প্রভৃতি দেশে বিচরণশীল।

উদয়াবল্লী



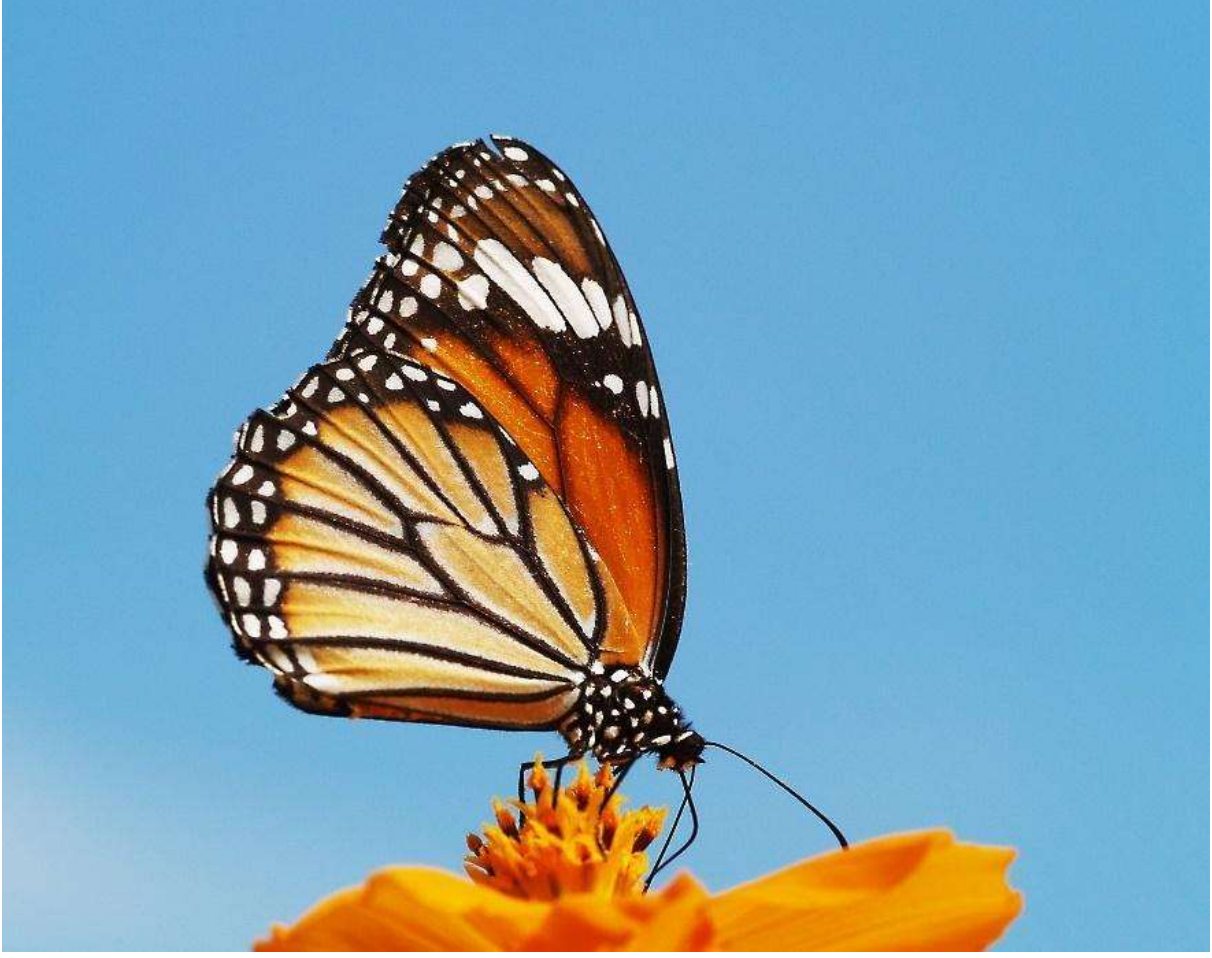
- বাংলা নামঃ উদয়াবল্লী/ কালিম
- ইংরেজি নামঃ Common Mormon
- বৈজ্ঞানিক নামঃ *Papilio polytes* (প্যাপিলিও পলিটেস)
- পরিবারঃ Papilionidae (প্যাপিলিওনিডি)
- অবস্থাঃ বহুল দৃশ্যমান।

উদয়াবল্লীর দেহের মূল রঙ কালো। ডানার উপরটা কুচকুচে কালো। সামনের ডানার নিচের প্রান্তে কয়েকটি সাদা দাগ। পিছনের ডানার প্রান্ত খাঁজকাটা ও নিচের প্রান্তে একটি করে লেজ রয়েছে। ডানার মাঝে সাদা সাদা দাগ। এছাড়াও ডানার নিচের প্রান্তে কয়েকটি বাকা চাঁদের মতো সাদা দাগ রয়েছে, যার ওপর অল্প কয়েকটি লাল দাগ দেখা যায়। ছেলে ও মেয়ে দেখতে একেবারেই আলাদা। ছেলের ডানার দাগগুলো হালকা ও অস্পষ্ট এবং মেয়ের দাগগুলো বেশ স্পষ্ট। তিন ধরনের মেয়ে প্রজাপতি দেখা যায়। পিছনের ডানায় লালচে চোখের মতো ফোঁটার সংখ্যা দিয়ে বিভিন্ন ধরনের মেয়ে প্রজাপতি আলাদা করা যায়।

লেজওয়ালা প্রজাপতির মধ্যে উদয়াবল্লী সহজেই চোখে পড়ে। এ দেশের সব এলাকায়ই এদের দেখা যায়— কি সমতলভূমি, কি পাহাড়ের ২,০০০ মিটার উচ্চতা- সবখানেই। এরা দ্রুত উড়তে পারে ও কিছুটা ঐক্যবৈক্যে ওড়ে।

বাংলাদেশ ছাড়াও ভারত, মিয়ানমার, শ্রীলঙ্কা, মালয়েশিয়া, তিমুর প্রভৃতি দেশে এদেরকে দেখা যায়।

ডোরাকাটা বাঘ



- বাংলা নামঃ ডোরাকাটা বাঘ/ বাঘ/ বাঘবান্না/ কস্তুরী শাদুল
- ইংরেজি নামঃ Striped Tiger/ Common Tiger I
- বৈজ্ঞানিক নামঃ *Danaus genutia* (ডানাউস জেনুশিয়া)
- পরিবারঃ Nymphalidae (নিম্ফালিডি)
- অবস্থাঃ সচরাচর দৃশ্যমান
ডোরাকাটা বাঘের ডানার দাগ ও রঙ অনেকটা আমাদের জাতীয় পশু রয়েল বেঙ্গল টাইগার'-এর মতো। সামনের ডানার উপরের অংশ গাঢ় কমলা-বাদামি এবং পিছনের ডানাগুলো হালকা কমলা-বাদামি। সামনের ডানার চূড়া কালো; তার নিচে তিনটি স্পষ্ট কমলা ও কতগুলো সাদা দাগ। এছাড়াও পুরো ডানার প্রান্তজুড়ে রয়েছে কালো বন্ধনী, যার ওপর দু'সারি সাদা ফোঁটা মাথা, বুক ও পেটেও কালোর উপর সাদা ফোঁটা। দেহের নিচটা উপরের মতোই, তবে হালকা। ছেলে প্রজাপতির পিছনের ডানার নিচে সাদা-কালো ফোঁটা থাকে। দেহ ও ডানার উজ্জ্বল কমলা ও কালো রঙ বেশ বিস্ময়কর। আর এই রঙ দেখেই শত্রুরা এদের ধারে কাছেও আসে না।

এ দেশের সব অঞ্চলেই এরা ব্যাপকভাবে বিস্তৃত। তবে অতি বৃষ্টিপাতপ্রবণ এলাকায় বেশি দেখা যায়। এরা পরিযায়ী স্বভাবের। সারাবছরই ঝোপ-জঙ্গল ও বাগানের ফুলে ফুলে উড়ে উড়ে রস পান করে বেড়ায়। সমুদ্রপৃষ্ঠের ২,৫০০ মিটার উঁচুতেও দেখা মেলে। এরা ধীরগতিসম্পন্ন প্রজাপতি। বাংলাদেশ ছাড়াও পুরো এশিয়া, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলো এবং ক্যানারি দ্বীপে এদের দেখা মেলে।

নীল ডোরা



- বাংলা নামঃ নীল ছোরা/ নীল কমল/ হিমলকুচি
- ইংরেজি নামঃ Blue Tiger/ Common Blue Tiger
- বৈজ্ঞানিক নামঃ *Tirumala limniace* (তিরুমালা লিমনিয়াস)
- পরিবারঃ Nymphalidae (নিম্ফালিডি)

- অবস্থাঃ সচরাচর দৃশ্যমান

নীল ডোরা দেখতে পুরোপুরি ডোরাকাটা বাঘের মতো। শুধু ডোরাকাটা বাঘের কমলা-বাদামি রঙের পরিবর্তে থাকে নীল রঙ। সামনের ডানা হালকা নীল। পিছনের ডানার এই নীল আর হালকা আর কালো শিরাগুলো বেশ মোটা ও স্পষ্ট। পেট, বুক ও মাথায় কালোর উপর যে সাদা ফোঁটা রয়েছে তা ডোরাকাটা বাঘের মতো সামনের ডানায় নেই। দেহ ও ডানার উজ্জ্বল রঙের মাধ্যমে এরাও সহজেই শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে থাকে।

এ দেশের সব এলাকায়ই নীল ডোরার দেখা মেলে। আকারে ডোরাকাটা বাঘের থেকে কিছুটা বড় হয়। এরাও পরিযায়ী স্বভাবের। তবে গভীর জঙ্গল এবং বৃষ্টিপাতহীন এলাকা এরা পছন্দ করে না। সারা বছর দেখা গেলেও বর্ষাকাল ও বর্ষার শেষেই বেশি চোখে পড়ে। ধীরগতিসম্পন্ন হলেও প্রয়োজনে বা বিরক্ত হলে দ্রুতগতিতে উড়তে পারে।

বাংলাদেশ ছাড়াও এশিয়ার অনেক দেশেই নীল ডোরার দেখা মেলে। হিমালয় পর্বতের ২,০০০ মিটার উঁচুতেও দেখা যায়।

ঝালর



- বাংলা নামঃ ঝালর/ চোরকাটা কমলা
- ইংরেজি নামঃ Leopard Lacewing
- বৈজ্ঞানিক নামঃ Cethosia Cyane(সিথোশিয়া সায়ানে)
- পরিবারঃ Nymphalidae(নিম্ফালিডি)
- অবস্থাঃ বহুল দৃশ্যমান

এ দেশের সুন্দরতম প্রজাপতিগুলোর আরেকটি প্রজাতির নাম ঝালর। এই প্রজাপতির ছেলেগুলোর ঝালরের দিকে খেয়াল না করলে হঠাৎ দেখতে ডোরাকাটা বাঘ বলে মনে হতে পারে। এদের ডানার উপরের দিকের রঙ উজ্জ্বল হলদে-বাদামি। তার উপর রয়েছে বিভিন্ন আকারের অসংখ্য কালো কালো দাগ বা ফোঁটা। উপরের ডানার দু'কিনারা কালো এবং এরপর রয়েছে সাদা দাগ। উপর ও নিচের ডানার কিনারা চেউ খেলানো ও তাতে বিধাতা অতি সুন্দর সাদা-কালো ঝালর তৈরি করে দিয়েছেন। ছেলের তুলনায় মেয়ের ডানার রঙ হালকা, বিশেষ করে নিচের ডানার রঙ। তাছাড়া কালো দাগ বা ফোঁটাগুলোও ছেলের তুলনায় বড় ও একটির সঙ্গে অন্যটি যেন মিশে গেছে। ডানাসহ দেহের নিচের দিকের রঙ অনুজ্জ্বল বাদামি।

ঝালর এ দেশের প্রায় সবখানেই দেখা যায়। তবে সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন স্থান এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সহজেই চোখে পড়ে। এরা আর্দ্র পাতাঝরা, চিরসবুজ ও আধা-চিরসবুজ বনাঞ্চল বেশি পছন্দ করে। দ্রুত উড়তে সক্ষম হলেও সাধারণত ধীরগতিতে ওড়ে।

বাংলাদেশ ছাড়াও ভারতের কোনো কোনো রাজ্য ও মিয়ানমারে এদের দেখা যায়।

হলুদ ময়ূরী



- বাংলা নামঃ হলুদ ময়ূরী/ সোনালী চক্র / স্বর্ণচক্র / কমলা শিখীপর্ণ / নয়ন
- ইংরেজি নামঃ Peacock Pansy
- বৈজ্ঞানিক নামঃ *Junonia almana* (জুনোনিয়া অ্যালমানা)
- পরিবারঃ Nymphalidae(নিম্ফালিডি)
- অবস্থাঃ বহুল দৃশ্যমান

হলুদে রঙের মাঝারি আকারের এই প্রজাপতির ডানায় ময়ূরের পালকের মতো চোখ থাকে। আর তাই এর নাম হলুদ ময়ূরী। দেহ ও ডানার উপরের দিকটা গাঢ় হলুদে-বাদামি এবং নিচের দিকটা হালকা বাদামি। পিছনের ডানা দুটি দেখতে পাতার মতো। মেয়ে প্রজাপতির ডানার উপরের রঙ হলুদ ও ছেলের ক্ষেত্রে তা বাদামি। সামনের ও পিছনের প্রতিটি ডানায় দুটি করে চক্র দেখা যায় – একটি বড় ও একটি ছোট। পিছনের ডানার বড় চক্রটি সামনের ডানার চক্রটির থেকে আকারে বড় ও তাতে দুটি করে সাদা দাগ রয়েছে, যা হলুদ ও কালো বৃত্ত দিয়ে আবৃত। এগুলো দেখতে অনেকটা চোখের মতো। সামনের ডানার উপরের দিকে গাঢ় রঙের ডোরা রয়েছে। দু'ডানার প্রান্তে বাদামি রঙের ঢেউ খেলানো।

এ দেশের প্রায় সবখানেই হলুদে ময়ূরী দেখা যায়। তবে প্রচুর বৃষ্টিপাতসম্পন্ন উন্মুক্ত এলাকা, ধানখেত ও জলার আশপাশ, ফুলের বাগান ইত্যাদি এদের পছন্দ। সমুদ্রপৃষ্ঠের ২,০০০ মিটার উঁচুতেও দেখা যায়।

বাংলাদেশ ছাড়াও হলদে ময়ূরী ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, মিয়ানমার, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, চীন, তাইওয়ান প্রভৃতি দেশে পাওয়া যায়।

কৃষ্ণ তরঙ্গ



- বাংলা নামঃ কৃষ্ণ তরঙ্গ/ মরচে পাতা
 - ইংরেজি নামঃ Common Castor
 - বৈজ্ঞানিক নামঃ Ariadne merione (অ্যারিয়াডনে মেরিওন)
 - পরিবারঃ Nymphalidae(নিম্ফানিডি)
 - অবস্থাঃ বহুল দৃশ্যমান
- কৃষ্ণ তরঙ্গ প্রজাপতির ডানা ও দেহের উপরের দিক মরিচা বাদামি ও তাতে প্রচুর আড়াআড়ি কালো চেউ খেলানো রেখা থাকে। তাই অনেকে এদেরকে মরচেপাতা নামেও ডাকে। মেয়ে প্রজাপতির ডানার চেউ খেলানো রেখাগুলো ডোরার মতো হয়ে থাকে। সামনের ডানার উপরের দিকে একটি করে সাদা ফোঁটা ও প্রান্তে

ছোট সাদা দাগ রয়েছে। পিছনের ডানার প্রান্ত ঢেউ খেলানো হতেও পারে, নাও হতে পারে। ডানা ও দেহের নিচের দিকের রঙ বেশি গাঢ় হয়।

কৃষ্ণ তরঙ্গ রেড়িজাতীয় (Castor) গাছ যেখানে আছে সেখানে থাকতে বেশি পছন্দ করে। অতি সক্রিয় এই প্রজাপতি গাছের মগডালে বিশ্রাম নিতে ভালোবাসে।

বাংলাদেশসহ নেপাল, ভুটান, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, মিয়ানমার, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ায় এই প্রজাপতি দেখা যায়।

হরতনি



- বাংলা নামঃ হরতনি / রাগ নকশী

- ইংরেজি নামঃ Common jezebel
- বৈজ্ঞানিক নামঃ *Delias eucharis* (ডেলিয়াস ইউচারিস)
- পরিবারঃ Pieridae (পাইরিডি)
- অবস্থাঃ বহুল দৃশ্যমান
সুন্দর এই প্রজাপতিটির রঙের বাহার কিন্তু এর ডানার নিচের দিকে। ডানাসহ দেহের উপরের দিকের রঙ মূলত সাদা। সামনের ডানার গোড়ার দিকের অংশ সাদা হলেও উপরের প্রান্তের বা চূড়ার অংশ হলদে। আর ডানার শিরাগুলো প্রশস্ত ও কালো। পিছনের ডানার গোড়ার দিকের অংশ উজ্জ্বল হলুদ; আর কিনারার অংশ দেখলে মনে হবে বিধাতা যেন বা সেখানে একনারি পঞ্চভূত আকারের কমলা-লাল ইট সাজিয়ে রেখেছেন। পিছনের ডানার শিরাগুলোর রঙও কালো। মেয়ে হরতনির সামনের ডানার শিরাগুলো ছেলের থেকেও প্রশস্ত। আর তাই মেয়েটিকে ছেলেটির থেকেও সুন্দর দেখায়।
হরতনি বন্যপ্রাণ এলাকার প্রজাপতি হলেও সবখানেই বাস করতে পারে। কিন্তু ঘন বন ও ঘাসবনে দেখা যায় না। সিলেট ও চট্টগ্রামের পাহাড়ি বন বাদে সবখানেই আছে। শহর-বন্দর-গ্রাম যেখানেই এদের খাদ্য সরবরাহকারী গাছ আছে, সেখানেই ফুলে ফুলে উড়ে বেড়াতে দেখা যায়। তাছাড়া পানির কাছাকাছি থাকতেও পছন্দ করে। বেশ ধীরগতিতে ও পতপত শব্দে ওড়ে।
বাংলাদেশ ছাড়াও ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও উপমহাদেশের অন্যান্য দেশে দেখা যায়।

হলুদ



- বাংলা নামঃ হলুদ / তৃণ গোধূম
- ইংরেজি নামঃ Common Grass Yellow
- বৈজ্ঞানিক নামঃ *Eurema hecabe* (ইউরিয়া হেকাবে)
- পরিবারঃ Pieridae (পাইরিডি)

- অবস্থাঃ বহুল দৃশ্যমান

গাঢ় হলুদ রঙের এই প্রজাপতিগুলো দেখতে অত্যন্ত সুন্দর। ডানাসহ এদের পুরো দেহ-ই গাঢ় হলুদ রঙে মাখানো। এই হলুদের ওপর থাকে বিভিন্ন আকারের কালো বা খয়েরি কালো ফোঁটা। সামনের ডানার উপরের দিকের কিনারায় কালো বর্ডার রয়েছে। মৌসুমভেদে এদের, বিশেষ করে ছেলেগুলোর দেহের রঙে পার্থক্য দেখা যায়। সাধারণত ভেজা মৌসুমের ছেলেগুলো বেশি উজ্জ্বল হয়। এছাড়াও আরও দুই প্রজাতির হলুদ প্রজাপতি রয়েছে। সামনের ডানার নিচের দিকের অংশের কালো ফোঁটার সংখ্যার মাধ্যমে এদের পৃথক করা যায়। ছেলে ও মেয়ে দেখতে অনেকটা একই রকম।

হলুদ প্রজাপতি অত্যন্ত সহজলভ্য। এ দেশের সবখানেই দেখা যায়। চিরসবুজ ও পাতাঝরা বন, বাগান, ঝোপঝাড়, পার্ক, শহর-বন্দর-গ্রাম সবখানেই আছে। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এরা সক্রিয় থাকে। অতিরিক্ত গরম বা প্রখর রোদের সময় পাতার নিচের দিকে ঝুলতে থাকে।

বাংলাদেশ ছাড়াও ভারত, শ্রীলঙ্কা, মিয়ানমার ও অন্যান্য অনেক দেশেই এদের দেখা যায়।



পৃথিবীতে আবিষ্কৃত প্রাণির শতকরা ৮০ ভাগ অমেরুদণ্ডী প্রাণি। আমাদের চারপাশে মাকড়সা, শামুক, ফড়িং, প্রজাপতি থেকে শুরু করে অসংখ্য প্রজাতির অমেরুদণ্ডী প্রাণি রয়েছে। অমেরুদণ্ডী প্রাণি পৃথিবীর বাস্তুতন্ত্রে সামগ্রিকভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাস্তুতন্ত্রের নানান স্তরে এদের ভূমিকা থাকায়, মানুষ অমেরুদণ্ডী প্রাণির ওপর অনেক বেশি নির্ভরশীল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মানুষ যেমন মধুর জন্যে মৌমাছির ওপর নির্ভরশীল, তেমনি মৌমাছি পরাগায়ণের জন্যেও গুরুত্বপূর্ণ। তবে বেশিরভাগ সময়ই অমেরুদণ্ডী প্রাণিদের ব্যাপারে আমাদের জানার পরিধি কম থাকায় আমরা তাদের রক্ষার্থে সচেতন হই না। প্রাণিজগতের সংখ্যাগুরু দলকে উপেক্ষা করে বাস্তুতন্ত্রে ভারসাম্য বজায় রাখা অসম্ভব। তাই আমাদের অমেরুদণ্ডী প্রাণিদের ব্যাপারে জানতে এবং তাদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে সচেতন হতে হবে।

প্রজাপতি (Butterflies)

প্রজাপতি Arthropoda পর্বের Lepidoptera বর্গের প্রাণি। Lepidoptera দ্বারা আঁশযুক্ত ডানা বোঝানো হয়। প্রজাপতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো ডানা, যা বেশিরভাগ সময় রঙিন হয়। এছাড়াও এদের বৃহৎ শৃঁড় (proboscis) যা দ্বারা এরা মধু সংগ্রহ পান করে। প্রজাপতি ডিম পাড়ে যা লার্ভায় (caterpillars) পরিণত হয়। এদের লার্ভার আকৃতি লম্বাটে সিলিন্ডারের মতো এবং কাঁটায়ুক্ত যা পরবর্তীতে প্রজাপতিতে পরিণত হয়। কোনো স্থানের বাস্তুতান্ত্রিক অবস্থা এবং জীববৈচিত্র্যের সূচক হিসেবে প্রজাপতির ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। কোনো স্থানে প্রজাপতির সংখ্যা বেশি দ্বারা বোঝা যায় সেখানে অন্যান্য আর্থ্রোপোডের সংখ্যাও বেশি এবং জীববৈচিত্র্য উন্নত।

মৌমাছি (Bees)

মৌমাছি মূলত আমাদের কাছে মধু সংগ্রহের মাধ্যম হিসেবেই বেশি পরিচিত। মৌমাছি Arthropoda পর্বের Hymenoptera বর্গের প্রাণি। মৌমাছি মধুর জন্যে পরিচিত হলেও বাস্তুতন্ত্রে এর মূল অবদান পরাগায়নের মাধ্যম হিসেবে। উদ্ভিদে পরাগায়নের মাধ্যম হলো বাতাস, ছোট পাখি কিংবা পোকা জাতীয় প্রাণি। এছাড়া স্বপরাগায়ণও ঘটে। তবে মৌমাছির ভূমিকা পরাগায়নে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। উদ্ভিদজগতে অতোপ্রতোভাবে জড়িত থাকার জন্যে আমরা কেবল মধু না, আমাদের খাদ্য এবং বেঁচে থাকার জন্যেও মৌমাছির ওপর নির্ভরশীল। তাই মৌমাছিকে বাস্তুতন্ত্রের লাইফলাইন বলা হয়।

ক্রাস্টেসিয়ান (Crustaceans)

Arthropoda পর্বের Crustacea উপপর্বের প্রাণিদের ক্রাস্টেসিয়ান বলা হয়। ক্রাস্টেসিয়ানরা জলজ খোলস আবৃত প্রাণি যেমন- চিংড়ি, কাঁকড়া, লবস্টার, ক্রেফিশ ইত্যাদি। এদের খোলস কাইটিনসমৃদ্ধ। ক্রাস্টেসিয়ানরা জলজ বাস্তুতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ প্রাণি। কারণ এরা জলজ খাদ্যশৃঙ্খলে যোগসূত্র হিসেবে ভূমিকা পালন করে। এছাড়া ক্রাস্টেসিয়ানরা খাদ্য উৎস হিসেবে অর্থনৈতিক ভাবে মানুষের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

গুবরে পোকা (Beetles)

বিটলস বা গুবরে পোকা Arthropoda পর্বের Coleoptera বর্গের অন্তর্ভুক্ত। এরা সাধারণত মৃত এবং পচনশীল গাছ থেকে খাদ্যসংগ্রহ করে। বাস্তুতন্ত্রে বিটলসের ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এরা পাখি এবং বেশ কিছু স্তন্যপায়ীদের মুখ্য খাদ্যউৎস। এছাড়াও এদের কিছু প্রজাতি পরাগায়নের সাথে জড়িত। পাশাপাশি পুষ্টির পুনর্ব্যবহারে এরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মথ (Moths)

মথ Arthropoda পর্বের Lepidoptera বর্গের প্রাণি। মথ জীববৈচিত্র্যে জন্যে দরকারি প্রাণি। এরা প্রজাপতির চেয়ে আকারে ছোট ডানাবিশিষ্ট প্রাণি। পূর্ণবয়স্ক মথ এবং এদের লার্ভারা বিভিন্ন বন্যপ্রাণি, যেমন- পোকা, মাকড়সা, পাখি, ব্যাঙ ইত্যাদি প্রাণির খাদ্য। এছাড়া এরা পরাগায়ন ঘটায় এবং পুষ্টির পুনর্ব্যবহার নিশ্চিত করে। মথেরা বেশিরভাগ সময় খাদ্যউৎস হিসেবে নির্দিষ্ট কোনো উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। মেরুদণ্ডী প্রাণির সংখ্যা অমেরুদণ্ডী প্রাণির তুলনায় অনেক কম। মেরুদণ্ডী প্রাণিদের প্রাথমিকভাবে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হলো- মাছ(Fishes), উভচর(Amphibians), সরীসৃপ (Reptiles), পাখি (Birds) এবং স্তন্যপায়ী (Mammals)। মেরুদণ্ডীদের মাঝে জলজ পরিবেশ থেকে স্থলভাগে বসবাস করতে সর্বপ্রথম সক্ষম হয় উভচরেরা। মেরুদণ্ডী প্রজাতির সংখ্যা অমেরুদণ্ডীদের তুলনায় কম হলেও বাস্তুতন্ত্রে এরা গুরুত্বপূর্ণ।



বন্যপ্রাণী বিষয়ক পরিভাষা (কনজারভেশন স্ট্যাটাস)

কোনো প্রজাতির প্রকৃতিতে অস্তিত্ব, অতিশীঘ্র এর বিলুপ্তির সম্ভাবনা আছে কি না ইত্যাদি মূলত প্রজাতির কনজারভেশন স্ট্যাটাস বা সংরক্ষণ অবস্থা দ্বারা প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ কোনো প্রজাতি এখনও প্রকৃতিতে রয়েছে কি না, এর বিলুপ্তির সম্ভাবনা কতটা ইত্যাদি কনজারভেশন স্ট্যাটাস থেকে জানা যায়। সাধারণ ভাষায় কনজারভেশন স্ট্যাটাস হলো প্রজাতির ঝুঁকি পরিমাপের মাপকাঠি। প্রজাতির কনজারভেশন স্ট্যাটাস কেবল মাত্র এর সংখ্যা দ্বারা নির্ধারিত হয় না। বরং একটি প্রজাতির সংখ্যা কতটা কমেছে বা বৃদ্ধি পেয়েছে, এর জন্মহার এবং প্রকৃতিতে এর শত্রু সংখ্যাসহ নানা কিছু বিবেচনায় কনজারভেশন স্ট্যাটাস নির্ধারণ করা হয়। International Union for Conservation of Nature (IUCN) নানাকিছু বিবেচনায় যেসব প্রজাতি ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছে কিংবা বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় তাদের বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে এবং একটি লাল তালিকা বা রেড লিস্ট প্রকাশ করে। ট্যাক্সন অনুসারে প্রাণীদের ভাগ করা হয়। উল্লেখ্য, শ্রেণিবিন্যাসের একককে ট্যাক্সন বলে (পর্ব, শ্রেণি, বর্গ ইত্যাদি)। রেড লিস্টে প্রাণীদের মূলত কিছু মানদন্ডের ভিত্তিতে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। বিশ্বব্যাপী সর্বনিম্ন উদ্বেগপূর্ণ (যারা মূলত ঝুঁকিতে নেই) থেকে বিলুপ্ত প্রাণি পর্যন্ত প্রায় নয়টি শ্রেণিতে প্রাণীদের ভাগ করা হয়েছে। আমাদের যেসব প্রজাতির রক্ষা সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিত তা আমরা রেড লিস্ট থেকে জানতে পারি। আমাদের সেসব প্রজাতি রক্ষার্থে করণীয় জানতে পারি। তবে বৈশ্বিক মানদন্ডে করা রেড লিস্ট এলাকাভিত্তিক বা দেশভিত্তিক করা রেড লিস্টের সাথে পুরোপুরি একই না। যেমন হতেই পারে একটি প্রাণি বৈশ্বিকভাবে ঝুঁকিতে নেই কিন্তু একটি নির্দিষ্ট এলাকায় প্রাণিটির অবস্থা সংকটাপন্ন। আবার বিপরীত ঘটনাও ঘটতে পারে। কোনো প্রাণি নির্দিষ্ট এলাকায় ঝুঁকিতে না থাকলেও বা বৈশ্বিকভাবে প্রাণিটি সঙ্কটাপন্ন হতে পারে। তাই বৈশ্বিক মানদন্ডে করা শ্রেণিবিভাগ কোনো এলাকাভিত্তিক শ্রেণিবিভাগের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ নাও হতে পারে। বৈশ্বিক মানদন্ডের ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রজাতিকে দশটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা সম্ভব। এগুলো হলো :

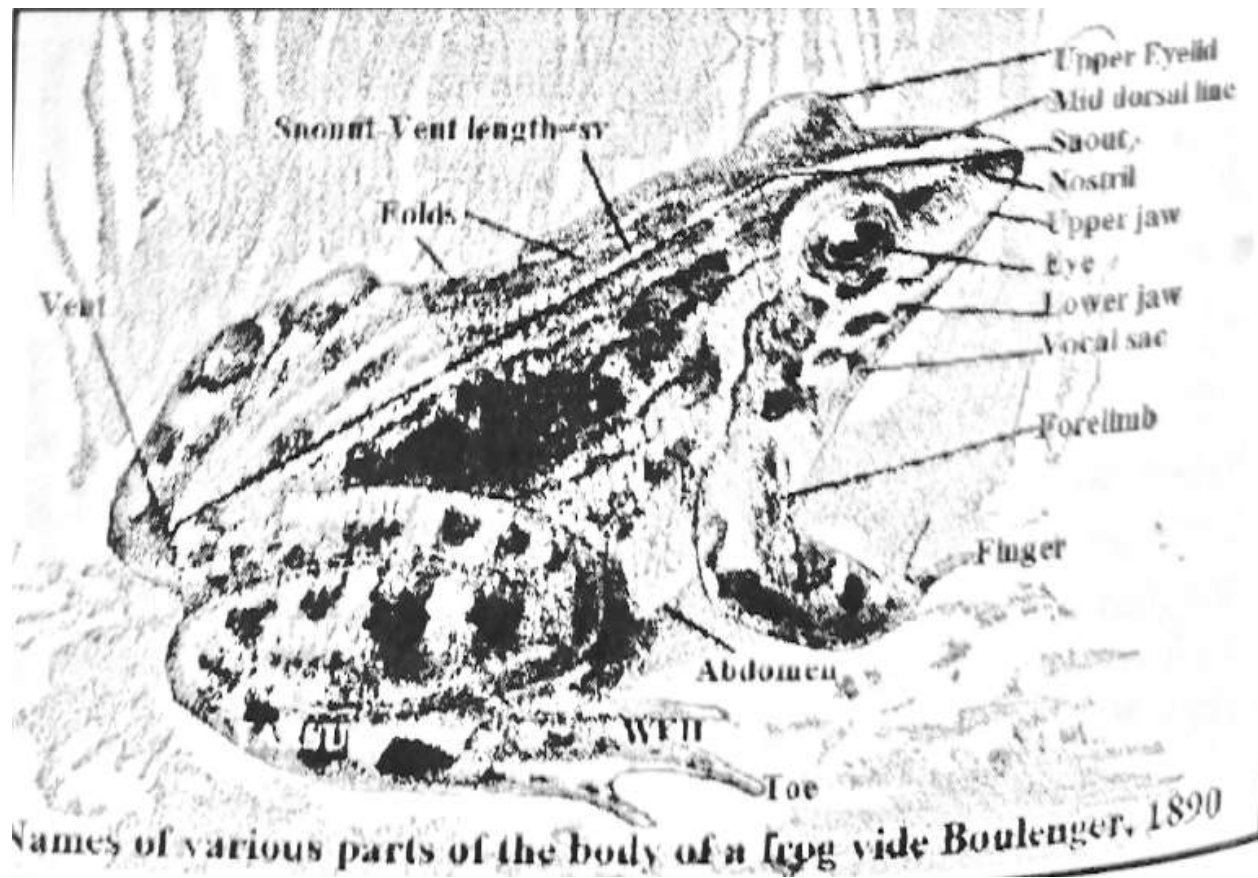
1. **Extinct (EX)** : প্রকৃতিতে যেসব প্রজাতির কোনো জীবিত প্রাণি বর্তমানে নেই।

2. **Extinct in the wild (EW)** : যেসব প্রজাতিকে হয়তো বন্দী অবস্থায় কেবল সংরক্ষণ করা হয়েছে। এসব প্রাণিকে প্রকৃতিতে তাদের সাধারণ বাসস্থানে পাওয়া যায় না।
3. **Critically endangered (CR)** : যেসব প্রাণির বিলুপ্তির সম্ভাবনা অনেক বেশি।
4. **Endangered (E)** : যেসব প্রাণির বিলুপ্তির সম্ভাবনা অনেক বেশি।
5. **Vulnerable (V)** : যেসব প্রাণির বিলুপ্তির সম্ভাবনা অনেক বেশি।
6. **Near threatened (NT)** : নিকট ভবিষ্যতে যেসব প্রাণির অস্তিত্ব বিপন্ন হবার সম্ভাবনা রয়েছে।
7. **Conservation Dependent (CD)** – ঝুঁকি কম; প্রায় হুমকির সম্মুখীন হওয়া প্রতিরোধ করার জন্য সংরক্ষণ করা হয়, কিছু বিপর্যয় এদেরকে উচ্চ ঝুঁকির স্তরে নিয়ে যেতে পারে।
8. **Least concern (LC)** : খুব কম ঝুঁকিতে রয়েছে।
9. **Data deficient (DD)** : ঝুঁকি পরিমাপের জন্য যথেষ্ট তথ্য নেই।
10. **Not evaluated (NE)** : ঝুঁকি পরিমাপ করা হয়নি।
তবে বাংলাদেশের মানদণ্ড অনুযায়ী আরও দুটি শ্রেণি Regionally Extinct (RE) এবং Not Applicable যুক্ত করা হয়েছে। তবে আমাদের মূল চিন্তা বিশেষত বিপন্ন বা ঝুঁকিপূর্ণ প্রজাতিদের নিয়ে। সেক্ষেত্রে Critically endangered (CR), Endangered (E) এবং Vulnerable (V) শ্রেণি নিয়ে আমাদের সচেতন এবং কার্যকর হওয়া উচিত।



- মূলত প্রাণীদের পরিমাপের ক্ষেত্রে সেন্টিমিটার ব্যবহৃত হয়। যদি প্রাণি আকারে বড় হয় সেক্ষেত্রে মিটারে পরিমাপ করা হয়।
- ম্যাক্রো মেজারমেন্টের জন্য মিলিমিটার ব্যবহার করা হয় এবং breadth and shoulder height মাপার জন্যেও।
- এমন কিছু ক্ষেত্র হলো –
 1. CI : কচ্ছপের (turtle and tortoise) ডর্সাল কভারিং অথবা ক্যারাপেস (carapace) দীর্ঘ যা গলার অগ্রভাগের ডগা থেকে লেজের শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত।
 2. Hb (head to body) to sv(snout to vent) : মাথা এবং শরীর থেকে sonut and vent যা পরিমাপ করা হয় sonut-এর ডগা হতে লেজবিশিষ্ট প্রাণির লেজের তলা পর্যন্ত এবং লেজহীন প্রাণির (যেমন- ব্যাঙ, frog and toad) ক্ষেত্রে vent পর্যন্ত।
 3. Df (dorsal fin) : ডর্সাল পাখনা,
 4. Pf (pectoral fin) : পেক্টোরাল পাখনা,
 5. tf : tail fluke of marine mammals,
 6. tl (tail length) : লেজের দৈর্ঘ্য আগা থেকে ডগা পর্যন্ত,
 7. TIL or TI (total length) : সার্বিক দৈর্ঘ্য পরিমাপ করা হয় sonut এর ডগা হতে লেজের ডগা পর্যন্ত, লেজহীন প্রাণির ক্ষেত্রে শরীর, vent বা পায়ু পর্যন্ত পরিমাপ করা হয়।

এছাড়া ভর বা ওজন পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত একক হলো কিলোগ্রাম (kg), গ্রাম (gm) এবং মিলিগ্রাম (mg)।





বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের কৌশল

STRATEGIES FOR WILDLIFE CONSERVATION

প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট নানা কারণে বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল যেমন হ্রাস পাচ্ছে, তেমনি বিভিন্ন প্রজাতি বিলুপ্তির দিকেও ধাবিত হচ্ছে। বন্যপ্রাণী যাতে হারিয়ে না যায়, পরিবেশের ভারসাম্য যাতে বজায় থাকে সে কারণে সকল বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। পুরো পৃথিবীতে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করা হয়। আমরা এই নিবন্ধে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের বিভিন্ন কৌশল নিয়ে আলোচনা করবো।

1.1 আবাসস্থল সংরক্ষণ, পুনঃপ্রতিষ্ঠা, সমৃদ্ধকরণ

বন্যপ্রাণী যেসব প্রাকৃতিক অঞ্চলে বসবাস করে, সেই আবাসস্থল রক্ষা করার মাধ্যমে প্রজাতিসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়। আবাসস্থলকে বন্যপ্রাণীর বিচরণের জন্য উপযুক্ত রাখা বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের সবচেয়ে পুরনো ও কার্যকর কৌশল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আমাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে, কী করে আমরা বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল সংরক্ষণ করতে পারি। এটি করার অনেক উপায় থাকতে পারে, যেমন – বন্যপ্রাণীর আবাসস্থলে মানুষের কার্যকলাপ সীমিত করে দেয়া, প্রাকৃতিক বনে এমন কিছু করা থেকে বিরত থাকা যাতে বন্যপ্রাণীর চলাচলে বিঘ্ন না ঘটে। আবার কোন অঞ্চলকে রক্ষিত এলাকা গড়ে তোলার মাধ্যমে সহজেই আবাসস্থল সংরক্ষণ করা যায়। বিভিন্ন বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল, দৈনন্দিন জীবন-যাপনের প্রয়োজনীয় স্থান (যেমন: খাদ্য খোঁজার জায়গা, শিকারি থেকে লুকানোর জায়গা, প্রজননের জায়গা, পরিযায়ী প্রাণীর চলাচলের অঞ্চল) ও বিভিন্ন বন্যপ্রাণীর হটস্পট চিহ্নিত করে সেই স্থানগুলোকে সংরক্ষিত বনাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত করে সেখানে বন্যপ্রাণীর শিকার ও আহরণ বন্ধ করা আবাসস্থল সংরক্ষণের মূল কার্যক্রম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। প্রাকৃতিক আবাসস্থলগুলো প্রায়শই বন উজাড়, দূষণ বা নগর উন্নয়নের মতো মানুষের কার্যকলাপের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়ে যায়। এসব আবাসস্থল পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য স্থানীয় গাছপালা প্রতিস্থাপন থেকে শুরু করে দেশীয় প্রজাতির পুনঃপ্রবর্তন করা যেতে পারে। আবাসস্থল পুনঃপ্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্যই হল আবাসস্থলকে এমন ভাবে পুনরুদ্ধার করা যাতে এটি অতীত অবস্থার মত প্রজাতিসমূহের জন্য নিরাপদ বিচরণক্ষেত্র হিসেবে গৃহীত হয়।

অপরদিকে বন্যপ্রাণী সংরক্ষনের আরেকটি কৌশল হলো প্রাণীদের আবাসস্থলে কৃতিমভাবে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা। যেমন- ভৌত কাঠামোর সংযোজন, খাদ্য সম্পদের ব্যবস্থা করা, পুকুর বা তৃণভূমির মতো বৈশিষ্ট্য তৈরি করা। এই পদ্ধতি আবাসস্থল সমৃদ্ধিকরণ হিসেবে পরিচিত।

1.2 রক্ষিত এলাকাসমূহ

বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ অনুযায়ী দেশে সরকার ঘোষিত সকল অভয়ারণ্য, জাতীয় উদ্যান, কমিউনিটি কনজারভেশন এলাকা, সাফারী পার্ক, ইকোপার্ক, উদ্ভিদ উদ্যান, বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা জাতীয় ঐতিহ্য ও কুঞ্জবনকে রক্ষিত এলাকা বলা হয়। বন বিভাগের ব্যবস্থাপনায় আমাদের দেশে রক্ষিত এলাকার সংখ্যা (Terrestrial & Marine) ৫৩ টি এবং পরিমাণ ৮,১৭,৯৭১.৬১৩ হেক্টর। এর মাঝে রয়েছে ১৯টি জাতীয় উদ্যান, ২৫টি অভয়ারণ্য, ২টি বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা, ৪ টি ইকোপার্ক, ২টি সামুদ্রিক রক্ষিত এলাকা, ১টি উদ্ভিদ উদ্যান রয়েছে। তালিকা দেখা যাবে এই লিংক

থেকে: <https://shorturl.at/bdxJZ>।

মৎস্য অধিদপ্তরের ব্যবস্থাপনায় নিঝুম দ্বীপ ও কক্সবাজার উপকূলের কিছু অংশকে মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়া ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশের পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) অনুসারে ১৩টি এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area – ECA) হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

এই লিংক থেকে তালিকা দেখা যাবে: <https://shorturl.at/almO1>।

এসব রক্ষিত এলাকাসমূহ উদ্ভিদ, প্রাণীজগত এবং তাদের আবাসস্থল সহ প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণ ও সুরক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই অঞ্চলগুলি জীববৈচিত্র্য এবং পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা ও বিভিন্ন প্রজাতির বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য।

রক্ষিত এলাকাগুলি মানব ক্রিয়াকলাপ যেমন বন উজাড়, খনন এবং কৃষির বিরুদ্ধে একটি বাফার জোন হিসাবে কাজ করে যা পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। কাজেই এসব অঞ্চলের জন্য সঠিক ও কার্যকর ব্যবস্থাপনা দরকার। পরিবেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ জীববৈচিত্রে সমৃদ্ধ অঞ্চল এলাকা চিহ্নিত করে আমাদের আরো রক্ষিত এলাকা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।



ছবি: বাংলাদেশের রক্ষিত এলাকাসমূহ (সূত্র: বন অধিদপ্তর)

1.3 বন্যপ্রাণীর করিডোর ও ফ্লাইওয়ে



বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ অনুসারে, রক্ষিত বা সংরক্ষিত বনের সীমানা সংলগ্ন কিন্তু বন্যপ্রাণী চলাচলের উপযোগী কোন এলাকাকে বন্যপ্রাণী করিডোর হিসেবে ঘোষণা দেয়ার বিধান রয়েছে। কোনো এলাকাকে বন্যপ্রাণী করিডোর ঘোষণার উদ্দেশ্য হলো উক্ত এলাকার যে কোনো ধরনের ক্ষয়ক্ষতি কমানো বা নিয়ন্ত্রণ করা, এবং বন্যপ্রাণীর নির্বিঘ্ন চলাচল নিশ্চিত করা। এটি মূলত একটি ল্যান্ডস্কেপ জোন বা করিডোর।

অনেক সময় মানুষের অনুপ্রবেশের জন্য বনভূমি একাধিক খন্ডে বিভক্ত হয়ে পড়ে। যার কারণে বন্যপ্রাণীরা আলাদা হয়ে যায় ও নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করতে পারে না। তখন পাশাপাশি অংশকে একটা রাস্তা/ব্রিজ/সেতু দিয়ে সংযুক্ত করা হয় যাতে বন্যপ্রাণীরা স্বাচ্ছন্দ্যে চলাচল করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় হাতির জন্য আন্ডারপাস বা ওভারপাস বানানো, বানরগোষ্ঠীয় প্রাণীদের জন্য বিভক্ত বনের দুই খন্ডের দুইটা গাছের সাথে দড়ি বেঁধে দেওয়া। এতে বন্যপ্রাণী কানেক্টিভিটি সৃষ্টি হয়। যেমন- সাতছড়ি ন্যাশনাল পার্কের রোপ ক্যানোপি ব্রিজ, দোহাজারী – কক্সবাজার রেললাইনের দু'পাশে চুনাতি অভয়ারণ্যের হাতি চলাচলের জন্য ওভারপাস নির্মাণ।

শীতকালে আমাদের দেশে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী পাখির আগমন ঘটে। এসব পাখি বাংলাদেশের জলাভূমি তাঁদের বিচরণ ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করে। যে ভৌগোলিক পথে পরিযায়ী পাখিরা প্রতি বছর একে দেশ থেকে অন্য দেশে নিয়মিত ভাবে উড়ে যেতে থাকে, সেই উড়ন্ত পথকে ফ্লাইওয়ে (Flyway) বলা হয়। পৃথিবীতে মোট ৯ টি ফ্লাইওয়ে নেটওয়ার্ক রয়েছে, এর মধ্যে বাংলাদেশ দুইটি ফ্লাইওয়ে নেটওয়ার্কের অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে ইস্ট এশিয়ান – অস্ট্রেলেশিয়ান ফ্লাইওয়ে পার্টনারশিপের আওতায় বাংলাদেশের ৬টি এলাকাকে ফ্লাইওয়ে সাইট ঘোষণা করা হয়। এগুলো হলো: টাঙ্গুয়ার হাওর, হাকালুকি হাওর, হাইল হাওর, সোনাদিয়া, নিঝুপ দ্বীপ ও গাওগুরার চর।

ছবি: পরিযায়ী পাখির ফ্লাইওয়ে ম্যাপ

1.4 প্রজাতি ভিত্তিক সংরক্ষণ

বিপদাপন্ন (Threatened) ও প্রায় বিপদাপন্ন (Near Threatened) প্রজাতিগুলো চিহ্নিত করে সেগুলো রক্ষায় নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ এর তফসিল ১ ও ২ এ রক্ষিত বন্যপ্রাণী এবং তফসিল ৪ এ রক্ষিত উদ্ভিদের তালিকা সংযুক্ত করা হয়েছে। উক্ত আইনের আওতায় প্রণীত বিধিমালায় আলোকে লাইসেন্স, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পারমিট ব্যতীত কোন বন্যপ্রাণী শিকার করা যাবে না। রক্ষিত বন্যপ্রাণী ঘোষণা বনাঞ্চল ও বনাঞ্চলের বাইরে সারাদেশে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

ইন-সিটু সংরক্ষণ বলতে বন্যপ্রাণী প্রাকৃতিক আবাসস্থলের মধ্যে প্রজাতির সুরক্ষা করা বোঝায়। এই পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক নিয়মে জীব প্রজাতি যেখানে জন্মে সেখানেই সংরক্ষণ করা হয়। এটি সংরক্ষিত এলাকা সম্প্রসারণের মাধ্যমে, যেমন- বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ, জাতীয় উদ্যান এবং বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য স্থাপনের মাধ্যমে অর্জন করা হয়। ইন-সিটু সংরক্ষণের প্রাথমিক লক্ষ্য হল বন্যপ্রাণীদের তাদের প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে বজায় রাখা এবং পুনরুদ্ধার করা। বাংলাদেশে বন্যপ্রাণীর রক্ষার জন্য ৫৩টি রক্ষিত এলাকা রয়েছে, এছাড়াও ১টি বিশ্ব ঐতিহ্য এলাকা, ২ টি রামসার সাইট ইন-সিটু সংরক্ষণের উদাহরণ।

অন্যদিকে এক্স-সিটু সংরক্ষণ তাদের প্রাকৃতিক আবাসস্থলের বাইরে জৈবিক বৈচিত্র্য সংরক্ষণের সাথে জড়িত। এর মধ্যে জুলজিক্যাল পার্ক, বোটানিক্যাল গার্ডেন, ওয়াইল্ডলাইফ সাফারি পার্ক এবং জিন ব্যাংক অন্তর্ভুক্ত। চিড়িয়াখানা ও বোটানিক্যাল গার্ডেন এক্স-সিটু সংরক্ষণের সবচেয়ে প্রাচীনতম পদ্ধতি। বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক এক্স-সিটু সংরক্ষণের উদাহরণ।

1.5 জিনগত বৈচিত্র্যের সংরক্ষণ

জিনগত বৈচিত্র্য হলো একটি প্রজাতি থেকে অন্য প্রজাতির মধ্যে প্রাপ্ত জিনের সব রকমের পার্থক্য। আবার একটি প্রজাতির মধ্যে বিভিন্ন ধরনের জেনেটিক বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে। এই সব বৈশিষ্ট্য প্রজাতির টিকে থাকা, অভিযোজন এবং বিবর্তনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। বিজ্ঞানীরা এই জিনগত বৈচিত্র্যকে কাজে লাগিয়ে জীববৈচিত্র্য রক্ষা করেন। জেনেটিক বৈশিষ্ট্যের এ সুরক্ষার ব্যবস্থা এক প্রকার বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কৌশল হিসেবে পরিচিত। বৈচিত্র্যপূর্ণ উদ্ভিদ, প্রাণী, অণুজীব ও অমেরুদণ্ডী প্রাণীরা পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে দ্রুত মানিয়ে নিতে ও বেঁচে থাকতে সক্ষম। তাই মানব কল্যাণে ব্যবহার এবং ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এই বৈচিত্র্য সংরক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইতোমধ্যে বিশ্বের প্রায় সকল দেশ তাদের জেনেটিক সম্পদসমূহ কোন নির্দিষ্ট জেনেটিক সম্পদের প্রকৃত পরিবেশে (*in situ*) এবং/বা কৃত্রিম পরিবেশে (*ex situ*) যেমন, জীন ব্যাংকে সংরক্ষণ শুরু করেছে।

বাংলাদেশে উদ্ভিদ, প্রাণী, মৎস্য, অণুজীব, কীটপতঙ্গ, অমেরুদণ্ডী প্রাণী, বনজ, ইত্যাদি জেনেটিক রিসোর্সেস সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য রয়েছে। একবার কোন প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে গেলে তাদের জিনপুল চিরতরে হারিয়ে যাবে। আমাদের দেশে বর্তমানে জাতীয় জিন ব্যাংক স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ফ্রোজেন জু (Frozen Zoo) রয়েছে।



২০২২ সালে বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবসের প্রতিপাদ্য ছিলো, 'বিপন্ন বন্যপ্রাণী রক্ষা করি, প্রতিবেশ পুনরুদ্ধারে এগিয়ে আসি'। অর্থাৎ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ করলে শুধু যে প্রজাতিসমূহ সংখ্যায় বৃদ্ধি পাবে তা না, বরং তা আমাদের প্রতিবেশ পুনরুদ্ধারেও ভূমিকা রাখবে। বাংলাদেশ সরকার বন, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণকে নানাভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছে। তবে বিভিন্ন সময় সংশ্লিষ্ট বিভাগকে প্রায়ই নানা প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হয়। অবৈধভাবে বনভূমি দখল, নগরায়ণ, শিল্পায়ন, ব্যক্তি বা সরকারী মালিকানাধীন পাহাড় কেটে ভূমিরূপ পরিবর্তনের ফলে আশংকাজনক হারে বন ও বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল হুমকির সম্মুখীন হয়। যত দিন যাচ্ছে, বন ও জলাভূমির পরিমাণ আশংকাজনক হারে কমছে। বন্যপ্রাণীর আবাসস্থলের পরিমাণ যত কমছে, খাদ্যসংকট, আশ্রয়সংকট ও অন্যান্য কারণে তত কমছে বন্যপ্রাণীর সংখ্যাও। আবাসস্থলে খাদ্যের প্রাচুর্যতা কমে যাওয়ায় দিশাহীন হয়ে পড়ছে ওরা, টিকিয়ে রাখতে হিমশিম খাচ্ছে নিজেদের। এছাড়াও পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে হচ্ছে বর্ধিত পরিমাণ প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যার কারণে বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, মারা পড়ছে অসংখ্য বন্যপ্রাণী। তদুপরি খাদ্যসংকটে লোকালয়ে চলে আসছে অনেক প্রজাতির প্রাণী, বাড়ছে মানুষের সাথে সংঘাত। পাশাপাশি মানুষের সীমাহীন লোভ লালসার কারণে শিকারে পরিণত হচ্ছে। এভাবে অসচেতনতা, হিংস্রতা, বুভুক্ষা ইত্যাদি কারণে মানুষের হাতে প্রতিনিয়ত মারা পড়ছে অনেক প্রাণী। এর ফলে কোনো বন্যপ্রাণী বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে, কেউ রয়েছে বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে। আমরা এই নিবন্ধে বন্যপ্রাণীর জন্য যেসব হুমকি রয়েছে, যেমন – আবাসস্থল কমে যাওয়া, পরিবেশ দূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন, অবৈধ শিকারসহ নানা প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট কারণ আলোচনা করবো।

5.1 বন্যপ্রাণীর আবাসস্থলের অতীত ও বর্তমান অবস্থা

5.1.1 বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল কমে যাওয়া

গত পাঁচ দশকে, বাংলাদেশ তার বনভূমির দুই-তৃতীয়াংশ হারিয়েছে। যার প্রত্যক্ষ নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে বন্যপ্রাণীর আবাসস্থলের উপর। বন ছাড়াও সমুদ্র, নদী-নালা, খাল-বিল, হাওড়-বাওড়, বাড়ির পাশের ঝোপ-ঝাড় অর্থাৎ আমাদের গ্রামীণ পরিবেশের সর্বত্র কোনো না কোনো বন্যপ্রাণীর আবাস। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে

সাথে বাসস্থানের বাড়তি চাহিদা পূরণ করতে হচ্ছে বন্যপ্রাণী আবাসস্থল নিধন বা সংকোচনের মাধ্যমে। অধিকতর প্রাকৃতিক বিপর্যয়, জলবায়ু পরিবর্তন, শিল্পায়ন, নগরায়ন তথা অপরিবর্তিত উন্নয়ন ছাড়াও আর্থিক লাভের আশায় সৃজিত বাগান (সেগুন, রাবার, চা), এবং পাহাড়ে অনিয়ন্ত্রিত জুমচাষ, অপরিবর্তিত হটিকালচার সম্প্রসারণকে বন নিধন তথা বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল কমে যাওয়ার অন্যতম কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়।

5.1.2 বন ও জলাভূমি হ্রাস

কোন বন বা জলাভূমির পরিমাণ প্রাকৃতিক কিংবা মানবসৃষ্ট কারণে কমে গেলে তাকে উজাড় (হ্রাস) বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ, কক্সবাজার জেলায় সংরক্ষিত বনভূমিতে বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিক (রোহিঙ্গা) কর্তৃক বসতি স্থাপন, বিপুল পরিমাণ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জ্বালানির চাহিদা মেটাতে বনভূমি থেকে জ্বালানী সংগ্রহ, পাহাড় কেটে ফেলে মাটি বিক্রি করা, অবৈধভাবে কাঠ ও বনদ্রব্যাদি পাচার, স্থানীয় প্রভাবশালী ও কুচক্রীমহল কর্তৃক রোহিঙ্গাদের বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড যেমন বনভূমি জবরদখল ও অবৈধভাবে বনের গাছ কাটা ও পাচারের কাজে শ্রমিক হিসেবে ব্যবহার করা, স্বল্প জায়গায় বিপুল পরিমাণ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর গণস্বাস্থ্য, পয়ঃনিষ্কাশন ইত্যাদি কাজের কারণে পরিবেশের ক্ষতি হওয়া। এসকল কারণে প্রায় ২ হাজার একর সৃজিত বন ও চার হাজার একর প্রাকৃতিক বন ধ্বংস হয়ে যায়। এছাড়াও বিভিন্ন এনজিও ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের রোহিঙ্গা সম্পর্কিত কার্যক্রম পরিচালনায় বিভিন্ন স্থায়ী-অস্থায়ী ক্যাম্প নির্মাণের কারণে প্রতিনিয়ত পাহাড় ও বনভূমি কাটা পড়ছে।

এছাড়াও, বিভিন্ন জলাভূমি ভরাট করে বসতবাড়ি নির্মাণ করা হচ্ছে। বিভিন্ন জলাভূমি নদী, খাল ইত্যাদির পাড় ধরে কলকারখানা, রেস্টুরেন্ট, বস্তি ইত্যাদি স্থাপনের মাধ্যমে ক্রমশ সংকুচিত করে ফেলা হচ্ছে জলাভূমিগুলোকে। অনেক জায়গায় বিস্তীর্ণ জলাভূমি দখল করে গড়ে উঠছে আবাসিক প্রকল্প। হাওড়ের বিভিন্ন অংশ দখল করে ফিশারি বানানো হচ্ছে। প্লাস্টিক, পচনশীল ও অন্যান্য অপচনশীল আবর্জনা ফেলার কারণেও ভরাট হয়ে যাচ্ছে জলাভূমিগুলো, পানির স্বাভাবিক গতিপথ বাঁধাপ্রাপ্ত হচ্ছে, যে কারণে ভাটির দিকে শুকিয়ে যাচ্ছে নদী ও খালগুলো।

জলবায়ু পরিবর্তন, দূষণ ও মানুষের ক্ষতিকর কর্মকাণ্ডের কারণে বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল হুমকির মুখে পড়েছে। এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো প্রাকৃতিক বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান সুন্দরবন। এসকল কারণ ছাড়াও নদী-ভাঙ্গনের ফলে দিনের পর দিন বিলীন হচ্ছে নদীপাড়ের বনের অংশ।

5.1.3 বন ও জলাভূমির অবক্ষয়

বন ও জলাভূমির কোন অংশ যদি কোনো কারণে বন্যপ্রাণীর বসবাসের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে তাহলে তা অবক্ষয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। বিভিন্ন কারণে বন ও জলাভূমির অবক্ষয় হতে পারে। বনে অবৈধভাবে গাছ কাটার ফলে বনের গাছগুলোর ঘনত্ব কমে যাচ্ছে। বন ও জলাভূমির জীববৈচিত্র্য হ্রাস পাচ্ছে। পাশাপাশি, বন ও জলাভূমি বাস্তুতন্ত্রকে যেসব সেবা প্রদান করতো, যেমনঃ অক্সিজেন প্রদান, খাদ্যদ্রব্যের যোগান ইত্যাদি, সেগুলোও হ্রাস পাচ্ছে। এভাবে অবক্ষয় ঘটছে বন্যপ্রাণীর আবাসস্থলের।

এছাড়াও জলাভূমিতে ঘের দিয়ে বা বাঁধ দিয়ে চিংড়ির ঘের, ফিশারি ও অন্যান্য কার্যক্রম করছে লোভী দখলদারেরা। মাছ শিকারের জন্য বিষ প্রয়োগ ও অন্যান্য ক্ষতিকর পদার্থ অবলম্বনের কারণেও জলাভূমির অবক্ষয় ঘটছে।

5.1.4 বন খণ্ডায়ন

বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল কমে যাওয়ার পাশাপাশি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বনের খণ্ডতা বা Fragmentation, অর্থাৎ একটি বড় বনকে কোনো কারণে খণ্ড খণ্ড অংশে বিভক্ত করে ফেলা যার এক অংশের সাথে আরেক অংশের কোনো যোগাযোগ নেই। ধরো, তোমার জেলায় একটি অনেক বড় শালবন আছে, সেখানে অনেক ধরনের প্রাণী বাস করে। এবার, সেই বনের ভিতর দিয়ে রাস্তা বানানো হলো, রাস্তার দুইপাশে বাজার হলো, ধীরে ধীরে মানুষের বসতি বাড়তে থাকলো। এতে করে কী হলো? বনটি দুইভাগে ভাগ হয়ে গেল। একভাগের প্রাণীরা আর অন্যভাগে যেতে পারছে না বাজার ও ব্যস্ত রাস্তা থাকার কারণে। ফলে বনের প্রাণীদের বিচরণের জায়গাও অর্ধেক হয়ে গেল, এদের চলাচল ও খাদ্য সংগ্রহের স্থানও সংকুচিত হয়ে পড়লো। পরিণামে ধীরে ধীরে এদের সংখ্যা কমতে শুরু করবে, এমনকি ছোট বনের ছোট দল হওয়ায় এদের অভিযোজন ক্ষমতাও হ্রাস পেতে থাকবে এবং এভাবে কমতে কমতে একসময় হয়তো দলটি বিলুপ্তই হয়ে

যাবে ঐ বন থেকে। অথচ পুরো বন একসাথে থাকলে, এদের দলের সংখ্যা আরও বড় থাকলে (যেমনটি শুরুতে ছিল) এরা হয়তো বিলুপ্ত হতো না।

5.1.5 অন্যান্য

প্রায়ই জেলেদের জালে অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু প্রাণী ধরা পড়ে। জেলেদের প্রধান উদ্দেশ্য থাকে মাছ ধরা, মাছ ধরতে গিয়ে এসব প্রাণী জালে আটকে গেলে এসব প্রাণীরও ক্ষতিসাধন হয়। অবমুক্ত করে জলে ফিরিয়ে দেওয়ার আগেই প্রাণীটি মারা যায়, অথবা জালে আটকে গিয়ে প্রাণীটি মারাত্মকভাবে আহত হয়, অথবা জেলেরা প্রাণীটাকে আর জলে ফিরিয়ে দেন না, বাজারে সুলভমূল্যে বিক্রি করে দেন, অথবা কোথাও ফেলে রাখেন যেখানে প্রাণীটি মারা যায়। কাছিম, করাত মাছ, বিভিন্ন প্রকার হাঙ্গর, শাপলাপাতা ও অন্যান্য প্রাণী ধরা পড়ছে জেলেদের জালে, যার কোন সঠিক পরিসংখ্যান জানা যায়নি। অবশ্য জেলেদের মতে আমাদের জলসীমানায় হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছ আর আগের মত আর ধরা পড়ছেনা। এর অর্থ হলো, তাদের সংখ্যা উল্লেখজনক হারে হ্রাস পেয়েছে।

বিভিন্ন খাল-বিল, নদী ও জলাশয়ে চায়না ম্যাজিক ও কারেন্ট জালের অবাধ ব্যবহার চলছে। বিভিন্ন ধরনের জাল বিভিন্ন ধরনের জলাভূমির প্রাণীদের জন্য ক্ষতিকর। এজন্য সব জলাভূমিতে সব ধরনের জাল দিয়ে মাছ ধরার অনুমতি দেওয়া হয়না। তবুও অবৈধভাবে বিভিন্ন নিষিদ্ধ জাল দিয়ে মাছ শিকার চলছেই। এতে যেসব প্রাণীর ধরা পড়ার কথা না, জালে আটকে ধরা পড়ছে তারাও। নিধন হচ্ছে দেশীয় মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী। এছাড়াও প্রতিনিয়ত মারা পড়ছে বিভিন্ন প্রজাতির ডিমওয়ালা মাছ। মারা পড়ছে বিভিন্ন মাছের পোনাও। ব্যাঙ, সাপ, কচ্ছপ, শামুকসহ বিভিন্ন প্রজাতির জলজ প্রাণীও মারা পড়ছে। ফলে হুমকিতে পড়ছে তাদের জীবনচক্র, হারিয়ে যাচ্ছে জীববৈচিত্র্য। এসব জাল ব্যবহারের কারণে মুক্ত জলাশয়ের মাছ শেষের পথে, এখন আর আগের মতো মাছ দেখা যায় না। আশংকাজনক হারে কমে গিয়েছে অন্যান্য জলজ প্রাণীও।

5.2 আবাসস্থল হারিয়ে যাওয়ার ফলাফল

5.2.1 খাদ্য ও পানির সংকট

বনভূমি সংকুচিত হওয়ার ফলে বন্যপ্রাণীদের খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে, ফলদ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় গাছপালা নির্বিচারে উজাড় করে ফেলা হচ্ছে। একেক ধরনের প্রাণী একেক ধরনের গাছের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল থাকে খাদ্যসংগ্রহ বা আশ্রয়ের জন্য। সেই গাছগুলো কেটে ফেলা হলে তার উপর নির্ভরশীল প্রাণী, যারা প্রথম শ্রেণির খাদক, তারা হয় খাদ্যাভাবে বিলুপ্ত হয়ে যায় নয়তো লোকালয়ে চলে এসে মারা পড়ে। এবার, তাদের বিলুপ্তির কারণে তাদের উপর নির্ভরশীল দ্বিতীয় শ্রেণির প্রাণীদেরও একই পরিণতি বরণ করতে হয় এবং এই ধারা চলতেই থাকে। এছাড়াও গাছ কাটার ফলে মাটির পানিধারণ ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। ফলে শীতের মৌসুমে দ্রুতই শুকিয়ে যাচ্ছে জলাধারগুলো। লাউয়াছড়াসহ অন্যান্য বন বিশেষতঃ পার্বত্য বনভূমিতে ঝিরিগুলো শীতের শুরুতেই শুকিয়ে যাচ্ছে। চরম পানিসংকটে পড়ছে উক্ত এলাকার বন্যপ্রাণী।

5.2.2 আশ্রয়ের সংকট

আবাসস্থলের পরিমাণ কমে যাওয়ায় ও বনগুলোতে গাছের ঘনত্ব কমে যাওয়ায় আশ্রয়ের সংকটে পড়ছে বন্যপ্রাণীরা। সম্মুখ বিপদ, মানুষ ও অন্যান্য হুমকি থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে নিজেদের আড়াল করতে পারছে না প্রাণীরা। তাদের লুকানোর স্থানগুলো ও আশ্রয়স্থলগুলো বিভিন্ন কারনে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, ফলে বন্যপ্রাণীরা বিপদ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারছে না, বারবার উন্মুক্ত হয়ে পড়ছে।

5.2.3 চলাচলের সংকট

তোমরা অনেকেই জানো যে হাতি কখনোই এক জায়গায় বসবাস করে না, একটি হাতির দলের যে পরিমাণ খাবারের প্রয়োজন হয়, তার যোগান নিশ্চিত করতে ও অন্যান্য কারণে তারা এক বনভূমি থেকে অন্য বনভূমিতে যাতায়াত করে। এই পথগুলো সাধারণত রক্ষিত এলাকার সীমান্তবর্তী এলাকায় হয়ে থাকে। মানুষের নানাবিধ কর্মকাণ্ড ও স্থাপনার ফলে এই যাতায়াতের পথ ও করিডোরগুলো সংকুচিত হয়ে পড়ছে। মূলতঃ উখিয়া, টেকনাফ ও রামু উপজেলার বনভূমিতে এরা বসবাস করলেও পানেরছড়া-রাজারকুল এবং বালুখালী-ঘুনধুম করিডোর দিয়ে এরা বান্দরবান ও মায়ানমারে চলাচল করত। সরকারী বেসরকারী স্থাপনা নির্মাণ এবং রোহিঙ্গা আশ্রয়কেন্দ্রের ফলে এই দুইটি করিডোরসহ অন্যান্য করিডোরগুলোর কয়েকটি সংকুচিত হয়ে

পড়েছে, কয়েকটি বন্ধ হয়ে পড়েছে। পরিণামে হাতির পাল ক্রমেই ক্ষুদ্র জায়গায় আবদ্ধ হয়ে পড়েছে, তাদের খাবারের অভাব দেখা দিচ্ছে, প্রজনন ব্যাহত হচ্ছে। অন্যান্য বন্যপ্রাণীদের ক্ষেত্রেও একই ধরনের সমস্যা দেখা দিচ্ছে।

5.2.4 মানুষ-বন্যপ্রাণী সংঘাত

আবাসস্থল সংকোচন ও অবক্ষয়ের কারণে বন্যপ্রাণীরা ক্রমেই ক্ষুদ্র জায়গায় আবদ্ধ হয়ে পড়েছে, তাদের খাবারের অভাব দেখা দিচ্ছে, প্রজনন ব্যাহত হচ্ছে। হাতির দল বনভূমি ছেড়ে লোকালয়ের দিকে চলে আসছে, হাতি ও মানুষের মধ্যকার সংঘর্ষ বেড়েই চলেছে। হাতির আক্রমণে মানুষ মরছে, নয়তো মানুষের আক্রমণে হাতি। ২০২১-২২ সালে মানুষ ও বন্যপ্রাণীর দ্বন্দ্ব ১৩টি হাতি মারা যায়। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে খাদ্য ও পানির সন্ধানে লোকালয়ে চলে আসছে মায়া হরিণ, শূকর, বানর, হনুমান, সজারু, বনরুইসহ বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী। ময়মনসিংহের রসুলপুর ও টাঙ্গাইলের মধুপুর বনাঞ্চলে খাদ্যের সংকটে লোকালয়ে বানর, হনুমান ও অন্যান্য বন্যপ্রাণীদের চলে আসার খবর শোনা যাচ্ছে কদিন পরপরই।

সীতাকুণ্ডসহ বিভিন্ন জাতীয় উদ্যানে খাদ্য সংকটের প্রকটতা দিনকে দিন বাড়ছে। লোকালয়ে এসে নির্বিচারে প্রাণ হারাচ্ছে এসব বন্যপ্রাণী। সাতক্ষীরা অঞ্চলের সুন্দরবন অংশে বাঘ অনেকবার নদী সাঁতরে লোকালয়ে প্রবেশ করেছে খাদ্য সংকটের কারণে। লোকালয়ে প্রবেশের পর অনেক বাঘকেই পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন জায়গায় মেছো বিড়াল পিটিয়ে হত্যা করা হচ্ছে।

মানুষ-বন্যপ্রাণী সংঘাত বাড়ায় শুধু যে বন্যপ্রাণীর জীবন চলে যাচ্ছে তা নয়, মারা যাচ্ছে মানুষও। আর সবচেয়ে বেশি মানুষ মারা যাচ্ছে সাপের কামড়ে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাম্প্রতিক এক গবেষণায় বলা হয়েছে, দেশে প্রতিবছর চার লাখ তিন হাজারের বেশি মানুষ সাপের দংশনের শিকার হন। এর মধ্যে সাত হাজারেরও বেশি মানুষ মৃত্যুবরণ করেন। আবার দংশনের পর মানুষের পিটুনিতে মারা পড়েছে সাপটিও। খাদ্যসংকটে ফসলের মাঠে বন্য শূকরের হানায় বিভিন্ন এলাকায় নষ্ট হচ্ছে ধান ও সবজিক্ষেত। এর মধ্যে মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলা উল্লেখযোগ্য। সেখানের ফসলি জমিতে লাউয়াছড়া বনের শূকরের দল প্রায় প্রতি রাতেই হানা দেয়। পাকা আমন ধান ও শীতকালীন সবজিক্ষেতে প্রায় প্রতি রাতেই শূকরের দল এসে ফসল নষ্ট করে। ধান, আলু, মূলাসহ বিভিন্ন ফসল উপড়ে ফেলে। শীতের মধ্যে পাকা ধান রক্ষায় মাঠে বাঁশ দিয়ে মাচা তৈরি করে পাহারা দিতে হয় কৃষকদের। অনুরূপভাবে সজারুর কারণেও অনেক সবজিক্ষেতের কৃষকরা ক্ষতির সম্মুখীন হয়। যদিও বর্তমানে সজারুর সংখ্যা অত্যন্ত কমে যাওয়ায় সবজিক্ষেতে হানা দেওয়ার কথা আর তেমন শোনা যায়না।

লাওয়াছড়া বনের ভেতর ও আশেপাশের এলাকা থেকে প্রায়শই উদ্ধার করা হয় বিভিন্ন বন্যপ্রাণী। মৌলভীবাজারের বিভিন্ন এলাকা থেকে বিরল প্রজাতির বিভিন্ন বন্যপ্রাণী ও পাখি উদ্ধার করা হয়। সম্প্রতি উত্তরবঙ্গে নীলগাই, লেওপার্ড পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এর পেছনে বন্যপ্রাণী সম্পর্কিত অজ্ঞানতা ও অসচেতনতাই দায়ী।

5.2.5 প্রজননে সমস্যা

বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণজনিত সমস্যা ও আবাসস্থল সংকোচনের ফলে বন্যপ্রাণীর প্রজননেও নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। যদিও বাংলাদেশ বৈশ্বিকভাবে বন্যপ্রাণীর প্রজনন সহায়ক, তবুও নদীর ঘড়িয়াল, কয়েক জাতের বানর ও হনুমান, ডলফিন, উদবিড়াল, শকুন, সুন্দরী হাঁস, পালাসের কুড়া ঈগলসহ বিভিন্ন প্রাণীর প্রজনন সহায়ক পরিবেশ তৈরি একান্ত আবশ্যিক। পূর্ব সুন্দরবনে করমজলে বন্যপ্রাণী প্রজনন কেন্দ্র অনেক বিলুপ্তপ্রায় প্রাণীকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করছে। বিভিন্ন পরিযায়ী পাখিসহ দেশি পাখির প্রজনন স্বাস্থ্য বনাঞ্চলের প্রকৃতি ও পরিবেশের উপর নির্ভর করে, যা আবাসস্থল ধ্বংস হওয়ার কারণে আজ হুমকিস্বরূপ। এছাড়াও আর্থিক প্রতিবন্ধকতা, স্থানীয় প্রভাবশালী ও রাজনীতিবিদদের প্রভাব, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর দুর্বলতা, বন-নির্ভর জনগোষ্ঠীর বনের উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা ইত্যাদি কারণেও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে প্রতিবন্ধকতা দেখা দিচ্ছে।

5.2.6 বন্যপ্রাণীর সংখ্যা হ্রাস

দিনদিন কমে যাচ্ছে বন্যপ্রাণীর সংখ্যা। **Red list of Bangladesh (2015)** এর তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের ১৬১৯ প্রজাতির মধ্যে ৫৬ টি প্রজাতি (৩.৪৫%) মহাবিপন্ন, ১৮১টি প্রজাতি (১১.১৮%) বিপন্ন, ১৫৩ টি প্রজাতি

(৯.৪৫%) সংকটাপন্ন অবস্থায় আছে। সমগ্র দেশজুড়ে ৩৮ টি স্তন্যপায়ীর প্রজাতি, ৩৯ টি পাখির প্রজাতি, ৩৮ টি সরীসৃপ প্রজাতি, ১০টি উভচর প্রজাতি, ৬৪ প্রজাতির মিঠা পানির মাছ এবং ১৮৮টি প্রজাপতির প্রজাতি হুমকির মধ্যে আছে।

ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশন সোসাইটির জরিপ অনুযায়ী, ২০০৬ সালে সুন্দরবনে ৪৫১ টি ইরাবতী ডলফিন এবং ২২৫ টি শুশুক (রিভার-ডলফিন) ছিল। অথচ বন বিভাগের ২০১৮ সালের জরিপ অনুযায়ী, ইরাবতী ডলফিনের সংখ্যা কমে এসে দাঁড়িয়েছে ১১৩তে এবং শুশুক ১১৮তে।

5.2.7 বিলুপ্তি

বন্যপ্রাণীর সংখ্যা হ্রাস ঘটতে ঘটতে একসময় একটি প্রজাতির সর্বশেষ সদস্যটিও হারিয়ে যায় পৃথিবী থেকে, বা একটি নির্দিষ্ট দেশ বা অঞ্চল থেকে। প্রজাতিটি বিলুপ্তির সম্মুখীন হয়। **Red list of Bangladesh (2015)** এর তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের ১৬১৯ প্রজাতির মধ্যে ৩১ টি প্রজাতি (২%) আঞ্চলিকভাবে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ইতঃপূর্বে সুন্দরবন থেকে বিলুপ্ত হয়েছে বুনোমহিষ, জলার হরিণ, জাভান গন্ডার সহ আরো অনেক প্রজাতি। বিলুপ্ত হওয়া এসব প্রাণীদের মধ্যে কয়েকটি স্তন্যপায়ী ও পাখির নাম নিচে উল্লেখ করা হলো –

স্তন্যপায়ী

| ক্রমিক নং | বাংলা নাম | ইংরেজি নাম |
|--------------|--------------------------------|---------------------------------|
| ০১. | একশিং- বিশিষ্টবৃহৎ গণ্ডার | Great One-horned Rhinoceros |
| ০২. | ক্ষুদ্রএকশিং- বিশিষ্টগণ্ডার | Lesser One-horned Rhinoceros |
| ০৩. | এশীয়দুশিং- বিশিষ্টগণ্ডার | Asian Two-horned Rhinoceros |
| ০৪. | নীলগাই | Blue Bull or Nilgai |
| ০৫. | বুনোমহিষ | Wild Buffalo |
| ০৬. | গাউর | Gaur |
| ০৭. | বেন্টিং | Banteng |
| ০৮. | বারোশিঙ্গা | Swamp Deer |
| ০৯. | প্যারাহরিণ | Hog Deer |

| ক্রমিক নং | বাংলা নাম | ইংরেজি নাম |
|--------------|-----------|------------|
| ১০. | নেকড়ে | Wolf |

পাখি

| ক্রমিক নং | বাংলা নাম | ইংরেজি নাম |
|--------------|----------------------|--------------------|
| ০১. | গোলাপিহাঁস | Pinkheaded Duck |
| ০২. | বর্মীবানীলময়ূর | Burmese Peafowl |
| ০৩. | বৃহৎ হাড়গিলা | Greater Adjutant |
| ০৪. | রাজাশকুন | King/Black Vulture |
| ০৫. | ডাহর/বেঙ্গলফ্লোরিকেন | Bengal Florican |

5.2.8 প্রাকৃতিক দুর্যোগ

ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপদের সম্মুখীন হয় বন্যপ্রাণীরা। যেমন, জলোচ্ছ্বাসের সময় সুন্দরবন থেকে জোয়ারের পানিতে ভেসে লোকালয়ে চলে আসে হরিণ ও অন্যান্য বন্যপ্রাণী। বিভিন্ন সময়ে শরণখোলা রেঞ্জ, পটুয়াখালী ও পিরোজপুরে ভেসে যাওয়া জীবিত হরিণ উদ্ধার করা হয়েছে। বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপের প্রভাবে হওয়া বৃষ্টিপাত এবং জোয়ারের পানিতে সুন্দরবনের ভিতরে অনেক জায়গা তলিয়ে যায়। হরিণ, শুকর ও বাঘের শাবক পানি বেশি হলে ঠাই পায় না। তখন প্রাণীরা বনের মধ্যে উঁচু জায়গা খুঁজতে চেষ্টা করে। অনেক সময় তাদের বাচ্চা ভেসে যায়।

পানিতে ভেসে আসা ছাড়াও বনের অভ্যন্তরে বিভিন্ন কারণে বন্যপ্রাণীর ক্ষতি হতে পারে। উপকূলীয় এলাকায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে বনের অভ্যন্তরে লবণাক্ত পানি ঢুকে নষ্ট করে দিতে পারে সুপেয় পানির উৎসগুলো। সুন্দরবনে বেশ কিছু সুপেয় পানির পুকুর খনন করা হয়েছে। এসব পুকুরে নোনাপানি ঢুকে যাওয়ায় বন্যপ্রাণীরা সুপেয় পানির অভাবে পড়ে।

নদীমাতৃক বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান দুর্যোগ হলো বন্যা। বন্যায় যখন বন্যপ্রাণীদের আবাসস্থল পানির নিচে তলিয়ে যায়, বন্যপ্রাণীরা তখন আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে। সাপ, বেজি, শিয়ালসহ অন্যান্য বন্যপ্রাণীর জীবন তখন হুমকির মুখে পড়ে। অনেক প্রাণী পানিতে ভেসে যায়, খাদ্যাভাবে ও পানিতে ডুবে মারা পড়ে অনেক বন্যপ্রাণী, অনেক প্রাণী অপেক্ষাকৃত উঁচু লোকালয়ে চলে আসে আশ্রয়ের খোঁজে। এজন্য বন্যার সময়ে বাসাবাড়িতে সাপ আশ্রয় নিতে দেখা যায়। সাপের কামড়ে অনেক হতাহতের ঘটনাও ঘটে।

পাহাড়ি ঝিরিগুলো থেকে অবাধে পাথর উত্তোলনের ফলে পাহাড়ি নদী ও ঝিরিগুলোর প্রবাহমানতা কমে গিয়েছে। পাহাড়ে বড় বড় গাছের সংখ্যা কমে যাওয়ায় বৃষ্টি হলে পাহাড়ের মাটি ধুয়ে ঝিরিগুলোতে পড়ে সেগুলো ভরাট হয়ে যাচ্ছে, নদীগুলোর নাব্যতা কমে যাচ্ছে। ফলে অল্প বৃষ্টিতেই পাহাড়ি ঢল নেমে আসছে পাহাড় থেকে, অতিবৃষ্টিতে আকস্মিক বন্যায় পাহাড়ি নদীগুলোর দুইতীর প্লাবিত হচ্ছে। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বন্যপ্রাণীর আবাসস্থলগুলো, পাহাড়ি ঢলে দুই তীর প্লাবিত হওয়ায় বাসস্থান হারাচ্ছে বিভিন্ন বন্যপ্রাণী। সাম্প্রতিক সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমিধ্বসে বন্যপ্রাণীর আবাসস্থলের ক্ষতি সাধিত হচ্ছে, অনেক বন্যপ্রাণীর বাসস্থান ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এমনকি মাটির নিচে চাপা পড়ে মারা যাচ্ছে বন্যপ্রাণী। ঝিরি ও অন্যান্য সুপেয় পানির উৎসগুলোর প্রবাহও বাঁধাপ্রাপ্ত হচ্ছে ভূমি বা পাহাড় ধ্বসের কারণে। পাহাড় ধ্বসের কারণ হিসেবে পাহাড় কাটা, অবাধে গাছ কাটা, অপরিবর্তিত আবাসন, অনিয়ন্ত্রিত জুম চাষ এবং অতিবৃষ্টি উল্লেখযোগ্য। দুর্যোগের কারণ প্রাকৃতিক বা মনুষ্যসৃষ্ট যাই হোক না কেন, বন্যপ্রাণীর সুরক্ষা আমাদেরই নিশ্চিত করতে হবে।

5.2.9 পরিবেশ দূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন

সাম্প্রতিক সময়ে বন্যপ্রাণীর জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে পরিবেশ দূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন। শিল্পায়নের ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড ও অন্যান্য ক্ষতিকর গ্যাসের পরিমাণ বাড়ছে। এর ফলে হচ্ছে এসিড বৃষ্টি যার ফলে অরণ্যে মহামারীর সৃষ্টি হচ্ছে, খাদ্যশস্য বিষাক্ত হচ্ছে। আমাদের সবুজ অরণ্যগুলো খুব দ্রুত ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। বর্তমান বিশ্বের বনভূমির প্রায় ৮০ শতাংশই কিন্তু গ্রীষ্মমণ্ডলীয় সবুজ অরণ্য। শুধু অরণ্যই নয়, কৃষিজমির উর্বরতা কমে যাচ্ছে। ফলে পাল্লা দিয়ে কমে যাচ্ছে বন্যপ্রাণীর সংখ্যা। সুন্দরবনে জেলেদের জাল ও বিষ প্রয়োগের কারণে বিভিন্ন মাছ, কুমির ও অন্যান্য বন্যপ্রাণীর মৃত্যু ঘটছে। শিল্প কারখানার বর্জ্য দূষণ এবং নৌযান চলাচলের ফলে সৃষ্ট দূষণের কারণে হুমকির মুখে পড়ছে কুমির ও ডলফিনের স্বাভাবিক প্রজনন।

যত্রতত্র প্লাস্টিকজাত দ্রব্য ফেলা হচ্ছে। প্লাস্টিকের বোতল ও মোড়ক, পলিথিন, অন্যান্য পচনশীল ও অপচনশীল দ্রব্য নির্দিষ্ট স্থানে না ফেলায় সেগুলো পরিবেশ দূষণ ঘটচ্ছে, বিভিন্ন জলাশয় ও নদীনালায় এসে জমা হচ্ছে। জলাশয়গুলো ভরাট হয়ে যাচ্ছে, নদীনালায় স্বাভাবিক প্রবাহ আটকে যাচ্ছে প্লাস্টিকের কারণে, জলাভূমিগুলো প্রাণীদের বসবাসের জন্য অনুপযোগী হয়ে পড়ছে। ইট ভাটার কারণে পরিবেশ ও বায়ুদূষণ ঘটছে। অন্যান্য কলকারখানা ও যানবাহন বায়ুদূষণের অন্যতম প্রধান কারণ। এছাড়াও উপরিউক্ত বিভিন্ন কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে মাটির উপরিভাগও। বিভিন্ন ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে বন্যপ্রাণীরা।

কৃষিক্ষেত্রে শস্য রক্ষার জন্য বিভিন্ন ধরনের কীটনাশক ওষুধ প্রয়োগ করা হচ্ছে। শিল্প কারখানার বিষাক্ত বর্জ্য নিক্ষেপন করা হচ্ছে নদী ও অন্যান্য জলাশয়ে। এসব বিপজ্জনক রাসায়নিক দ্রব্যের অনুপ্রবেশ ঘটছে বন্যপ্রাণীর শরীরে। জলাভূমির পরিবেশ নষ্ট হয়ে অক্সিজেন স্বল্পতা ও অন্যান্য বিষাক্ততায় প্রাণীশূন্য হয়ে পড়ছে জলাভূমিগুলো। বদলে যাচ্ছে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর জলবায়ু। গরমের তীব্রতা বাড়ছে, বাড়ছে শীতও, নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া পরিণত হচ্ছে চরমভাবাপন্ন আবহাওয়ায়। বদলে যাচ্ছে অরণ্যগুলো, খাপ খাওয়াতে না পেরে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন বন্যপ্রাণী।

5.2.10 বন্যপ্রাণীর অবৈধ শিকার ও বাণিজ্য

বিভিন্ন দেশে কচ্ছপ, হরিণ, হাতিসহ বিভিন্ন প্রাণী বা প্রাণীর অংশবিশেষের চাহিদা রয়েছে। দেশের ভিতরেও অনেকে শখের বশে বা অন্য কোনো কারণে হাতির দাঁত, হরিণের চামড়া, ধনেশ পাখির ঠোঁট ইত্যাদি সংগ্রহ করে। আবার কাছিম, হরিণ এবং পাখি বিশেষতঃ জলচর ও পরিযায়ী পাখির মাংস হিসেবে চাহিদা রয়েছে। এসব চাহিদার ফলে কিছু অসাধু মানুষ অবৈধ শিকার চালিয়ে যাচ্ছে।

অবৈধ শিকার ও বাণিজ্যের কারণে হুমকির মুখে পড়েছে বন্যপ্রাণী, যা বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের অন্যতম সমস্যা হয়ে দেখা দিচ্ছে। সুন্দরবনের আশেপাশের এলাকা ছাড়াও পার্বত্য জেলাগুলোতে বন্যপ্রাণী ও বন্যপ্রাণীর মাংসের কেনাবেচা ও খাদ্যতালিকায় এদের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়, যার সঠিক পরিসংখ্যান এখনো জানা যায়নি। প্রচুর সংখ্যক কচ্ছপ ও অন্যান্য বন্যপ্রাণী পাচারের সময় আটক করা হয় বিমানবন্দর, বেনাপোল ও অন্যান্য সীমান্তে।

তক্ষক নিয়ে একটি গুজব প্রচলিত আছে যে, তক্ষক বিদেশে কোটি টাকায় বিক্রি করা যায়। এসব গুজবের ফলে মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে লোভে পড়ে নিরীহ তক্ষক শিকার করে, কেউ আবার কোটি টাকায় বিক্রি করার লোভে সেগুলো উচ্চমূল্যে শিকারীর কাছ থেকে কিনেও নিয়ে যায়। অথচ, এই পুরো ব্যাপারটিই ভিত্তিহীন,

একটি গুজব। আদতে তক্ষকের কোনো বিশেষ গুণাবলি নেই, এবং এটি বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত, ফলে বিদেশে এর উচ্চমূল্যও নেই। কিন্তু কিছু অসাধু মানুষ এসব গুজব ছড়িয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করে হাতিয়ে নিচ্ছে লাখ লাখ টাকা। আর এভাবে মানুষের লোভের শিকার হয়ে মারা যাচ্ছে শত শত নিরীহ তক্ষক।

২০২২ সালে বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবসের প্রতিপাদ্য ছিলো, ‘বিপন্ন বন্যপ্রাণী রক্ষা করি, প্রতিবেশ পুনরুদ্ধারে এগিয়ে আসি’। অর্থাৎ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ করলে শুধু যে প্রজাতিসমূহ সংখ্যায় বৃদ্ধি পাবে তা না, বরং তা আমাদের প্রতিবেশ পুনরুদ্ধারেও ভূমিকা রাখবে। বাংলাদেশ সরকার বন, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণকে নানাভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছে। তবে বিভিন্ন সময় সংশ্লিষ্ট বিভাগকে প্রায়ই নানা প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হয়। অবৈধভাবে বনভূমি দখল, নগরায়ণ, শিল্পায়ন, ব্যক্তি বা সরকারী মালিকানাধীন পাহাড় কেটে ভূমিরূপ পরিবর্তনের ফলে আশংকাজনক হারে বন ও বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল হমকির সম্মুখীন হয়।

যত দিন যাচ্ছে, বন ও জলাভূমির পরিমাণ আশংকাজনক হারে কমছে। বন্যপ্রাণীর আবাসস্থলের পরিমাণ যত কমছে, খাদ্যসংকট, আশ্রয়সংকট ও অন্যান্য কারণে তত কমছে বন্যপ্রাণীর সংখ্যাও। আবাসস্থলে খাদ্যের প্রাচুর্যতা কমে যাওয়ায় দিশাহীন হয়ে পড়ছে ওরা, টিকিয়ে রাখতে হিমশিম খাচ্ছে নিজেদের। এছাড়াও পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে হচ্ছে বর্ধিত পরিমাণ প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যার কারণে বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, মারা পড়ছে অসংখ্য বন্যপ্রাণী। তদুপরি খাদ্যসংকটে লোকালয়ে চলে আসছে অনেক প্রজাতির প্রাণী, বাড়ছে মানুষের সাথে সংঘাত। পাশাপাশি মানুষের সীমাহীন লোভ লালসার কারণে শিকারে পরিণত হচ্ছে। এভাবে অসচেতনতা, হিংস্রতা, বুভুক্ষা ইত্যাদি কারণে মানুষের হাতে প্রতিনিয়ত মারা পড়ছে অনেক প্রাণী। এর ফলে কোনো বন্যপ্রাণী বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে, কেউ রয়েছে বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে। আমরা এই নিবন্ধে বন্যপ্রাণীর জন্য যেসব হুমকি রয়েছে, যেমন – আবাসস্থল কমে যাওয়া, পরিবেশ দূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন, অবৈধ শিকারসহ নানা প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট কারণ আলোচনা করবো।

5.1 বন্যপ্রাণীর আবাসস্থলের অতীত ও বর্তমান অবস্থা

5.1.1 বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল কমে যাওয়া

গত পাঁচ দশকে, বাংলাদেশ তার বনভূমির দুই-তৃতীয়াংশ হারিয়েছে। যার প্রত্যক্ষ নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে বন্যপ্রাণীর আবাসস্থলের উপর। বন ছাড়াও সমুদ্র, নদী-নালা, খাল-বিল, হাওড়-বাওড়, বাড়ির পাশের ঝোপ-ঝাড় অর্থাৎ আমাদের গ্রামীণ পরিবেশের সর্বত্র কোনো না কোনো বন্যপ্রাণীর আবাস। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বাসস্থানের বাড়তি চাহিদা পূরণ করতে হচ্ছে বন্যপ্রাণী আবাসস্থল নিধন বা সংকোচনের মাধ্যমে। অধিকতর প্রাকৃতিক বিপর্যয়, জলবায়ু পরিবর্তন, শিল্পায়ন, নগরায়ন তথা অপরিবর্তিত উন্নয়ন ছাড়াও আর্থিক লাভের আশায় সৃজিত বাগান (সেগুন, রাবার, চা), এবং পাহাড়ে অনিয়ন্ত্রিত জুমচাষ, অপরিবর্তিত হাটিকালচার সম্প্রসারণকে বন নিধন তথা বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল কমে যাওয়ার অন্যতম কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়।

5.1.2 বন ও জলাভূমি হ্রাস

কোন বন বা জলাভূমির পরিমাণ প্রাকৃতিক কিংবা মানবসৃষ্ট কারণে কমে গেলে তাকে উজাড় (হ্রাস) বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ, কক্সবাজার জেলায় সংরক্ষিত বনভূমিতে বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিক (রোহিঙ্গা) কর্তৃক বসতি স্থাপন, বিপুল পরিমাণ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জ্বালানির চাহিদা মেটাতে বনভূমি থেকে জ্বালানী সংগ্রহ, পাহাড় কেটে ফেলে মাটি বিক্রি করা, অবৈধভাবে কাঠ ও বনদ্রব্যাদি পাচার, স্থানীয় প্রভাবশালী ও কুচক্রীমহল কর্তৃক রোহিঙ্গাদের বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড যেমন বনভূমি জবরদখল ও অবৈধভাবে বনের গাছ কাটা ও পাচারের কাজে শ্রমিক হিসেবে ব্যবহার করা, স্বল্প জায়গায় বিপুল পরিমাণ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর গণস্বাস্থ্য, পয়ঃনিষ্কাশন ইত্যাদি কাজের কারণে পরিবেশের ক্ষতি হওয়া। এসকল কারণে প্রায় ২ হাজার একর সৃজিত বন ও চার হাজার একর প্রাকৃতিক বন ধ্বংস হয়ে যায়। এছাড়াও বিভিন্ন এনজিও ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের রোহিঙ্গা সম্পর্কিত কার্যক্রম পরিচালনায় বিভিন্ন স্থায়ী-অস্থায়ী ক্যাম্প নির্মাণের কারণে প্রতিনিয়ত পাহাড় ও বনভূমি কাটা পড়ছে।

এছাড়াও, বিভিন্ন জলাভূমি ভরাট করে বসতবাড়ি নির্মাণ করা হচ্ছে। বিভিন্ন জলাভূমি নদী, খাল ইত্যাদির পাড় ধরে কলকারখানা, রেস্টুরেন্ট, বস্তি ইত্যাদি স্থাপনের মাধ্যমে ক্রমশ সংকুচিত করে ফেলা হচ্ছে জলাভূমিগুলোকে। অনেক জায়গায় বিস্তীর্ণ জলাভূমি দখল করে গড়ে উঠছে আবাসিক প্রকল্প। হাওড়ের বিভিন্ন অংশ দখল করে ফিশারি বানানো হচ্ছে। প্লাস্টিক, পচনশীল ও অন্যান্য অপচনশীল আবর্জনা ফেলার

কারণেও ভরাট হয়ে যাচ্ছে জলাভূমিগুলো, পানির স্বাভাবিক গতিপথ বাঁধাপ্রাপ্ত হচ্ছে, যে কারণে ভাটির দিকে শুকিয়ে যাচ্ছে নদী ও খালগুলো।

জলবায়ু পরিবর্তন, দূষণ ও মানুষের ক্ষতিকর কর্মকাণ্ডের কারণে বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল হুমকির মুখে পড়েছে। এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো প্রাকৃতিক বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান সুন্দরবন। এসকল কারণ ছাড়াও নদী-ভাঙ্গনের ফলে দিনের পর দিন বিলীন হচ্ছে নদীপাড়ের বনের অংশ।

5.1.3 বন ও জলাভূমির অবক্ষয়

বন ও জলাভূমির কোন অংশ যদি কোনো কারণে বন্যপ্রাণীর বসবাসের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে তাহলে তা অবক্ষয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। বিভিন্ন কারণে বন ও জলাভূমির অবক্ষয় হতে পারে। বনে অবৈধভাবে গাছ কাটার ফলে বনের গাছগুলোর ঘনত্ব কমে যাচ্ছে। বন ও জলাভূমির জীববৈচিত্র্য হ্রাস পাচ্ছে। পাশাপাশি, বন ও জলাভূমি বাস্তুতন্ত্রকে যেসব সেবা প্রদান করতো, যেমনঃ অক্সিজেন প্রদান, খাদ্যদ্রব্যের যোগান ইত্যাদি, সেগুলোও হ্রাস পাচ্ছে। এভাবে অবক্ষয় ঘটছে বন্যপ্রাণীর আবাসস্থলের।

এছাড়াও জলাভূমিতে ঘের দিয়ে বা বাঁধ দিয়ে চিংড়ির ঘের, ফিশারি ও অন্যান্য কার্যক্রম করছে লোভী দখলদারেরা। মাছ শিকারের জন্য বিষ প্রয়োগ ও অন্যান্য ক্ষতিকর পন্থা অবলম্বনের কারণেও জলাভূমির অবক্ষয় ঘটছে।

5.1.4 বন খণ্ডায়ন

বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল কমে যাওয়ার পাশাপাশি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বনের খণ্ডতা বা Fragmentation, অর্থাৎ একটি বড় বনকে কোনো কারণে খণ্ড খণ্ড অংশে বিভক্ত করে ফেলা যার এক অংশের সাথে আরেক অংশের কোনো যোগাযোগ নেই। ধরো, তোমার জেলায় একটি অনেক বড় শালবন আছে, সেখানে অনেক ধরনের প্রাণী বাস করে। এবার, সেই বনের ভিতর দিয়ে রাস্তা বানানো হলো, রাস্তার দুইপাশে বাজার হলো, ধীরে ধীরে মানুষের বসতি বাড়তে থাকলো। এতে করে কী হলো? বনটি দুইভাগে ভাগ হয়ে গেল। একভাগের প্রাণীরা আর অন্যভাগে যেতে পারছে না বাজার ও ব্যস্ত রাস্তা থাকার কারণে। ফলে বনের প্রাণীদের বিচরণের জায়গাও অর্ধেক হয়ে গেল, এদের চলাচল ও খাদ্য সংগ্রহের স্থানও সংকুচিত হয়ে পড়লো। পরিণামে ধীরে ধীরে এদের সংখ্যা কমতে শুরু করবে, এমনকি ছোট বনের ছোট দল হওয়ায় এদের অভিযোজন ক্ষমতাও হ্রাস পেতে থাকবে এবং এভাবে কমতে কমতে একসময় হয়তো দলটি বিলুপ্তই হয়ে যাবে ঐ বন থেকে। অথচ পুরো বন একসাথে থাকলে, এদের দলের সংখ্যা আরও বড় থাকলে (যেমনটি শুরুতে ছিল) এরা হয়তো বিলুপ্ত হতো না।

5.1.5 অন্যান্য

প্রায়ই জেলেদের জালে অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু প্রাণী ধরা পড়ে। জেলেদের প্রধান উদ্দেশ্য থাকে মাছ ধরা, মাছ ধরতে গিয়ে এসব প্রাণী জালে আটকে গেলে এসব প্রাণীরও ক্ষতিসাধন হয়। অবমুক্ত করে জলে ফিরিয়ে দেওয়ার আগেই প্রাণীটি মারা যায়, অথবা জালে আটকে গিয়ে প্রাণীটি মারাত্মকভাবে আহত হয়, অথবা জেলেরা প্রাণীটাকে আর জলে ফিরিয়ে দেন না, বাজারে সুলভমূল্যে বিক্রি করে দেন, অথবা কোথাও ফেলে রাখেন যেখানে প্রাণীটি মারা যায়। কাছিম, করাত মাছ, বিভিন্ন প্রকার হাঙ্গর, শাপলাপাতা ও অন্যান্য প্রাণী ধরা পড়ছে জেলেদের জালে, যার কোন সঠিক পরিসংখ্যান জানা যায়নি। অবশ্য জেলেদের মতে আমাদের জলসীমানায় হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছ আর আগের মত আর ধরা পড়ছেন না। এর অর্থ হলো, তাদের সংখ্যা উল্লেখজনক হারে হ্রাস পেয়েছে।

বিভিন্ন খাল-বিল, নদী ও জলাশয়ে চায়না ম্যাজিক ও কারেন্ট জালের অবাধ ব্যবহার চলছে। বিভিন্ন ধরনের জাল বিভিন্ন ধরনের জলাভূমির প্রাণীদের জন্য ক্ষতিকর। এজন্য সব জলাভূমিতে সব ধরনের জাল দিয়ে মাছ ধরার অনুমতি দেওয়া হয়না। তবুও অবৈধভাবে বিভিন্ন নিষিদ্ধ জাল দিয়ে মাছ শিকার চলছেই। এতে যেসব প্রাণীর ধরা পড়ার কথা না, জালে আটকে ধরা পড়ছে তারাও। নিধন হচ্ছে দেশীয় মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী। এছাড়াও প্রতিনিয়ত মারা পড়ছে বিভিন্ন প্রজাতির ডিমওয়ালা মাছ। মারা পড়ছে বিভিন্ন মাছের পোনাও। ব্যাঙ, সাপ, কচ্ছপ, শামুকসহ বিভিন্ন প্রজাতির জলজ প্রাণীও মারা পড়ছে। ফলে হুমকিতে পড়ছে তাদের জীবনচক্র, হারিয়ে যাচ্ছে জীববৈচিত্র্য। এসব জাল ব্যবহারের কারণে মুক্ত জলাশয়ের মাছ শেষের পথে, এখন আর আগের মতো মাছ দেখা যায় না। আশংকাজনক হারে কমে গিয়েছে অন্যান্য জলজ প্রাণীও।

5.2 আবাসস্থল হারিয়ে যাওয়ার ফলাফল

5.2.1 খাদ্য ও পানির সংকট

বনভূমি সংকুচিত হওয়ার ফলে বন্যপ্রাণীদের খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে, ফলদ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় গাছপালা নির্বিচারে উজাড় করে ফেলা হচ্ছে। একেক ধরনের প্রাণী একেক ধরনের গাছের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল থাকে খাদ্যসংগ্রহ বা আশ্রয়ের জন্য। সেই গাছগুলো কেটে ফেলা হলে তার উপর নির্ভরশীল প্রাণী, যারা প্রথম শ্রেণির খাদক, তারা হয় খাদ্যাভাবে বিলুপ্ত হয়ে যায় নয়তো লোকালয়ে চলে এসে মারা পড়ে। এবার, তাদের বিলুপ্তির কারণে তাদের উপর নির্ভরশীল দ্বিতীয় শ্রেণির প্রাণীদেরও একই পরিণতি বরণ করতে হয় এবং এই ধারা চলতেই থাকে। এছাড়াও গাছ কাটার ফলে মাটির পানিধারণ ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। ফলে শীতের মৌসুমে দ্রুতই শুকিয়ে যাচ্ছে জলাধারগুলো। লাউয়াছড়াসহ অন্যান্য বন বিশেষতঃ পার্বত্য বনভূমিতে ঝিরিগুলো শীতের শুরুতেই শুকিয়ে যাচ্ছে। চরম পানিসংকটে পড়ছে উক্ত এলাকার বন্যপ্রাণী।

5.2.2 আশ্রয়ের সংকট

আবাসস্থলের পরিমাণ কমে যাওয়ায় ও বনগুলোতে গাছের ঘনত্ব কমে যাওয়ায় আশ্রয়ের সংকটে পড়ছে বন্যপ্রাণীরা। সম্মুখ বিপদ, মানুষ ও অন্যান্য হুমকি থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে নিজেদের আড়াল করতে পারছে না প্রাণীরা। তাদের লুকানোর স্থানগুলো ও আশ্রয়স্থলগুলো বিভিন্ন কারণে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, ফলে বন্যপ্রাণীরা বিপদ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারছে না, বারবার উন্মুক্ত হয়ে পড়ছে।

5.2.3 চলাচলের সংকট

তোমরা অনেকেই জানো যে হাতি কখনোই এক জায়গায় বসবাস করে না, একটি হাতির দলের যে পরিমাণ খাবারের প্রয়োজন হয়, তার যোগান নিশ্চিত করতে ও অন্যান্য কারণে তারা এক বনভূমি থেকে অন্য বনভূমিতে যাতায়াত করে। এই পথগুলো সাধারণত রক্ষিত এলাকার সীমান্তবর্তী এলাকায় হয়ে থাকে। মানুষের নানাবিধ কর্মকাণ্ড ও স্থাপনার ফলে এই যাতায়াতের পথ ও করিডোরগুলো সংকুচিত হয়ে পড়ছে। মূলতঃ উথিয়া, টেকনাফ ও রামু উপজেলার বনভূমিতে এরা বসবাস করলেও পানেরছড়া-রাজারকূল এবং বালুখালী-ঘুনধুম করিডোর দিয়ে এরা বান্দরবান ও মায়ানমারে চলাচল করত। সরকারী বেসরকারী স্থাপনা নির্মাণ এবং রোহিঙ্গা আশ্রয়কেন্দ্রের ফলে এই দুইটি করিডোরসহ অন্যান্য করিডোরগুলোর কয়েকটি সংকুচিত হয়ে পড়েছে, কয়েকটি বন্ধ হয়ে পড়েছে। পরিণামে হাতির পাল ক্রমেই ক্ষুদ্র জায়গায় আবদ্ধ হয়ে পড়ছে, তাদের খাবারের অভাব দেখা দিচ্ছে, প্রজনন ব্যাহত হচ্ছে। অন্যান্য বন্যপ্রাণীদের ক্ষেত্রেও একই ধরনের সমস্যা দেখা দিচ্ছে।

5.2.4 মানুষ-বন্যপ্রাণী সংঘাত

আবাসস্থল সংকোচন ও অবক্ষয়ের কারণে বন্যপ্রাণীরা ক্রমেই ক্ষুদ্র জায়গায় আবদ্ধ হয়ে পড়ছে, তাদের খাবারের অভাব দেখা দিচ্ছে, প্রজনন ব্যাহত হচ্ছে। হাতির দল বনভূমি ছেড়ে লোকালয়ের দিকে চলে আসছে, হাতি ও মানুষের মধ্যকার সংঘর্ষ বেড়েই চলেছে। হাতির আক্রমণে মানুষ মরছে, নয়তো মানুষের আক্রমণে হাতি। ২০২১-২২ সালে মানুষ ও বন্যপ্রাণীর দ্বন্দ্ব ১৩টি হাতি মারা যায়। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে খাদ্য ও পানির সন্ধানে লোকালয়ে চলে আসছে মায়া হরিণ, শূকর, বানর, হনুমান, সজারু, বনরুইসহ বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী। ময়মনসিংহের রসূলপুর ও টাঙ্গাইলের মধুপুর বনাঞ্চলে খাদ্যের সংকটে লোকালয়ে বানর, হনুমান ও অন্যান্য বন্যপ্রাণীদের চলে আসার খবর শোনা যাচ্ছে কদিন পরপরই।

সীতাকুণ্ডসহ বিভিন্ন জাতীয় উদ্যানে খাদ্য সংকটের প্রকটতা দিনকে দিন বাড়ছেই। লোকালয়ে এসে নির্বিচারে প্রাণ হারাচ্ছে এসব বন্যপ্রাণী। সাতক্ষীরা অঞ্চলের সুন্দরবন অংশে বাঘ অনেকবার নদী সাঁতরে লোকালয়ে প্রবেশ করেছে খাদ্য সংকটের কারণে। লোকালয়ে প্রবেশের পর অনেক বাঘকেই পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন জায়গায় মেছো বিড়াল পিটিয়ে হত্যা করা হচ্ছে।

মানুষ-বন্যপ্রাণী সংঘাত বাড়ায় শুধু যে বন্যপ্রাণীর জীবন চলে যাচ্ছে তা নয়, মারা যাচ্ছে মানুষও। আর সবচেয়ে বেশি মানুষ মারা যাচ্ছে সাপের কামড়ে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাম্প্রতিক এক গবেষণায় বলা হয়েছে, দেশে প্রতিবছর চার লাখ তিন হাজারের বেশি মানুষ সাপের দংশনের শিকার হন। এর মধ্যে সাত হাজারেরও বেশি মানুষ মৃত্যুবরণ করেন। আবার দংশনের পর মানুষের পিটুনিতে মারা পড়ছে সাপটিও।

খাদ্যসংকটে ফসলের মাঠে বন্য শূকরের হানায় বিভিন্ন এলাকায় নষ্ট হচ্ছে ধান ও সবজিক্ষেত। এর মধ্যে মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলা উল্লেখযোগ্য। সেখানের ফসলি জমিতে লাউয়াছড়া বনের শূকরের দল প্রায় প্রতি রাতেই হানা দেয়। পাকা আমন ধান ও শীতকালীন সবজিক্ষেতে প্রায় প্রতি রাতেই শূকরের দল এসে ফসল নষ্ট করে। ধান, আলু, মলাসহ বিভিন্ন ফসল উপড়ে ফেলে। শীতের মধ্যে পাকা ধান রক্ষায় মাঠে বাঁশ দিয়ে মাচা তৈরি করে পাহারা দিতে হয় কৃষকদের। অনুরূপভাবে সজারুর কারণেও অনেক সবজিক্ষেতের কৃষকরা ক্ষতির সম্মুখীন হয়। যদিও বর্তমানে সজারুর সংখ্যা অত্যন্ত কমে যাওয়ায় সবজিক্ষেতে হানা দেওয়ার কথা আর তেমন শোনা যায়না।

লাওয়াছড়া বনের ভেতর ও আশেপাশের এলাকা থেকে প্রায়শই উদ্ধার করা হয় বিভিন্ন বন্যপ্রাণী। মৌলভীবাজারের বিভিন্ন এলাকা থেকে বিরল প্রজাতির বিভিন্ন বন্যপ্রাণী ও পাখি উদ্ধার করা হয়। সম্প্রতি উত্তরবঙ্গে নীলগাই, লেওপার্ড পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এর পেছনে বন্যপ্রাণী সম্পর্কিত অজ্ঞানতা ও অসচেতনতাই দায়ী।

5.2.5 প্রজননে সমস্যা

বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণজনিত সমস্যা ও আবাসস্থল সংকোচনের ফলে বন্যপ্রাণীর প্রজননেও নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। যদিও বাংলাদেশ বৈশ্বিকভাবে বন্যপ্রাণীর প্রজনন সহায়ক, তবুও নদীর ঘড়িয়াল, কয়েক জাতের বানর ও হনুমান, ডলফিন, উদবিড়াল, শকুন, সুন্দরী হাঁস, পালাসের কুড়া ঈগলসহ বিভিন্ন প্রাণীর প্রজনন সহায়ক পরিবেশ তৈরি একান্ত আবশ্যিক। পূর্ব সুন্দরবনে করমজলে বন্যপ্রাণী প্রজনন কেন্দ্র অনেক বিলুপ্তপ্রায় প্রাণীকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করছে। বিভিন্ন পরিযায়ী পাখিসহ দেশি পাখির প্রজনন স্বাস্থ্য বনাঞ্চলের প্রকৃতি ও পরিবেশের উপর নির্ভর করে, যা আবাসস্থল ধ্বংস হওয়ার কারণে আজ হুমকিস্বরূপ। এছাড়াও আর্থিক প্রতিবন্ধকতা, স্থানীয় প্রভাবশালী ও রাজনীতিবিদদের প্রভাব, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর দুর্বলতা, বন-নির্ভর জনগোষ্ঠীর বনের উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা ইত্যাদি কারণেও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে প্রতিবন্ধকতা দেখা দিচ্ছে।

5.2.6 বন্যপ্রাণীর সংখ্যা হ্রাস

দিনদিন কমে যাচ্ছে বন্যপ্রাণীর সংখ্যা। **Red list of Bangladesh (2015)** এর তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের ১৬১৯ প্রজাতির মধ্যে ৫৬ টি প্রজাতি (৩.৪৫%) মহাবিপন্ন, ১৮১টি প্রজাতি (১১.১৮%) বিপন্ন, ১৫৩ টি প্রজাতি (৯.৪৫%) সংকটাপন্ন অবস্থায় আছে। সমগ্র দেশজুড়ে ৩৮ টি স্তন্যপায়ীর প্রজাতি, ৩৯ টি পাখির প্রজাতি, ৩৮ টি সরীসৃপ প্রজাতি, ১০টি উভচর প্রজাতি, ৬৪ প্রজাতির মিঠা পানির মাছ এবং ১৮৮টি প্রজাপতির প্রজাতি হুমকির মধ্যে আছে।

ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশন সোসাইটির জরিপ অনুযায়ী, ২০০৬ সালে সুন্দরবনে ৪৫১ টি ইরাবতী ডলফিন এবং ২২৫ টি শুশুক (রিভার-ডলফিন) ছিল। অথচ বন বিভাগের ২০১৮ সালের জরিপ অনুযায়ী, ইরাবতী ডলফিনের সংখ্যা কমে এসে দাঁড়িয়েছে ১১৩তে এবং শুশুক ১১৮তে।

5.2.7 বিলুপ্তি

বন্যপ্রাণীর সংখ্যা হ্রাস ঘটতে ঘটতে একসময় একটি প্রজাতির সর্বশেষ সদস্যটিও হারিয়ে যায় পৃথিবী থেকে, বা একটি নির্দিষ্ট দেশ বা অঞ্চল থেকে। প্রজাতিটি বিলুপ্তির সম্মুখীন হয়। **Red list of Bangladesh (2015)** এর তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের ১৬১৯ প্রজাতির মধ্যে ৩১ টি প্রজাতি (২%) আঞ্চলিকভাবে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ইতঃপূর্বে সুন্দরবন থেকে বিলুপ্ত হয়েছে বুনোমহিষ, জলার হরিণ, জাভান গন্ডার সহ আরো অনেক প্রজাতি। বিলুপ্ত হওয়া এসব প্রাণীদের মধ্যে কয়েকটি স্তন্যপায়ী ও পাখির নাম নিচে উল্লেখ করা হলো –

স্তন্যপায়ী

| ক্রমিক নং | বাংলা নাম | ইংরেজি নাম |
|--------------|-----------|------------------|
| ০১. | একশিং- | Great One-horned |

| ক্রমিক নং | বাংলা নাম | ইংরেজি নাম |
|--------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | বিশিষ্টবৃহৎ গণ্ডার | Rhinoceros |
| ০২. | ক্ষুদ্রএকশিং- বিশিষ্টগণ্ডার | Lesser One-horned Rhinoceros |
| ০৩. | এশীয়দুশিং- বিশিষ্টগণ্ডার | Asian Two-horned Rhinoceros |
| ০৪. | নীলগাই | Blue Bull or Nilgai |
| ০৫. | বুনোমহিষ | Wild Buffalo |
| ০৬. | গাউর | Gaur |
| ০৭. | বেন্টিং | Banteng |
| ০৮. | বারোশিঙ্গা | Swamp Deer |
| ০৯. | প্যারাহরিণ | Hog Deer |
| ১০. | নেকড়ে | Wolf |

পাখি

| ক্রমিক নং | বাংলা নাম | ইংরেজি নাম |
|--------------|-----------------|--------------------|
| ০১. | গোলাপিহাঁস | Pinkheaded Duck |
| ০২. | বর্মীবানীলময়ূর | Burmese Peafowl |

| | | |
|-----|----------------------|--------------------|
| ০৩. | বৃহৎ হাড়গিলা | Greater Adjutant |
| ০৪. | রাজাশকুন | King/Black Vulture |
| ০৫. | ডাহর/বেঙ্গলফ্লোরিকেন | Bengal Florican |

5.2.8 প্রাকৃতিক দুর্যোগ

ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপদের সম্মুখীন হয় বন্যপ্রাণীরা। যেমন, জলোচ্ছ্বাসের সময় সুন্দরবন থেকে জোয়ারের পানিতে ভেসে লোকালয়ে চলে আসে হরিণ ও অন্যান্য বন্যপ্রাণী। বিভিন্ন সময়ে শরণখোলা রেঞ্জ, পটুয়াখালী ও পিরোজপুরে ভেসে যাওয়া জীবিত হরিণ উদ্ধার করা হয়েছে। বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপের প্রভাবে হওয়া বৃষ্টিপাত এবং জোয়ারের পানিতে সুন্দরবনের ভিতরে অনেক জায়গা তলিয়ে যায়। হরিণ, শূকর ও বাঘের শাবক পানি বেশি হলে ঠাই পায় না। তখন প্রাণীরা বনের মধ্যে উঁচু জায়গা খুঁজতে চেষ্টা করে। অনেক সময় তাদের বাচ্চা ভেসে যায়। পানিতে ভেসে আসা ছাড়াও বনের অভ্যন্তরে বিভিন্ন কারণে বন্যপ্রাণীর ক্ষতি হতে পারে। উপকূলীয় এলাকায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে বনের অভ্যন্তরে লবণাক্ত পানি ঢুকে নষ্ট করে দিতে পারে সুপেয় পানির উৎসগুলো। সুন্দরবনে বেশ কিছু সুপেয় পানির পুকুর খনন করা হয়েছে। এসব পুকুরে নোনাপানি ঢুকে যাওয়ায় বন্যপ্রাণীরা সুপেয় পানির অভাবে পড়ে।

নদীমাতৃক বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান দুর্যোগ হলো বন্যা। বন্যায় যখন বন্যপ্রাণীদের আবাসস্থল পানির নিচে তলিয়ে যায়, বন্যপ্রাণীরা তখন আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে। সাপ, বেজি, শিয়ালসহ অন্যান্য বন্যপ্রাণীর জীবন তখন হুমকির মুখে পড়ে। অনেক প্রাণী পানিতে ভেসে যায়, খাদ্যাভাবে ও পানিতে ডুবে মারা পড়ে অনেক বন্যপ্রাণী, অনেক প্রাণী অপেক্ষাকৃত উঁচু লোকালয়ে চলে আসে আশ্রয়ের খোঁজে। এজন্য বন্যার সময়ে বাসাবাড়িতে সাপ আশ্রয় নিতে দেখা যায়। সাপের কামড়ে অনেক হতাহতের ঘটনাও ঘটে।

পাহাড়ি ঝিরিগুলো থেকে অবাধে পাথর উত্তোলনের ফলে পাহাড়ি নদী ও ঝিরিগুলোর প্রবাহমানতা কমে গিয়েছে। পাহাড়ে বড় বড় গাছের সংখ্যা কমে যাওয়ায় বৃষ্টি হলে পাহাড়ের মাটি ধুয়ে ঝিরিগুলোতে পড়ে সেগুলো ভরাট হয়ে যাচ্ছে, নদীগুলোর নাব্যতা কমে যাচ্ছে। ফলে অল্প বৃষ্টিতেই পাহাড়ি ঢল নেমে আসছে পাহাড় থেকে, অতিবৃষ্টিতে আকস্মিক বন্যায় পাহাড়ি নদীগুলোর দুইতীর প্লাবিত হচ্ছে। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বন্যপ্রাণীর আবাসস্থলগুলো, পাহাড়ি ঢলে দুই তীর প্লাবিত হওয়ায় বাসস্থান হারাচ্ছে বিভিন্ন বন্যপ্রাণী। সাম্প্রতিক সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমিধ্বসে বন্যপ্রাণীর আবাসস্থলের ক্ষতি সাধিত হচ্ছে, অনেক বন্যপ্রাণীর বাসস্থান ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এমনকি মাটির নিচে চাপা পড়ে মারা যাচ্ছে বন্যপ্রাণী। ঝিরি ও অন্যান্য সুপেয় পানির উৎসগুলোর প্রবাহও বাঁধাপ্রাপ্ত হচ্ছে ভূমি বা পাহাড় ধ্বসের কারণে। পাহাড় ধ্বসের কারণ হিসেবে পাহাড় কাটা, অবাধে গাছ কাটা, অপরিবর্তিত আবাসন, অনিয়ন্ত্রিত জুম চাষ এবং অতিবৃষ্টি উল্লেখযোগ্য। দুর্যোগের কারণ প্রাকৃতিক বা মনুষ্যসৃষ্ট যাই হোক না কেন, বন্যপ্রাণীর সুরক্ষা আমাদেরই নিশ্চিত করতে হবে।

5.2.9 পরিবেশ দূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন

সাম্প্রতিক সময়ে বন্যপ্রাণীর জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে পরিবেশ দূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন। শিল্পায়নের ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড ও অন্যান্য ক্ষতিকর গ্যাসের পরিমাণ বাড়ছে। এর ফলে হচ্ছে এসিড বৃষ্টি যার ফলে অরণ্যে মহামারীর সৃষ্টি হচ্ছে, খাদ্যশস্য বিষাক্ত হচ্ছে। আমাদের সবুজ অরণ্যগুলো খুব দ্রুত ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। বর্তমান বিশ্বের বনভূমির প্রায় ৮০ শতাংশই কিন্তু গ্রীষ্মমণ্ডলীয় সবুজ অরণ্য। শুধু অরণ্যই নয়, কৃষিজমির উর্বরতা কমে যাচ্ছে। ফলে পাল্লা দিয়ে কমে যাচ্ছে বন্যপ্রাণীর সংখ্যা। সুন্দরবনে জেলেদের জাল ও বিষ প্রয়োগের কারণে বিভিন্ন মাছ, কুমির ও অন্যান্য

বন্যপ্রাণীর মৃত্যু ঘটছে। শিল্প কারখানার বর্জ্য দূষণ এবং নৌযান চলাচলের ফলে সৃষ্ট দূষণের কারণে হুমকির মুখে পড়ছে কুমির ও ডলফিনের স্বাভাবিক প্রজনন।

যত্রতত্র প্লাস্টিকজাত দ্রব্য ফেলা হচ্ছে। প্লাস্টিকের বোতল ও মোড়ক, পলিথিন, অন্যান্য পচনশীল ও অপচনশীল দ্রব্য নির্দিষ্ট স্থানে না ফেলায় সেগুলো পরিবেশ দূষণ ঘটচ্ছে, বিভিন্ন জলাশয় ও নদীনালায় এসে জমা হচ্ছে। জলাশয়গুলো ভরাট হয়ে যাচ্ছে, নদীনালায় স্বাভাবিক প্রবাহ আটকে যাচ্ছে প্লাস্টিকের কারণে, জলাভূমিগুলো প্রাণীদের বসবাসের জন্য অনুপযোগী হয়ে পড়ছে। ইট ভাটার কারণে পরিবেশ ও বায়ুদূষণ ঘটছে। অন্যান্য কলকারখানা ও যানবাহন বায়ুদূষণের অন্যতম প্রধান কারণ। এছারাও উপরিউক্ত বিভিন্ন কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে মাটির উপরিভাগও। বিভিন্ন ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে বন্যপ্রাণীরা।

কৃষিক্ষেত্রে শস্য রক্ষার জন্য বিভিন্ন ধরনের কীটনাশক ওষুধ প্রয়োগ করা হচ্ছে। শিল্প কারখানার বিষাক্ত বর্জ্য নিষ্কাশন করা হচ্ছে নদী ও অন্যান্য জলাশয়ে। এসব বিপজ্জনক রাসায়নিক দ্রব্যের অনুপ্রবেশ ঘটছে বন্যপ্রাণীর শরীরে। জলাভূমির পরিবেশ নষ্ট হয়ে অক্সিজেন স্বল্পতা ও অন্যান্য বিষাক্ততায় প্রাণীশূন্য হয়ে পড়ছে জলাভূমিগুলো। বদলে যাচ্ছে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর জলবায়ু। গরমের তীব্রতা বাড়ছে, বাড়ছে শীতও, নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া পরিণত হচ্ছে চরমভাবাপন্ন আবহাওয়ায়। বদলে যাচ্ছে অরণ্যগুলো, খাপ খাওয়াতে না পেরে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন বন্যপ্রাণী।

5.2.10 বন্যপ্রাণীর অবৈধ শিকার ও বাণিজ্য

বিভিন্ন দেশে কচ্ছপ, হরিণ, হাতিসহ বিভিন্ন প্রাণী বা প্রাণীর অংশবিশেষের চাহিদা রয়েছে। দেশের ভিতরেও অনেকে শখের বশে বা অন্য কোনো কারণে হাতির দাঁত, হরিণের চামড়া, ধনেশ পাখির ঠোঁট ইত্যাদি সংগ্রহ করে। আবার কাছিম, হরিণ এবং পাখি বিশেষতঃ জলচর ও পরিযায়ী পাখির মাংস হিসেবে চাহিদা রয়েছে। এসব চাহিদার ফলে কিছু অসাধু মানুষ অবৈধ শিকার চালিয়ে যাচ্ছে।

অবৈধ শিকার ও বাণিজ্যের কারণে হুমকির মুখে পড়েছে বন্যপ্রাণী, যা বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের অন্যতম সমস্যা হয়ে দেখা দিচ্ছে। সুন্দরবনের আশেপাশের এলাকা ছাড়াও পার্বত্য জেলাগুলোতে বন্যপ্রাণী ও বন্যপ্রাণীর মাংসের কেনাবেচা ও খাদ্যতালিকায় এদের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়, যার সঠিক পরিসংখ্যান এখনো জানা যায়নি। প্রচুর সংখ্যক কচ্ছপ ও অন্যান্য বন্যপ্রাণী পাচারের সময় আটক করা হয় বিমানবন্দর, বেনাপোল ও অন্যান্য সীমান্তে।

তক্ষক নিয়ে একটি গুজব প্রচলিত আছে যে, তক্ষক বিদেশে কোটি টাকায় বিক্রি করা যায়। এসব গুজবের ফলে মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে লোভে পড়ে নিরীহ তক্ষক শিকার করে, কেউ আবার কোটি টাকায় বিক্রি করার লোভে সেগুলো উচ্চমূল্যে শিকারীর কাছ থেকে কিনেও নিয়ে যায়। অথচ, এই পুরো ব্যাপারটিই ভিত্তিহীন, একটি গুজব। আদতে তক্ষকের কোনো বিশেষ গুণাবলি নেই, এবং এটি বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত, ফলে বিদেশে এর উচ্চমূল্যও নেই। কিন্তু কিছু অসাধু মানুষ এসব গুজব ছড়িয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করে হাতিয়ে নিচ্ছে লাখ লাখ টাকা। আর এভাবে মানুষের লোভের শিকার হয়ে মারা যাচ্ছে শত শত নিরীহ তক্ষক।



পৃথিবীর অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্যে অনেক সমৃদ্ধ। এ জীববৈচিত্র্য তথা বন্যপ্রাণী ও এদের আবাসস্থল সংরক্ষণের জন্য দরকার সঠিক পরিকল্পনা, যুগোপযোগী নানা উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনা। বন্যপ্রাণীর সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ ও এদের বংশগতির ধারা অব্যাহত রাখার জন্য আমাদের দেশে সরকারি-বেসরকারি নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আমরা এই নিবন্ধে এসকল উদ্যোগসমূহ নিয়ে আলোচনা করবো যাতে শিক্ষার্থীরা এসব উদ্যোগ নিয়ে জানতে পারে ও বিভিন্ন কার্যক্রমে নিজেদের যুক্ত করতে পারে।

6.1 সরকারি উদ্যোগ:

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের অন্যতম শর্ত হলো আবাসস্থল রক্ষা করা। বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে সরকার নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধানের ১৮(ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জীববৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব রাষ্ট্রের। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এই কার্যক্রমের নেতৃত্ব প্রদান করে থাকে। এ লক্ষ্যে সারাদেশে বন অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের সকল অফিস কাজ করে যাচ্ছে। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কার্যক্রম ও বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল (<https://rb.gy/hvd83w>) ও বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট (<https://rb.gy/woy29r>) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

বন্যপ্রাণী ও বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল সংরক্ষণের লক্ষ্যে সরকারের বিভিন্ন দপ্তর কর্তৃক ইতোমধ্যেই বিভিন্ন রক্ষিত এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে। স্থানীয় জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করে ২২ টি সংরক্ষিত এলাকায় সহব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। সরকার কর্তৃক রক্ষিত এলাকার ইকোট্যুরিজম খাত হতে আয়ের ৫০ ভাগ এবং গৌণ বা অকাষ্ঠল বনজ দ্রব্য (সিলভিকালচার অপারেশন, যেমন ডালপালা কাটা বা পাতলাকরণ, মৎস্য আহরণ, ইত্যাদি) হতে আয়ের ১০০ ভাগ, অপ্রধান বনজ দ্রব্য (সুন্দরবনের মাছ, মধু, গোলপাতা ইত্যাদি) হতে আয়ের ৫০ ভাগ অর্থ রক্ষিত এলাকা সহব্যবস্থাপনা কমিটিকে প্রদান করা হচ্ছে।

বন্যপ্রাণীর প্রজনন ও বংশবিস্তার এবং শিক্ষা-গবেষণার সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কক্সবাজার ও গাজীপুরে দুটি সাফারী পার্ক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এছাড়াও, বন ও বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল সংরক্ষণ খাতের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও দক্ষ পরিচালনা নিশ্চিতকল্পে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি এবং মানসম্মত গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনার লক্ষ্যে গাজীপুরে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে শেখ কামাল ওয়াইল্ডলাইফ সেন্টার।

বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত জনমালের ক্ষতিপূরণ বিধিমালা, ২০২১ অনুমোদনের মাধ্যমে মানুষ ও বন্যপ্রাণীর দ্বন্দ্ব হ্রাস করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই বিধিমালা অনুযায়ী বাঘ, হাতি, কুমির, ভাল্লুক, বা সাফারী পার্কে বিদ্যমান বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত হলে কোন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা তার পরিবার বা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির

জন্য আবেদন করতে পারবেন। বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত হয়ে কোন ব্যক্তি যদি মৃত্যুবরণ করেন সেক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা; গুরুতর আহত ব্যক্তির ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ অনধিক ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা এবং সরকারি বনাঞ্চলের বাইরে লোকালয়ে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হলে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ অনধিক ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা।

সুন্দরবনের বাঘ আমাদের গর্ব। সুন্দরবনের বাঘ সংরক্ষণে সরকার বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহন করেছে। সুন্দরবনে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাঘ জরিপ করা হচ্ছে। ২০১৮ সালের বাঘ জরিপ অনুযায়ী সুন্দরবনে ১১৪টি বাঘ পাওয়া গিয়েছে। বাঘ সংরক্ষণের লক্ষ্যে সুন্দরবন সংলগ্ন ৪৯ টি গ্রামে স্থানীয় জনগনকে সঙ্গে নিয়ে ভিটিআরটি (ভিলেজ টাইগার রেসপন্স টিম) গঠন করা হয়েছে যারা বন থেকে লোকালয়ে চলে আসা বাঘ নিরাপদে বনে ফিরিয়ে দিয়ে সাহায্য করছে। পাশাপাশি ১৮৩ জন সিপিজি (কমিউনিটি পেট্রোলিং গ্রুপ) সদস্য সুন্দরবন সুরক্ষায় কাজ করছে। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিশেষ টহল ব্যবস্থা বা স্মার্ট পেট্রোলিং চালু করা হয়েছে। বাঘসহ সকল বন্যপ্রাণীর সুপেয় পানির জন্য সুন্দরবনে পুকুর খনন ও পুনঃখনন করা হয়েছে। তোমরা জানো স্থলভাগের সর্ববৃহৎ প্রাণী হাতি। বৃহৎ এই প্রাণীটি বর্তমানে মহাবিপন্ন অবস্থায় রয়েছে। হাতি মানুষ দ্বন্দ্ব বর্তমানে প্রকট আকার ধারণ করেছে। আমাদের দেশে যেসব হাতি পাওয়া যায় সেগুলো এশীয় হাতি (Asian Elephant), এদের মধ্যে দেশের বনাঞ্চলের স্থানীয় হাতি, আবার ভারত ও মিয়ানমার থেকে আসা আন্তঃদেশীয় হাতিও আছে। পাশাপাশি রয়েছে পোষা হাতি। হাতি ও এর আবাসস্থল সুরক্ষায় ইতোমধ্যেই দেশের অভ্যন্তরে হাতি চলাচলের পথ ও করিডোর এবং ট্রান্সবান্ডারি করিডোর চিহ্নিত করা হয়েছে। হাতির বিচরণ এলাকায় হাতি-মানুষ দ্বন্দ্ব নিরসণে স্থানীয় জনগনকে সাথে নিয়ে ১২০টি এলিফ্যান্ট রেসপন্স টিম গঠন করা হয়েছে। লোকালয়ে হাতি প্রবেশ বন্ধে রাজ্যমাটি জেলার কাপ্তাই এবং শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ি উপজেলায় বৈদ্যুতিক বেড়া বা সোলার ফেন্সিং স্থাপন করা হয়েছে। হাতি সমৃদ্ধ এলাকার বনাঞ্চলে জীববৈচিত্র্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য হাতির খাদ্য উপযোগী গাছের বাগান সৃজন করা হচ্ছে। হাতির সাথে শান্তিপূর্ণ সহবস্থানের লক্ষ্যে স্থানীয় জনসাধারণকে প্রশিক্ষণ ও প্রণোদনা দেওয়া হচ্ছে। পোষা হাতি দিয়ে রাস্তাঘাটে, বসতবাড়ীতে চাঁদা আদায় করতে দেখা যায়। এ ধরনের কাজ সম্পূর্ণ অবৈধ। কোনো ব্যক্তি হাতি দিয়ে চাঁদা উঠালে নিকটস্থ বন বিভাগ বা থানায় জানাতে হবে।

শকুন আমাদের অতি পরিচিত একটি পাখি। শকুন প্রকৃতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রকৃতির পরিচ্ছন্নতাকর্মী হিসেবে যাকে আমরা জানি সেই শকুনের সংখ্যা এশিয়াতে গত কয়েক দশকে আশংকাজনক হারে কমে গেছে। তবে আশার কথা হচ্ছে মহাবিপন্ন এই প্রজাতিকে টিকিয়ে রাখতে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহন করেছে বন বিভাগ। শকুন সংরক্ষণে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'বাংলাদেশ জাতীয় শকুন পুনরুদ্ধার কমিটি (বিএনভিআরসি)' গঠন করা হয়েছে। দেশের সুন্দরবন এবং সিলেট এলাকার শকুনের জন্য দুটি নিরাপদ এলাকা ঘোষণা করেছে সরকার, যা বিশ্বের একমাত্র সরকার অনুমোদিত শকুন নিরাপদ অঞ্চল। রেমা-কালেঙ্গা বনে শকুনের নিরাপদ এলাকায় প্রতি মাসে শকুনের জন্য নিরাপদ খাবার দেওয়া হচ্ছে। শীতকালে কিছু হিমালয়ী গ্রিফন প্রজাতির শকুন অসুস্থ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। অসুস্থ ও আহত শকুনের উদ্ধার ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দিনাজপুরের বীরগঞ্জের সিংড়ায় একটি শকুন উদ্ধার ও পরিচর্যা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। আমরা কী জানি, মৃত প্রাণীর দেহ থেকে ক্ষতিকর জীবাণু খেয়ে সাবাড় করে দেয় শকুন? শকুন হচ্ছে একমাত্র প্রাণী যে অ্যানথ্রাক্সে আক্রান্ত মৃত গরুর মাংস খেয়ে হজম করতে পারে। শকুন অপয়া নয়, শকুন প্রকৃতির বন্ধু। শকুন বনে ও লোকালয়ের উঁচু গাছে বসবাস করে। দেশে পুরোনো ও উঁচু গাছ কমে যাওয়ার পাশাপাশি পশু চিকিৎসায় ব্যবহৃত ব্যথানাশক ক্ষতিকারক ওষুধ ডাইক্লোফেনাক এবং কিটোপ্রোফেন শকুন বিলুপ্তির অন্যতম কারণ। সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে ডাইক্লোফেনাক এবং কিটোপ্রোফেন ওষুধ দুটি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। শকুন সংরক্ষণে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রতিবছর সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম শনিবার আন্তর্জাতিক শকুন সচেতনতা দিবস পালন করা হচ্ছে। আমাদের দেশের অভ্যন্তরীণ নদীগুলোতে একসময় প্রচুর পরিমাণ শুশুক দেখা যেত। জলজ পরিবেশের বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বজায় রাখাসহ প্রকৃতিতে এদের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। কিন্তু, নদীর ক্রমাগত পরিবর্তন, মাছ ধরার জালে আটকা পড়া, নৌযানের প্রোপেলারের আঘাত, পানি দূষণ, মানুষের সচেতনতার অভাব ইত্যাদি কারণে শুশুক বর্তমানে হুমকীর সম্মুখীন। শুশুক বা গাঙ্গেয় ডলফিন এর হুমকীগুলো চিহ্নিত করে এর সংরক্ষণেও বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশে বিদ্যমান ছয়টি ডলফিন অভয়ারণ্যের সাথে সুন্দরবনের ডলফিনের হটস্পটগুলো চিহ্নিত করে আরো নতুন তিনটি অভয়ারণ্যসহ মোট নয়টি ডলফিন অভয়ারণ্য ঘোষণা করা হয়েছে। ডলফিনের বিস্তার, বিশ্লেষণ এবং আবাসস্থল সংরক্ষণ সম্পর্কিত

প্রয়োজনীয় সকল তথ্যাবলী সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবহারের ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে। এছাড়াও, হালদা নদীতে ডলফিনের সংখ্যা নির্ণয় এবং ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। সুন্দরবনের ডলফিন সংরক্ষণের জন্য ডলফিন কনজারভেশন দল গঠন করা হয়েছে। উল্লিখিত কার্যক্রম সমূহ সফলতার সাথে সম্পন্ন করার ফলে সুন্দরবনে ডলফিনের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সুন্দরবনের তিনটি অভয়ারণ্য (চাংমারী, দুধমুখী ও চাঁদপাই) তে এ বৃদ্ধির হার ৫৫%, যা দেশের ডলফিন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করেছে। তবে শুশুক বা ডলফিন বাচিয়ে রাখতে তোমাদেরও সচেতন হওয়া প্রয়োজন। শুশুক যেহেতু পানি ছাড়া বেশিক্ষণ বেঁচে থাকতে পারে না তাই মাছের জালে ধরা পড়লে খুব দ্রুতই এদের পানিতে ছেড়ে দিতে হবে। শুশুক এর তেল ব্যবহারে বাত-ব্যথা বা কোন রোগ বলাই উপশম হয় না। এগুলো কুসংস্কার। এগুলো সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করা তোমাদের দায়িত্ব।

সুন্দরবনের করমজলে অবস্থিত বন্যপ্রাণী প্রজনন কেন্দ্রে নানা পানির কুমিরের প্রজনন কার্যক্রমের মাধ্যমে সুন্দরবনে কুমির এর সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। এই প্রজনন কেন্দ্রে লোনা পানির কুমিরের কৃত্রিম প্রজনন, লালন-পালন ও পরবর্তীতে প্রকৃতিতে অবমুক্তকরণের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। মহাবিপন্ন প্রজাতির বড় কাইট্রা (*Batagur baska*) এর সংরক্ষণ ও প্রজনন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য গাজীপুরের ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান এবং করমজলে ০২টি প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তির স্যাটেলাইট ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে এদের সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, কাছিমের প্রজননভূমি চিহ্নিতকরণ, অবৈধ শিকার ও বাণিজ্য বন্ধে জনসচেতনতা তৈরি ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া হলুদ পাহাড়ী কচ্ছপ (*Elongated tortoise*), শিলা কচ্ছপ (*Asian giant tortoise*) সংরক্ষণেও বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

আমাদের দেশে শীতকালে প্রচুর পরিমাণ অতিথি পাখির আনাগোনা দেখা যায়। অনেকেই এসব পাখিদের শিকার করে, সিলেটের অনেক হোটেলে এসব পাখির মাংস রান্না করে খাওয়া হয় যা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। বুনো পাখির মাংস থেকে মানবদেহে রোগ বলাই সংক্রমণের আশংকা থাকে। তবে বর্তমানে এসব পাখি সংরক্ষণে সরকারিভাবে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তোমাদের হয়তো ধারণা আছে একসময় আমাদের দেশে এয়ারগান দিয়ে প্রচুর পাখি শিকার করা হতো। পাখিসহ সকল বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের লক্ষ্যে এয়ারগান নিষিদ্ধ করে সরকারি আদেশ জারি করা হয়েছে।

উল্লিখিত সংরক্ষণ কার্যক্রম ছাড়াও উল্লুক, ঘড়িয়াল, কচ্ছপ, শাপলা পাতা, হাঙ্গর সহ অন্যান্য সকল বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে কাজ করে যাচ্ছে সরকার।

6.1.1 বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা

দেশের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'Bangladesh Wildlife (Preservation) Order 1973' ঘোষণা করেন। পরবর্তীতে উক্ত আদেশকে “বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও সংশোধন) আইন, ১৯৭৪” এরূপান্তর করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও সংশোধন) আইন, ১৯৭৪ কে রহিত করে নতুন “বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২” প্রণয়ন করা হয়। এই আইন দশটি অধ্যায় এবং ৫৪টি ধারায় বিভক্ত। আইনের সাথে চারটি তফসিল যুক্ত করা হয়েছে, তফসিলে বাংলাদেশের রক্ষিত বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদের প্রজাতিসমূহের উল্লেখ রয়েছে। বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ অনুযায়ী, তফসিলে উল্লেখিত বন্যপ্রাণী সমূহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত ধরা, মারা, পরিবহন, শিকার দণ্ডনীয় অপরাধ। ‘বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২’ এর অধীনে ৬টি বিধিমালা রয়েছে যা নিম্নরূপঃ

- [হরিণ ও হাতি লালন-পালন বিধিমালা, ২০১৭;](#)

- [HYPERLINK](#)

[“http://bforest.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bforest.portal.gov.bd/page/a2f633e5_8b6c_4213_b78c_ec966bd2a942/PA%20Rule%202017.pdf”](http://bforest.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bforest.portal.gov.bd/page/a2f633e5_8b6c_4213_b78c_ec966bd2a942/PA%20Rule%202017.pdf)রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৭;

- [HYPERLINK](#)

["http://bforest.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bforest.portal.gov.bd/page/a2f633e5_8b6c_4213_b78c_ec966bd2a942/dc63df462adcdba3a3e29181a93e9628.pdf"](http://bforest.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bforest.portal.gov.bd/page/a2f633e5_8b6c_4213_b78c_ec966bd2a942/dc63df462adcdba3a3e29181a93e9628.pdf)কুমির লালন-পালন বিধিমালা, ২০১৯;

- [HYPERLINK](#)

["http://bforest.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bforest.portal.gov.bd/page/a2f633e5_8b6c_4213_b78c_ec966bd2a942/2020-02-06-11-57-1a17fa6d80b997c3cf316ac52089279f.pdf"](http://bforest.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bforest.portal.gov.bd/page/a2f633e5_8b6c_4213_b78c_ec966bd2a942/2020-02-06-11-57-1a17fa6d80b997c3cf316ac52089279f.pdf)পোষা পাখি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২০;

- অপরাধ উদঘাটনে (তথ্য প্রদানকারী) পুরস্কার প্রদান বিধিমালা, ২০২০
- বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত জানমালের ক্ষতিপূরণ বিধিমালা, ২০২১।
এসকল আইন এবং বিধিমালা সমূহের সূষ্ঠ প্রয়োগের মাধ্যমেই বন্যপ্রাণীকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব। আইন ও বিধিমালার লিংক (<https://rb.gy/gg6k4j>)

6.1.2 বন্যপ্রাণী সম্পর্কিত অপরাধ সমূহঃ

বিশ্বে অবৈধ পণ্যের বাজারের তালিকায় চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে বন্যপ্রাণী। বছরে ২৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের বন্যপ্রাণী কেনাবেচা হয়, যার বড় অংশ বিত্তশালীদের শৌখিন চিড়িয়াখানা ও পার্কে আটকে রাখার জন্য কেনা হয়। এ ছাড়া চীন, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনামসহ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে বন্যপ্রাণীর শরীরের বিভিন্ন অংশ খাবার ও ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর বাইরে ব্যাগ, বেল্ট, গৃহশয্যা ও উপহারের সামগ্রী এবং গয়না তৈরিতে বন্যপ্রাণীর চামড়া, দাঁত ও নখের বিপুল ব্যবহার আছে। গবেষণার তথ্যানুযায়ী দেশের মোট ২৮ জেলায় হটস্পট হিসেবে বন্যপ্রাণী বেচাকেনা চলে। এসব জেলা থেকে বন্যপ্রাণী ধরে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় আনা হয়। ঢাকা থেকে উড়োজাহাজে, খুলনায় স্থলপথে ও চট্টগ্রামে সমুদ্রপথে প্রাণী পাচার করা হয় পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে।

জীবন্ত বন্যপ্রাণী সবচেয়ে বেশি পাচার হচ্ছে প্রতিবেশী দেশ ভারত ও মিয়ানমারে। আর উড়োজাহাজ ও জাহাজযোগে থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, চীন, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম ও লাওসে প্রাণী পাচার করা হচ্ছে। এসব প্রাণীর মধ্যে রয়েছে রয়েল বেঙ্গল টাইগার, বিভিন্ন প্রজাতির কচ্ছপ, মুখপোড়া হনুমান, লজ্জাবতী বানর, বিষধর সাপ, তক্ষক, ছোট সরীসৃপ, বিভিন্ন প্রজাতির পাখিসহ প্রভৃতি বন্যপ্রাণী। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে বাংলাদেশে বন্যপ্রাণী অপরাধের পথ বা দিক পরিবর্তন হয়েছে বিভিন্ন ভাবে। এসকল অপরাধের বিভিন্ন চিত্রসমূহ নিম্নরূপঃ

- মানুষ নিজের অজান্তেই বা না বুঝে অনেক ধরনের বন্যপ্রাণী অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায়, যেমন অনেক সময় শালিক, চড়ুই, কাক, চিল, ময়না, টিয়া ইত্যাদি পাখি ধরে বা লালন-পালন করে এবং অনেক ক্ষেত্রে ঘরের টিকটিকি, দাড়া সাপ, গুইসাপ, গিরগিটি, বেজি ইত্যাদি প্রাণী দেখলেই তাদেরকে মেরে ফেলে, যা বন্যপ্রাণী অপরাধের সামিল।
- পৃথিবীব্যাপী বন্যপ্রাণীর একটি রমরমা অবৈধ বাণিজ্য আছে। বন্যপ্রাণীর অবৈধ ব্যবসার সাথে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের বিনিময় হয়। বাংলাদেশ থেকে বাঘ, বনরুই, বিভিন্ন ধরনের কচ্ছপ, ভাল্লুক, লজ্জাবতী বানর, তক্ষকসহ বন্যপ্রাণীর দেহাংশ বা ট্রফি যেমন বাঘ-হরিণের চামড়া, বাঘের দাঁত, হাড়, হাতির দাঁত, সাপের বিষ, ইত্যাদির অবৈধ পথে ব্যবসা-বাণিজ্য হয়ে থাকে।
- বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, বাংলা বাড়ি, বড় বড় শিল্প কারখানা, রিসোর্ট, অবৈধ মিনি চিড়িয়াখানায় বন্যপ্রাণীদের বন্দি রেখে চিত্তবিনোদনের প্রচেষ্টা চালানো হয়। ফলে বন্যপ্রাণীদের প্রজনন, বংশবিস্তার ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় বড় ধরনের প্রতিকূলতা তৈরি হয়।

- বিভিন্ন হাট-বাজার, দোকানে বিক্রেতারা বন্যপ্রাণীদের খাঁচায় রেখে ক্রয়-বিক্রয় করার জন্য নিয়ে আসে। টিয়া, ঘুঘু, শালিক, ডাছক, ময়নাসহ বিভিন্ন ধরনের অতিথি পাখি এবং অন্যান্য প্রাণী যেমন শিয়াল, বন বিড়াল, বেজী, বানর, এসকল হাট-বাজারে ক্রয়-বিক্রয় হয়।
- সমাজে বিভিন্ন বন্যপ্রাণী নিয়ে নানা ধরনের কুসংস্কার প্রচলিত আছে। এদের মধ্যে পেঁচার ডাক, বিজোড় শালিক দেখলে যাত্রা ভঙ্গ, শকুনের আগমণ ইত্যাদি অশুভ লক্ষণ, হরিণের মাংস খেলে যাত্রা শুভ হয়, শিয়ালের তেল, বাদুড়ের মাংস, সাপের মাংসতে বাত ব্যথা ভালো হয়, কচ্ছপ, বনরুই এর মাংস খেলে পুরানো রোগ সারে ও মানুষ দীর্ঘায়ু হয় ইত্যাদি। এসকল কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের ফলে অকারণে বন্যপ্রাণীদের হত্যা করা হচ্ছে।
- সমাজে পিছিয়ে পড়া বা অসচেতন মানুষ কবিরাজি চিকিৎসায় বেশি বিশ্বাস করে। বিভিন্ন ধরনের টোটকা ঔষধ, তাবিজ-কবজ তৈরিতে বন্যপ্রাণীর চামড়া, তেল, মাংস, হাড় ইত্যাদি ব্যবহার করা হয় যা বন্যপ্রাণী অপরাধ।
- পাহাড়ি বা সমতলের অনেক ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সম্প্রদায়ের লোকেরা বিভিন্ন ধরনের বন্যপ্রাণী শিকার করে প্রোটিনের উৎস হিসেবে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। ফলে পাহাড়ি অঞ্চলের বন্যপ্রাণীরা ক্রমান্বয়ে হুমকির মুখে পড়েছে।
- গ্রাম অঞ্চলে অনেকেই মেছো বিড়ালকে মেছোবাঘ নামে জানে, ফলে অনেকেই এই ধরনের বিড়ালগোত্রীয় প্রাণীদের বাঘের মত হিংস্র মনে করে। ফলে মানুষ এসব প্রাণী পেলেই এদের ওপর আক্রমণ করে হত্যা করে ফেলে।
- কিছুদিন আগে মৌলভিবাজারে শিয়াল মারার জন্য মৃত ছাগলে বিষ মিশিয়ে দেয় কিছু দুষ্ট লোক। উক্ত ছাগলের বিষাক্ত মাংস খেয়ে ১৩ টি শকুনের মৃত্যু হয়। এ ধরনের ঘটনা কোন ভাবেই কাম্য নয়। খাদ্য শৃঙ্খলের যে কোন স্তরে বিষ প্রয়োগ করলে পুরো বাস্তুতন্ত্রে বিপর্যয় নেমে আসে।
- বন্যপ্রাণীর ট্রফি যেমন বন্যপ্রাণীর (বাঘ, অজগর সাপ, লজ্জাবতী বানর, গুঁইসাপ, চিতা বাঘ, মেছো বিড়াল, কুমির) চামড়া দিয়ে বিভিন্ন ধরনের বেল্ট, মানিব্যাগ, ভ্যানিটি ব্যাগ, জুতা, পার্স ইত্যাদি তৈরি করা হয়। হাতির দাঁত, বনরুই এর আইশ দিয়ে বিভিন্ন ধরনের অর্নামেন্টস, পোশাকের বোতাম ইত্যাদি তৈরি করা হয়। তাছাড়া অনেক বন্যপ্রাণীর মাংস চাইনিজ ফুড হিসাবে বিভিন্ন রেস্টুরেন্টের খাদ্য তালিকায় দেখা যায়।
- বর্তমানে বিভিন্ন নাটক, সিনেমা, বিজ্ঞাপন, ইত্যাদিতে বিভিন্ন ধরনের বন্যপ্রাণীকে আটক করে ব্যবহার করে প্রদর্শন করা হয়। যার ফলে দর্শক ও দর্শনার্থীদের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বন্যপ্রাণীদের লালন-পালনে উৎসাহিত হয়।
- অনলাইনে বন্যপ্রাণীর ব্যবসা অত্যন্ত সহজ ও লাভজনক হওয়ায় বর্তমানে বন্যপ্রাণীর অসাধু ব্যবসায়ীরা এ মাধ্যমকে প্রধান মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছে। ইউটিউব, ফেসবুক, ইন্সট্রাগ্রাম, হোয়াটসগ্র্যাপ, বিক্রয় ডট কম, দারাজ, ইমো ইত্যাদি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ এর ধারা ৬(১) এ বলা হয়েছে, লাইসেন্স বা অনুমতি ছাড়া কোনো ব্যক্তি কোনো বন্যপ্রাণী শিকার ও সংগ্রহ করতে পারবেন না। আইনের ধারা ৬ মোতাবেক এই আইনের তফসিলে উল্লেখিত বিভিন্ন প্রজাতির বন্যপ্রাণী শিকার বা বন্যপ্রাণীর মাংস, ট্রফি, অসম্পূর্ণ ট্রফি, বন্যপ্রাণীর অংশবিশেষ অথবা এসব হতে উৎপন্ন দ্রব্য দান, বিক্রয় বা হস্তান্তর করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়াও

আইনের ধারা ৪১ এ উল্লেখ রয়েছে যে, কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সহায়তা করলে বা প্ররোচনা প্রদান করলে এবং উক্ত সহায়তা বা প্ররোচনার ফলে অপরাধটি সংঘটিত হলে, উক্ত সহায়তাকারী বা প্ররোচনাকারী উল্লিখিত অপরাধের জন্য নির্ধারিত দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। উক্তরূপ অপরাধে তিনি সর্বোচ্চ এক বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। একই অপরাধ আবারও করলে সেক্ষেত্রে সর্বোচ্চ তিন বছরের কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ দুই লাখ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

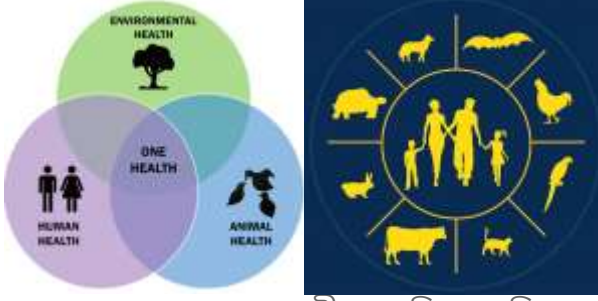
6.1.3 বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট

ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ দেশ। বাংলাদেশের বন, অভ্যন্তরীণ জলাভূমি এবং বঙ্গোপসাগরে অসংখ্য বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল। এসব বন্যপ্রাণীর অনেক প্রজাতিই পৃথিবীতে মহাবিপন্ন, বিপন্ন ও সংকটাপন্ন। তবে জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ মানবসৃষ্ট নানান কারণে এই বিপুল জীববৈচিত্র্য এখন হুমকির সম্মুখীন। বাংলাদেশে বন্যপ্রাণীর সংখ্যা কমে যাওয়ার অন্যতম কারণ হলো বন্যপ্রাণী সংশ্লিষ্ট অপরাধসমূহ ও আবাসস্থল বিনষ্ট। অবৈধভাবে বন্যপ্রাণী শিকার ও আবাসস্থল বিনষ্টের ফলে অসংখ্য বন্যপ্রাণী আজ বিলুপ্তপ্রায়। বন্যপ্রাণী শিকার এবং হত্যা করে বন্যপ্রাণীর চামড়া, দাঁত, হাড়, এমনকি জীবন্ত বন্যপ্রাণীও বিদেশে পাচার করা হয়। এছাড়াও, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে প্রণীত আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা না মেনে চলাও অপরাধের অন্তর্ভুক্ত। এসব অপরাধ দমনের উদ্দেশ্যে বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ এর ৩১ ধারা মোতাবেক ২০১২ সালে বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট গঠন করা হয়। বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট বন্যপ্রাণী শিকার, মারা ও ক্রয়-বিক্রয় রোধকরণ, বন্যপ্রাণী অপরাধ এবং অপরাধী শনাক্তকরণ, বন্যপ্রাণী অপরাধ দমনে সারাদেশে অভিযান পরিচালনা করা, গনসচেতনতা সৃষ্টি এবং দেশের বন্দর সমূহে (স্থল বন্দর, বিমান বন্দর, সমুদ্র বন্দর) বন্যপ্রাণীর পাচার রোধে অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা-পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি, কোস্টগার্ড ও কাস্টমস এর সাথে সমন্বয় করে কাজ করে থাকে। তাছাড়া অবৈধভাবে বন্যপ্রাণীর আমদানি-রপ্তানি প্রতিহত করতে বাংলাদেশ কাস্টমস হাউজের সহযোগিতায় এই ইউনিটটি বিভিন্ন বন্দরসমূহ বিশেষ করে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে বন্যপ্রাণী আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে টহল ও চেকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কনভেনশন, প্রটোকল, চুক্তি ইত্যাদির সঠিক প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবার জন্য বেশ কিছু দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বেসরকারী সংস্থার সাথে এই ইউনিটটি সম্পৃক্ত। এ সকল সংস্থা সমূহের মধ্যে CITES, CBD, CMS, GTF, UNODC, INTERPOL, SAWEN, TRAFFIC, IUCN, ICITAP-American Embassy, US FOREST & WILDLIFE SERVICE, WCS, USAID উল্লেখযোগ্য। অত্র ইউনিটে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণের মোবাইল নম্বর – ০১৯৯৯০০০০৯৫, ০১৭১৩০৭৬৬৮৩, ০১৯১৬০৯৫৬৪৩, ০১৭৪৭০৩৬২৩৭, ০১৬১১৭৮৬৫৩৬ (জাতীয় জরুরী সেবা নম্বর ৯৯৯ এর সাথে সংযুক্ত) মাধ্যমে বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত জরুরী সেবা দিয়ে থাকেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বছরে প্রায় ১০/১১ হাজার সিটিজেন এর বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান করা হয়। অধিকন্তু ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন পর্যায়ে প্রায় ১০ হাজারের অধিক স্বেচ্ছাসেবী রয়েছে; যাদের তথ্য ও সহযোগিতায় মাঠ পর্যায়ে উদ্ধার অভিযান এবং জনসচেতনমূলক কার্যক্রমে সহযোগিতা নেয়া হয়। সঠিক তথ্য প্রদানকারীকে অপরাধ উদঘাটনে (তথ্য প্রদানকারী) পুরস্কার ২০২০ বিধিমালার আলোকে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আর্থিক পুরস্কার প্রদান করা হয়। ২০১৬ সালে এ ইউনিটে একটি ওয়াইল্ডলাইফ ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন করা হয়। ল্যাবটিতে বন্যপ্রাণী অপরাধে জড়িত আলামত বা ট্রফির নমুনা থেকে বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ প্রয়োগের নিমিত্তে প্রজাতি চিহ্নিত করা হয় এবং এর ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের বন্যপ্রাণীর DNA বারকোড ডেটাবেস তৈরী লক্ষ্যে কাজ চলছে।

বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট কর্তৃক ধারাবাহিক অভিযানের মাধ্যমে জুলাই ২০১২ থেকে জানুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত মোট ৪৫,৪৩৬ টি বন্যপ্রাণী (উভচর, স্তন্যপায়ী, সরীসৃপ, পাখি) উদ্ধার করে প্রকৃতিতে অবমুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া ১৪০৫ টি ট্রফি উদ্ধার এবং ১৩৯ টি মামলা দায়েরসহ ২০৮ জন অপরাধীকে জরিমানা ও কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।

6.1.4 বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট

ওয়ান হেলথ ধারণা কতটা গুরুত্বপূর্ণ সবশেষ কোভিড মহামারীর পর আমরা আনুধাবন করতে পেরেছি। বৈজ্ঞানিকভাবে এটা প্রমাণিত- বিশ্বের অন্তত ৭০ শতাংশ সংক্রামক রোগ প্রাণীদেহ থেকে উৎপত্তি হয়, পরে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। যেসব রোগ পশুপাখি হতে মানুষে এবং মানুষ হতে পশুপাখিতে সংক্রমিত হয়, তাদের জুনোটিক রোগ (Zoonotic Diseases) বলে।



মানুষের স্বাস্থ্য, মৎস্য বা প্রাণী স্বাস্থ্য কিংবা পরিবেশ-একটা আরেকটার উপর নির্ভরশীল। সবটা মিলিয়েই পৃথিবীর স্বাস্থ্য, মানুষের স্বাস্থ্য। তাই, ভবিষ্যৎ পৃথিবীর জন্য One Health বা একক স্বাস্থ্যনীতির ধারণা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। বৈশ্বিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে নতুন নতুন বসতি গড়ে উঠছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে এবং কৃষি ও শিল্পের প্রসারের কারণে বনের পরিমাণ কমে যাচ্ছে। এসব কারণে জীবজন্তুর সংস্পর্শে আসার সুযোগ বাড়ছে। বাংলাদেশে ওয়ান হেলথ প্রোগ্রামের অন্যতম প্রধান অংশীদার হিসেবে, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীনে বন বিভাগ ও পরিবেশ অধিদপ্তর ট্রান্স-ডিসিপ্লিনারি গবেষণা, যৌথ প্রাদুর্ভাবের তদন্ত বাস্তবায়নের জন্য ওয়ান হেলথের সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারদের সাথে সহযোগিতা করছে। জুনোটিক রোগের প্রাদুর্ভাব তদন্ত এবং প্রশিক্ষণসহ জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি, এবং অন্যান্য কার্যক্রমের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। কোথাও কোনো রোগাক্রান্ত প্রাণীর মৃতদেহ পাওয়া গেলে সাথে সাথে বন অধিদপ্তর, রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনিস্টিটিউট (আইইডিসিআর, হট লাইন নম্বর ১০৬৫৫), প্রাণীসম্পদ অধিদপ্তরকে বা নিকটস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে জানাতে হবে।

6.1.5 বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে পুরস্কারসমূহ:

বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমকে অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে বৃক্ষরোপণে বিশেষ অবদান রাখা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার প্রদান করা হয়ে থাকে। বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার প্রদানের নীতিমালা (সংশোধনী), ২০২১ অনুযায়ী ৭ টি শ্রেণিতে এ পুরস্কার প্রদান করা হয়ে থাকে। পুরস্কারের অর্থের পরিমাণ, ১ম পুরস্কার ১ লক্ষ টাকা, ২য় পুরস্কার পঁচাত্তর হাজার টাকা এবং ৩য় পুরস্কার পঞ্চাশ হাজার টাকা।

একইভাবে, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কার্যক্রমকে গতিশীল করা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত শিক্ষা, গবেষণা ও বিশেষ অবদানের জন্য 'বঙ্গবন্ধু অ্যাওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন' প্রদান করা হয়ে থাকে। মোট তিনটি শ্রেণিতে এই পুরস্কারটি দেওয়া হয়, যথা: বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে নিবেদিত ব্যক্তি, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য বিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণায় নিবেদিত ব্যক্তি এবং বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে নিবেদিত প্রতিষ্ঠান। 'বঙ্গবন্ধু অ্যাওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন' এর প্রতিটি শ্রেণিতে পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দুই ভরি স্বর্ণের বাজারমূল্যের সমপরিমাণ নগদ টাকা এবং পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক ও সনদ পেয়ে থাকেন।

বন্যপ্রাণী অপরাধকে নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকার অপরাধ উদঘাটনে (তথ্য প্রদানকারী) পুরস্কার প্রদান বিধিমালা, ২০২০ প্রণয়ন করেছেন। এক্ষেত্রে বিধিমালায় উল্লিখিত শর্তসমূহ পূরণ করে বন্যপ্রাণী অপরাধ সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করলেই দেওয়া হচ্ছে অপরাধ উদঘাটনে (তথ্য প্রদানকারী) পুরস্কার।

6.2 বেসরকারি ও অন্যান্য উদ্যোগ

বর্তমানে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি এমনকি ব্যক্তিগত পর্যায়েও নানান উদ্যোগ গৃহীত হচ্ছে। 'পিটাছড়া বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ উদ্যোগ' এর মাধ্যমে মাটিরাজার পূর্বখেদার নিভূত অরণ্যবেষ্টিত পিটাছড়ায় ২৩ একরের প্রাকৃতিক বন গড়ে তুলেছেন চট্টগ্রামের মাহফুজ রাসেল নামের এক তরুণ। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২২ সালে পিটাছড়ায় দেখা মেলে বিপন্ন হলুদ পাহাড়ি কাছিম যা চাকমা ভাষায়

‘পারবো ডুর’ নামে পরিচিত। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি আদিবাসীরা অনেক আগে থেকেই তাঁদের নিজ নিজ পাড়ায় পানির উৎসগুলোকে বাঁচানোর জন্য ছোট ছোট বনাঞ্চল সংরক্ষণ করেছেন যেগুলো পাড়াবন বা মৌজাবন (ইংরেজিতে Village Common Forest -VCF) নামে পরিচিত। এসব পাড়াবন পাহাড়ি বনের প্রাণীদের আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বন আচ্ছাদন ফিরে আসার কারণে এখন ক্যাম্পাসে হরিণ, শূকর, বনমোরগ, সজারুসহ অনেক জাতের সাপ, ব্যাঙ ও পাখির নিরাপদ আশ্রয় হয়ে উঠেছে ক্যাম্পাসের বন।

পাবনার বেড়া উপজেলার কৈটোলা গ্রামে সাড়ে ছয় বিঘা জমিতে পাখিদের জন্য অভয়াশ্রম গড়েছেন আকাশ কলি দাশ। সেই জমিতে কোনো এক সময় গড়ে তোলা একটি মাটির ঘরেই থাকেন আকাশ। ৮৭ বছর বয়সী এই পাখিপ্রেমীকে সহযোগিতা করেন তার ছোট বোন বর্ণা দাশ (৭৩)। বর্ণা জীবনের অধিকারী তিনি ছিলেন উপজেলার মাছখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। শিক্ষকতার শুরুর দিকেই পাখিপ্রেমে পড়েন তিনি। নগরায়নের ফলে পাখিরা যখন আবাস হারাচ্ছে, তখন এদের নিরাপদে থাকার জন্য নিজের বসতভিটাই উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। প্রায় পাঁচ দশক ধরে প্রকৃতি আর পাখি সংরক্ষণ করছেন তিনি। আকাশের সেই জন্মভিটাই এখন পাখিদের অভয়াশ্রম।

ঝিনাইদহ জেলার জহির রায়হান পেশায় একজন রং মিস্ত্রী। পেশায় রং মিস্ত্রী হলেও ২০০২ সাল থেকে তিনি নিজ উদ্যোগে ঝিনাইদহ জেলাসহ পাশ্চাত্য অন্যান্য জেলার পাখিসহ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, চোরা শিকারীদের হাত থেকে পাখি ও পরিযায়ী পাখি উদ্ধার, বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি নানাবিধ কার্যক্রমের মাধ্যমে বন্যপ্রাণী ও বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল সংরক্ষণে কাজ করে চলেছেন।

6.3 জনসম্পৃক্ততা

বাংলাদেশের রক্ষিত এলাকাসমূহের ব্যবস্থাপনার জন্য স্থানীয় বন-নির্ভর জনগোষ্ঠী এবং সুশীল-সমাজের অংশগ্রহণে সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। স্থানীয় জনগোষ্ঠী রক্ষিত এলাকার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সাথে সম্পৃক্ত হওয়ায় বন্যপ্রাণী শিকার এবং বনের সম্পদ অবৈধভাবে আহরণ উল্লেখযোগ্যহারে কমে যাচ্ছে, ফলে বনজ সম্পদ রক্ষিত হচ্ছে। সহ-ব্যবস্থাপনার ফলে রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেয়েছে, বন অপরাধ ও বনজসম্পদের পাচার উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। একইসাথে বৃদ্ধি পাচ্ছে বনে পর্যটকদের সংখ্যা। এসব রক্ষিত এলাকায় পর্যটন থেকে অর্জিত আয়ের ৫০% ল্যান্ডস্কেপ উন্নয়ন ও জনগোষ্ঠীর কল্যাণে ব্যয় করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের মাধ্যমে রক্ষিত এলাকা, পাহাড়ি, শাল ও উপকূলীয় এলাকা সংলগ্ন ৬০০ গ্রামের ৪০,০০০ বন-নির্ভর পরিবারকে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে বন পুনরুদ্ধার করা হচ্ছে।

দিনশেষে বন এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কেবলমাত্র বন অধিদপ্তরের তথা সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই বনপ্রাণী সংরক্ষণে জনগণের সচেতনতা এবং অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতেও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বনভূমি এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে সাধারণ জনগণকে উদ্ধুদ্ধ করা হচ্ছে। বন অধিদপ্তর বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে সচেতনতা সৃষ্টি করতে প্রায় সকল প্রকল্পের অধীনে সেমিনার সহ আলোচনা সভার উদ্যোগ নিয়েছে। ডলফিন সংরক্ষণে সচেতন করতে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের নিয়ে আয়োজিত হচ্ছে ডলফিন মেলা। এছাড়াও বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট অপরাধ দমন ও গণসচেতনতা সৃষ্টিতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।



বন্যপ্রাণী শব্দটি ইংরেজি Wildlife থেকে উৎপন্ন হলেও Wildlife এর প্রকৃত বঙ্গানুবাদ হলো বন্যজীব বা বন্যপ্রাণ। প্রাণী, উদ্ভিদ ও অন্যান্য ক্ষুদ্রপ্রাণ মিলেই তো আমাদের জীবজগৎ। যেসকল প্রাণী গৃহপালিত নয় অর্থাৎ এদের জীবনধারণের জন্য মানুষের উপর নির্ভর করতে হয়না, তাদেরকে বন্যপ্রাণী বলা হয়। আর বন্যপ্রাণীর চারপাশের যে প্রাকৃতিক পরিবেশ, তার মধ্যেই সকল উদ্ভিদ ও অন্যান্য জীব অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। সেই হিসেবে Wildlife এর মানে দাঁড়ালো বন্যপ্রাণ অথবা বন্যপ্রাণী ও তার পরিবেশ।

বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে বেঁচে থাকা সকল প্রাণীই বন্যপ্রাণীর অন্তর্ভুক্ত। যেমনঃ বাঘ, চিতা, ভোঁদর, টোঁড়াসাপ, মাছরাঙা এরা সবাই বন্যপ্রাণী। আবার বন্যপ্রাণী হলেই যে স্থলভূমিতে বাস করতে হবে এমন কথা নেই। এরা জলেও থাকতে পারে। যেমনঃ তিমি, শুশুক ও অন্যান্য জলজ প্রাণীরাও কিন্তু বন্যপ্রাণী। আবার মানুষের বাড়িতে বা খামারে যে গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী পালন করা হয়, এরা কিন্তু বন্যপ্রাণী নয়। কারণ এরা মানুষের সাহায্য ছাড়া বাঁচতেই পারবে না। তবে ঘরে যে টিকটিকি দেখতে পাওয়া যায়, তারা কিন্তু আবার বন্যপ্রাণী। কারণ তাদের বেঁচে থাকার জন্য মানুষের সাহায্যের দরকার হয়না। এজন্য এরা বন-জঙ্গলে না থাকলেও এরা বন্যপ্রাণীর অন্তর্ভুক্ত। টিকটিকির মতো আরও অনেক প্রাণী মানুষের এত কাছাকাছি বসবাস করে যে এদেরকে বন্যপ্রাণী হিসেবে ভাবতে ইচ্ছা করে না আমাদের। যেমনঃ চড়ুই পাখি, জালালী কবুতর, ইঁদুর ইত্যাদি। এরা যতোই লোকালয়ের কাছাকাছি বসবাস করুক, মানুষের সাহায্য ছাড়াও এরা খাদ্য সংগ্রহ, প্রজনন ও বাসস্থান তৈরির ক্ষমতা রাখে। তাই এরাও বন্যপ্রাণী।

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা ছাড়াও বন্যপ্রাণীর কিন্তু অনেক ধরনের গুরুত্ব রয়েছে। আমাদের মানবজাতির বেঁচে থাকার জন্য, এমনকি চিকিৎসাবিজ্ঞান, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও এর গুরুত্ব অনেক। বন্যপ্রাণী ও তার সাথে সম্পৃক্ত জীবসমূহের মাধ্যমে প্রাকৃতিক জলাধারগুলো পরিশোধিত হয়, ফলে সেখানে মাছেরা বংশবিস্তার করতে পারে। বন্যপ্রাণী না থাকলে ময়লা পানির কারনে সব মাছ বিলুপ্ত হয়ে যেত নদী-নালা খাল-বিল থেকে।

প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষা করে অর্থনৈতিক ক্ষতি থেকেও মানুষকে রক্ষা করে বন্যপ্রাণী। একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। ১৯৭০-৮০ সালের দিকে বাংলাদেশ বিদেশে প্রচুর ব্যাঙের পা রপ্তানি করতে শুরু করলো, কারণ বিদেশে ব্যাঙের পা রান্না করে খাওয়ার খুব চাহিদা ছিল। রপ্তানির জন্য ব্যাঙ শিকারের কারণে আমাদের দেশে ব্যাঙের সংখ্যা অনেক কমে গেল। আর ব্যাঙের প্রিয় খাদ্য কীট-পতঙ্গ।

ফলে দেশে কীট-পতঙ্গের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেল, আর তারা আমাদের সব ফসল খেয়ে ফেলতে লাগলো। কৃষকরা ফসল বাঁচাতে প্রচুর পরিমাণ কীটনাশক বিষ ব্যবহার করা শুরু করলো। হিসেব করে দেখা গেলো, ব্যাঙের পা রপ্তানি করে বাংলাদেশ যে টাকা আয় করলো, তার থেকে বেশি টাকা কীটনাশক কিনতে খরচ হয়ে গেল। তাহলে ব্যাঙ শিকার করে লাভ হলো, নাকি উলটো ক্ষতিই হলো?

তারপর ধরো, আমাদের সুন্দরবনের বাঘ দেখতে প্রতিবছর অনেক পর্যটক সুন্দরবনে বেড়াতে আসে, এমনকি বিদেশ থেকেও অনেকে আসে। টাঙ্গুয়ার হাওরসহ অন্যান্য স্থানে অতিথি পাখি দেখতে ভীড় করে পর্যটকেরা। এরকম আরও অনেক বন্যপ্রাণী আছে, যাদের দেখতে পর্যটকেরা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে আসে। এভাবে বাঘ, অতিথি পাখি ও অন্যান্য বন্যপ্রাণীরা দেশের অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখে। আমরা এখন যে মুরগী খাই, এটি কিন্তু অনেক বছর আগে বনমোরগকে জঙ্গল থেকে নিয়ে এসে গৃহপালিত করারই ফলে সম্ভব হয়েছে। এভাবে হাঁস, গরু, ছাগল এবই কিন্তু কোনো না কোনো বন্যপ্রাণী থেকে আগত।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিভিন্ন গবেষণায় বন্যপ্রাণী ব্যবহার করা হয়।। বিভিন্ন ঝড়, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস থেকে সুন্দরবন সহ অন্যান্য বনগুলো আমাদেরকে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা করে। বন্যপ্রাণী না থাকলে কিন্তু এসব বনও বিলুপ্ত হয়ে যেত। বন বাঁচিয়ে রাখে প্রাণীকে, আর প্রাণী বাঁচিয়ে রাখে বনকে। বন্যপ্রাণী না থাকলে ফুলের পরাগায়ন হয়ে ফসল ফলবে না, ফল হবে না, উদ্ভিদের বীজ দূরদুরান্তে ছড়িয়ে পড়বে না।

মানুষের হাজার বছরের শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতিতেও কিন্তু বন্যপ্রাণীর অবদান অনেক। ছোটবেলায় সবাই নিশ্চয় এই কবিতা পড়েছে:

আয়রে আয় টিয়ে
নায়ে ভরা দিয়ে,
না' নিয়ে গেল বোয়াল মাছে,
তাই না দেখে ভোঁদড় নাচে।

আরেকটু বড় হয়ে পড়েছে জীবনানন্দের কবিতা:

আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে – এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয় – হয়তো বা শঙখচিল শালিকের বেশে,
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে

বিভিন্ন দেশীয় রূপকথা যেমন ঠাকুরমা'র ঝুলিতে নিশ্চয় অনেক বাস্তব ও কাল্পনিক প্রাণীর কথা পড়েছে। এছাড়া প্রাচীন সাহিত্য চর্যাপদ, চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল ইত্যাদি সাহিত্যে কাক, কোকিল, সাপসহ অনেক প্রাণীর কথা রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সুকুমার রায়সহ প্রায় সকল সাহিত্যিকই বিভিন্ন প্রাণীর কথা লিখেছেন সাহিত্যের প্রয়োজনে। এমনকি বন্যপ্রাণীকে রূপক হিসেবেও ব্যবহার করা হয়েছে বিভিন্ন গল্পে। যেমন: হাসান হাফিজুর রহমান রচিত *একজোড়া পাখি*, হাসান আজিজুল হক রচিত *শুকুন*, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসে রচিত *যুগলবন্দী* ইত্যাদি। এভাবে যুগযুগ ধরে বিভিন্ন বন্যপ্রাণীকে ঘিরে গড়ে উঠেছে অজস্র গল্প, কবিতা, উপন্যাস।

এসকল কারণেই বন্যপ্রাণীকে বিলুপ্ত হতে দেওয়া যাবে না, সবাই মিলে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে এগিয়ে আসতে হবে। উপরের কারণগুলো ছাড়াও শতশত কারণ রয়েছে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের। সব কারণ লিখতে বসলে কয়েকশত পৃষ্ঠার বই হয়ে যাবে তবুও লেখা শেষ হবে না। তবে সবচেয়ে বড় কারণটি হলো ভালোবাসা। ভাল মানুষ যেমন একে অপরকে ভালবাসে, তার কষ্টে কষ্ট পায়, বিপদে সাহায্য করে, তেমনি তারা বন্যপ্রাণীদেরও ভালবাসে, তাদের দুঃখেও দুঃখ পায়, তাদের মৃত্যুতে কষ্ট পায়। মানুষসহ সকল প্রাণী মিলেই এই সুন্দর পৃথিবী, এখানে বেঁচে থাকার অধিকার সবারই আছে, মানুষ যেমন সুন্দর, বন্যপ্রাণীরাও সুন্দর। কোনো মানুষ বিপদে পড়লে আমরা যেমন সবাই মিলে সাহায্য করি, তেমনি বন্যপ্রাণীদের বিলুপ্তি রোধেও আমাদের সবাই মিলে এগিয়ে আসতে, তাদের সংরক্ষণের জন্য কাজ করতে হবে, তাদের ভালবাসতে হবে।



CONTACT US

✉ info@bfdwlo.org

✉ wildlifeolympiad.bd@gmail.com